Printed by C. L. Gupta.
AT THE
NARAYAN PRINTING & PUBLISHING HOUSE.
1, Cornwallis Street, Calcutta.

সম্পাদক—শ্রীঅবনীভূষণ দাস
অধ্যাপক, সিটি কলেজ, কলিকাতা।

পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠাগ্রজ

শ্রীযুক্ত আশুতোষ সান্যাল মহাশয়

ও

মধ্যমাগ্রজ

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের

শ্রীচরণকমলে।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রায় বার বৎসর হইল এই গ্রন্থ খানির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল, আজ প্রায় ২।৩ বৎসর হইল তাহা নিঃশেষিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত তাহা আর প্রকাশ করিবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। বহু লোকের আগ্রহে পুনশ্চ এই গ্রন্থ খানিকে প্রকাশিত করিবার গুরুভার আমরা গ্রহণ করিয়াছি, এই আশা করিয়া যে উহা নিশ্চয় পাঠকবর্গের নিকট পূর্ব্ব সমাদর লাভ করিবে। এবার গ্রন্থকার আমূল গ্রন্থখানিকে সংশোধিত ও ইহার কলেবর যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত করিয়া আমাদের হস্তে দিয়াছেন। কয়েকটি অধ্যায়ের এবং তাহার বিষয়ের আমূল পরিবর্ত্তন, ও নূতন কয়েকটী বিষয় ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থ খানির যথেষ্ট আয়তন বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে, এবং ব্রহ্মবিদ্যা নামক দুইটী বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয় ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে—এই জন্য ইহা মুমুক্ষু সাধকের ও তত্ত্বজ্ঞান পিপাসু ব্যক্তির অনেক কাজে লাগিবে বলিয়া আশা করা যায়। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত জীবনী আরও অধিক সংগৃহীত হইয়াছে। অনেক কীর্ত্তিমান লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের জীবনী সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া অজ্ঞাত নামা কয়েক জনের জীবনী কেন ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়া— জিজ্ঞাসা করায় গ্রন্থকার বলেন তিনি যাহাদিগ—

ভালবাসেন, যাহাদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবন গঠনে অনেক সাহায্য করিয়াছে তাঁহাদের জীবনী আলোচনায় তাঁহার অধিক তৃপ্তি বলিয়া তিনি সেই সকল জীবনীর সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ পুরুষের জীবনীর কিছু না কিছু সকলেরই জ্ঞাত আছে। কিন্তু এমন অনেক পুরুষ এখনও রহিয়াছেন, যাঁহাদের কর্ম্ম চেষ্টা ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে উজ্জ্বল না করিলেও তাঁহারা নীরবে যাহা দান করিয়া গিয়াছেন তাহার মূল্য বড় কম নহে। দশজনে তাঁহাদের নাম জানিতে নাও পারে, কিন্তু তবুও তাঁহাদের জীবনী কোন মহত্তর ব্যক্তির জীবনী অপেক্ষাও কম শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুহলদ্দীপক নহে। বরং ব্যক্তিগত জীবনে হয় ত একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের জীবনের যে অত্যুগ্র প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, তাহা কোন মহত্তর জীবনের প্রভাব অপেক্ষা ন্যূনমাত্রও কম নহে। আশা করা যায় গত বারের গ্রন্থের ন্যায় সহৃদয় পাঠকবর্গের নিকট এবারও গ্রন্থখানি সমাদর লাভ করিবে। যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াও আমরা গ্রন্থখানিকে নির্ভুল করিয়া প্রকাশিত করিতে পারিলাম না। সহৃদয় পাঠকবর্গ এজন্য আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

সম্পাদক।

প্রকাশকের নিবেদন।

সেই এক অতীত যুগের মহান্ চিত্র যে দিন 'ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে' নরনারায়ণের অপূর্ব্ব মিলনভূমিতে কর্ম্মবীর পার্থ মোহাবসাদে নত মস্তক,—"ন যোৎস্যে" বলিয়া নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ এবং সেই বীরশ্রেষ্ঠের এই অনার্য্যোচিত মোহান্ধতা দূর করিবার জন্য শ্রীভগবান্ পার্থসারথি বেশে তাঁকে অমৃতবাণী শুনাইতেছেন। ভক্তবীর পার্থ ভগবদ্বাণী শুনিলেন, ভগবানে সমাহিতচিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মীর, সাম্যাবস্থিত পরমযোগীর নিগূঢ়রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন,— তাঁর সাময়িক উপলব্ধি হইল, তথাপি মনের দুর্ব্বলতা স্মরণ করিয়া সেই ভক্তবীরও বলিতেছেন :—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥"

অর্জ্জুনও যেন বল্‌ছেন, "ঠাকুর! এখন'ত বেশ বুঝ্‌লাম তোমার কথা, কিন্তু পথটা যে বড় কঠিন,—ঐ মনটাকে ঠিক করলেই সব হয় তা অবশ্য বুঝ্‌লাম, কিন্তু এই মন ঠিক করার কোন সহজ উপায় বলে দিতে পার কি?" উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥"

উপায় মাত্র দুইটী—অভ্যাস ও বৈরাগ্য। প্রশ্নের

উত্তর হইল বটে, কিন্তু পথ যে সোজা করা হইল তা ত মনে হয় না।

এ প্রশ্ন কিন্তু শুধু পার্থেরই নহে। ইহা মানবের সনাতন প্রশ্ন, সংসারতাপজর্জ্জরিত বেদনাতুর মানব হৃদয়ের ইহাই চিরদিনের আর্ত্তনাদ ও অভিযোগ। 'জগৎ জিতং কেন? 'মনোহি যেন।' এ প্রশ্নোত্তর মানুষমাত্রেই জানে। কিন্তু ঐ মনকে জয় করা যায় কিরূপে? বিশেষতঃ এই দুষ্টযুগে অধঃপতিত সহজপন্থী আমরা সাধনায় শ্রমস্বীকারে বিমুখ হইয়া ভাবি গুরু বুঝি বা অতি সহজ একটা উপায় বাত্‌লে দিবেন। কিন্তু তাই কি হয়? এত সস্তায় অতবড় জিনিষ হয় না, এ পথের শেষ লক্ষ্য কি? "যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।" তাই ত ঐ সনাতন সমস্যার ঐ সনাতন সমাধান আজও গুরুমুখে পাই—অভ্যাস ও বৈরাগ্য—'নান্য পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—অভ্যাস! অভ্যাস!! অভ্যাস!!! খাট্‌তে হবে, কাঁদ্‌তে হবে—সত্য করিয়া চাইতে হবে তবে ত সে পরমবস্তু মিল্‌বে, এবং সত্য করিয়া চাওয়া মানেই আর সব ছেড়ে দিয়ে (বৈরাগ্য) ঐ লক্ষ্যের জন্য প্রাণপণে সাধনা করা (অভ্যাস)।

সাধারণ কর্ম্মজীবনেও প্রতিপদে দেখি যে সাংসারিক ব্যাপারে সিদ্ধি লাভের জন্য অভ্যাসযোগ ছাড়া উপায় নাই—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর মানুষ জীবনের গতিকে একমুখী করে এবং অন্তে গন্তব্যে উপনীত হয়। নীতি ও কর্ম্মজীবনেও সেই চিরন্তক নিয়মের ব্যতিক্রম নাই। পূর্ব্ব

জন্মের কর্ম্মাভ্যাসই এ জন্মে সংস্কার রূপে আমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে এবং এ জন্মের অভ্যাসই আবার কর্ম্মফল হইয়া পরজন্ম পর্য্যন্ত আমাদিগকে অনুসরণ করিবে। এই অভ্যাসের চরম পরিনতিই আমাদের প্রকৃতি—"প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি"। অতএব এই অভ্যাসকে সুনিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে আমাদের জীবন গঠন। জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া সেই লক্ষ্যাভিমুখে জীবনের গতি চালিত করাই অভ্যাসযোগ—বা সিদ্ধির প্রয়াসে সাধনা।

পূজ্যপাদ গ্রন্থকার প্রণীত ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই পুস্তক খানিতে মনুষ্যজীবনের যে একান্ত প্রয়োজনীয় বস্তু, দয়িতের সহিত মিলনানন্দ ভোগ করিবার জন্য চিরপিপাসাতুর জীবাত্মার সাধনমার্গের যে একমাত্র সম্বল সেই অভ্যাসযোগই বিশদভাবে ও সরলভাবে আলোচিত হইয়াছে। আজকাল ধর্ম্মের বক্তৃতা অনেক শুনি, ধর্ম্মের পুস্তক অনেক দেখি—কিন্তু ধর্ম্মের অভ্যাস সেই অতিবিরলই আছে। বক্তৃতা, তর্ক, লেখা হচ্ছে বুদ্ধির খেলা, খাঁটি মস্তিষ্কের জিনিষ; কিন্তু ধর্ম্ম হচ্ছে সাধনার, অনুভূতির, প্রাণের জিনিষ। এবং মস্তিষ্ক অপেক্ষা প্রাণ যে অনেক বড় এবং সেই জন্যই বিরল। আধ্যাত্মিক জগতের এমনই একটা বিশেষত্ব আছে যে নিজের সাধনা বা অনুভূতি নাই এরূপ বক্তার বক্তৃতা বা লেখকের লেখা অনেকটা তা হাওয়ায় ভেসে যায়—শ্রোতা বা পাঠকের প্রাণকে স্পর্শ করে একটা স্থায়ী ফল রেখে যেতে পারে না। আর যে মহাত্মার অন্তরে সাধনা-

হোমশিখা জ্বল্‌ছে, অনুভূতির আনন্দ হিল্লোল ব'চ্ছে তাঁর মুখের হাঁসিতে, চোখের চাহনিতে, অঙ্গের স্পর্শে এমনই এক অপার্থিব বিদ্যুচ্ছক্তি প্রকাশ পায়, যাহাতে পাষাণ গলে যায়, অন্ধ আলো পায়, পাপী ত'রে যায়। তাই আজ সহৃদয় পাঠক পাঠিকার কাছে এ পুস্তকের পরিচয় দিতে এসে লেখকের কিছু পরিচয় না দিয়া পারিলাম না। চোখের সামনে দেখ্‌ছি যে অভ্যাস-যোগের একটী জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হ'চ্ছে এই পূজনীয় গ্রন্থকারের পুণ্যজীবন।

হিন্দুসন্তানমাত্রই জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে "ঋষয়ঃ মন্ত্রদ্রষ্টারঃ"। এই চাক্ষুস বাস্তব রাজ্যের অন্তরালে যে একটা মহামহিমময় মহত্তর রাজ্য আছে—যাহার পুণ্যচিত্র চর্ম্মচক্ষের পক্ষে অতিসূক্ষ্ম বলিয়া অগোচর,—সেই রাজ্যের গুহ্যতম তত্ত্বগুলিও আর্য্যঋষি ধ্যানস্তিমিতনেত্রে উন্মীলিত অন্তর্দৃষ্টির প্রভাবে, সাধনার শুভ্রোজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ সত্যরূপে দেখিয়াছিলেন, নিজের বলিয়া পাইয়াছিলেন। সেই ঋষিগণের উপলব্ধির জীবন্ত অভিজ্ঞতাই এখনও আপ্তবাক্য রূপে মুমুক্ষু মানবের কাছে বিদ্যমান। এবং এ যুগেও আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রদ্ধাবান্ সাধকপ্রবর বিরল হইলেও একেবারে লুপ্ত হন নাই যাঁহারা ভগবদুক্ত ঐ **অভ্যাস** ও **বৈরাগ্যের** দ্বারা সেই সনাতন তপোমার্গে চলিতেছেন এবং ঋষিলব্ধ সত্যকে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া ধর্ম্মের পবিত্র ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জগৎকে ধন্য করিতেছেন। এ গ্রন্থকারও সেই শ্রেণীভুক্ত

একজন মহাপুরুষ,—যাঁহার বাক্যে ও কার্য্যে মিল আছে, যাঁহার চিন্তা, বাক্য ও রচনা নিজজীবনেই মূর্ত্তিলাভ করিয়াছে, এবং জীবন্ত সত্যের প্রাণময় স্পর্শে সংসার তাপদগ্ধ অনেক নরনারীকে সান্ত্বনা, শান্তি ও আনন্দ দান করিতেছে। এমন লোকের লেখা পুস্তক পাঠকমাত্রেরই মনে ও জীবনে সত্যই একটা মর্ম্মস্পর্শী প্রভাব বিস্তার করিবে—এই বিশ্বাস ও জ্ঞানে আজ এই পুস্তক খানি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-সন্তানের সাধন মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত করিতেছি। বলিবার আর কিছু নাই,—

"তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, হে করুণাময় স্বামী!"

ভাগলপুর,
শারদীয়া মহাষ্টমী,
১৩৩০।

শ্রীশ্রীগুরুপদাবনত—
শ্রীনারায়ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপক, তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজ।

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত

ধর্ম্মপ্রচার গ্রন্থাবলীর অন্যান্য পুস্তক

দিনচর্য্যা ৩য় সংস্করণ	মূল্য ।৵০ আনা।
আশ্রম চতুষ্টয়	„ ॥০ আনা।
দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব	„ ।/০ আনা।
বিল্বদল সাধারণ সংস্করণ ১৲, রাজসংস্করণ	১।০ আনা।
অভ্যাসযোগ ঐ ১৲, ঐ	১।০ আনা।

প্রাপ্তিস্থান—কলিকাতা মেডিক্যাল লাইব্রেরী, প্রকাশক—শ্রীকানাই-লাল গুপ্ত ৮-এ, মোহনলাল ষ্ট্রীট, সম্পাদক—শ্রীঅবনীভূষণ দাস, সিটি কলেজ কলিকাতা এবং ম্যানেজার—কাশী যোগাশ্রম, বেণারস সিটি ও গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

যোগাশ্রমের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদগীতা, ৪র্থ সংস্করণ মূল্য	৪৲,	ডাকব্যয়াদি ॥০
পরিব্রাজকের বক্তৃতা	„ ১।০,	ভিঃ পিতে ১।৶০
শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি	„ ১।০,	„ ১।৶০
পরিব্রাজকের সঙ্গীত	„ ।৵০,	„ ॥০
শান্তিপথ ও ধ্যানযোগ	„ ৷৴০,	„ ৷৶৵০
বিচার প্রকাশ	„ ॥০,	„ ॥৵০

প্রাপ্তিস্থান—কাশী যোগাশ্রম, বেণারস সিটি পোঃ।

ভূমিকা।

হিন্দু-শাস্ত্রমতে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পরমাণু ভগবানের অনন্ত শক্তিতে পরিপূর্ণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন স্থান কোথাও নাই, যেখানে তাঁহার অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং, মানুষের মধ্যেও তাঁহার এই পূর্ণশক্তি বিরাজিত; কিন্তু মোহের প্রভাবে, অজ্ঞানের প্রভাবে, কদভ্যাসের প্রভাবে, এই বিপুল শক্তি জড়ীভূত—ক্ষীণ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় মৃদু—বীজনিহিত বৃক্ষশক্তির ন্যায় সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট, অদৃশ্য।

উপযুক্ত সাধন দ্বারা যদি এই শক্তিকে বিকশিত করিয়া তুলা যায়, তাহা হইলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে।

বঙ্গের গৌরব শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধনের নাম দিয়াছিলেন "অনুশীলন"। 'অনুশীলন' পাশ্চাত্য নাম—ইহার শাস্ত্রীয় নাম "অভ্যাস"। বঙ্কিমচন্দ্র যে অর্থে 'অনুশীলন' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, গীতা যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে ঠিক সেই অর্থেই 'অভ্যাস' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং, এস্থলে আমাদের পক্ষে ভারতবর্ষীয় নাম গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। শুধু নাম নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার প্রণালীও পাশ্চাত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনার আদর্শ ছিল—"সকল বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি ও সামঞ্জস্য;" শাস্ত্রের আদর্শ—"সকল বৃত্তির পূর্ণ পরিণতি ও বিসর্গ।" ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ।"

বিসর্গ বলিতেই মনে হয়, কাহার জন্ত বিসর্গ ?—সর্ব্বভূতের জন্ত। প্রেম ভিন্ন ত্যাগ সম্ভব হয় না ; এবং "সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি" এ জ্ঞান না হইলেও, প্রকৃত বিশ্বপ্রেম উৎপন্ন হয় না। তাই, শাস্ত্রমতে এই সাধনা অর্থে ভগবানকে পাইবার সাধনা ; বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শানুসারে, চেষ্টা দ্বারা, অভ্যাস দ্বারা, বৈরাগ্য দ্বারা বিমুখচিত্তকে ঈশ্বরাভিমুখ করিবার সাধনায়, ভগবানের প্রয়োজন ছিল না। তাই তিনি আপনার অনুশীলন ধর্ম্মকে পাশ্চত্য "অভিব্যক্তিবাদে"র (Evolution) উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অনুশীলন দ্বারা প্রত্যেক বৃত্তিকে পূর্ণপরিণত করিয়া মানুষ সম্পূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু এ সাধনা কার্য্যক্ষেত্রে কিরূপ অসম্ভব তাহা তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই। অভিব্যক্তিবাদের মতে অনুশীলন দ্বারা যেমন শক্তির পরিণতি সম্ভব, অব্যবহারে তেমনি শক্তির বিলোপ অবশ্যম্ভাবী। একেবারে সকল শক্তির বিকাশের সাধনা অসম্ভব, এবং কোন শক্তিবিশেষের প্রতি বিশেষ মনোযোগে, শক্ত্যন্তরের প্রতি অমনোযোগ অবশ্যম্ভাবী। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধনাপ্রণালীর ইহা এক গুরুতর ত্রুটি। এ সাধনায় আদর্শমানবের উদ্ভব অসম্ভব।

শুধু ইহাই নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধন প্রণালীতে আর এক বিষম ত্রুটী সুপ্রকট। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও একথা বুঝিয়াছিলেন। কথাটা "সামঞ্জস্য" লইয়া। সকল বৃত্তির—সুপ্রবৃত্তির ও কুপ্রবৃত্তির—পূর্ণপরিণতি হইলে, মনুষ্যের পূর্ণতালাভ দূরে থাক্, কোন

লাভই হয় না। তাই পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্র নানা সূক্ষ্ম ও কূট তর্কের সাহায্যে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কোন কোন বৃত্তির সংযমেই তাহার বিকাশ। কথাটা শুনিলেই একটা বড় রকমের গোঁজামিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহাতেও কথা উঠিয়াছিল, মানুষ আপনার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে চেষ্টা করিলেও, ভগবানের আশ্রয় না পাইলে, শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতে পারে কি? ব্রাহ্মণসন্তান বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। অথচ, তাঁহার অনুশীলনধর্ম্মে ভগবানের প্রয়োজন ছিল না; কাজেই তাঁহাকে আর এক কূট তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। বঙ্কিমচন্দ্র বলিলেন সকল বৃত্তিই পূর্ণপরিণত হইলে, ঈশ্বরমুখী হয়। নানা কৌশলে, নানা সূক্ষ্ম তর্কে, তিনি এ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু এ কথা প্রমাণিত হয় নাই।

'অনুশীলন'তত্ত্ব-প্রতিপাদনের জন্য পাশ্চাত্য অভিব্যক্তিবাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া, বঙ্কিম বাবু যদি তাঁহার আপনার দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর নির্ভর করিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ভ্রান্ত সাধন প্রণালীর সমর্থনের জন্য এত বিপুল চেষ্টা ও বিচার শক্তির অপব্যয় করিতে হইত না। হিন্দুশাস্ত্রের মতে প্রত্যেক বৃত্তির পূর্ণবিকাশের জন্য পৃথক চেষ্টার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; যিনি সকল শক্তির মূল, সকল জ্ঞানের আধার, সকল আনন্দের অমৃতনিকেতন, তাঁহাকে লাভ করিলেই, সকল বৃত্তি আপনিই যথাযথ বিকশিত হইয়া উঠে, কুপ্রবৃত্তি আপনি

সঙ্কুচিত হয়, সুপ্রবৃত্তি আপনি অনন্ত বিকাশ লাভ করে ;—"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোহপি শাখাঃ।"

কিন্তু ভগবানকে লাভ করিবার জন্য কঠোর সাধনার প্রয়োজন। এই সাধনার নাম "অভ্যাস"।—"অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।" যে সদভ্যাসের জন্য আমাদের শক্তি জড়ীভূত, বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন, জ্ঞান তমসাবৃত, কদভ্যাসের দ্বারা সেই বিকৃতি এবং মলিনতা অপসারিত করা প্রয়োজন, নহিলে উন্নতির অন্য উপায় নাই।

সেই জন্যই হিন্দুর নিকট হিন্দুশাস্ত্রোক্ত "অভ্যাসযোগ" প্রচারের প্রয়োজন।

এই তমসাচ্ছন্ন, অবসাদবিজড়িত, কর্ম্মবিমুখ দেশে কর্ম্মের শক্তি এবং অভ্যাসের ক্ষমতার কথা বজ্রকণ্ঠে শুনাইবার দিন আসিয়াছে। কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মকে অতিক্রম করা যায়, সদভ্যাসের দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা সম্ভব হয়—আলস্য-পরায়ণ, মোহাভিভূত ভারতবাসীকে এ কথা না বুঝাইতে পারিলে, আর তাহার উদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।

আমার ক্ষীণ কণ্ঠ, ক্ষুদ্র শক্তি ; আমি যতটুকু পারিলাম, আমার স্বদেশবাসীকে এই অভয়বাণী শুনাইবার চেষ্টা করিলাম ; যদি একজনও এই ক্ষীণ কণ্ঠ শুনিয়া মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত হন, তাহা হইলে, আমি সকল পরিশ্রম সফল মনে করিব।

পুরীধাম,
আষাঢ়, ১৩১৮। } গ্রন্থকার।

অভ্যাসযোগ।

প্রথম অধ্যায়।

অদৃষ্টবাদ।

আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থা।

সকল দিক দিয়া আমাদের যে অধঃপতন ঘটিয়াছে, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ ঘটিবার সম্ভবতঃ আশঙ্কা নাই। কিন্তু এ অধঃপতনের মূল কি, এ বিষয়ে মতভেদ যথেষ্ট। সমস্ত বিভিন্ন মতের মধ্যেই যে অল্প বিস্তর সত্য নাই, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে অসত্যও যথেষ্ট বর্ত্তমান। সেই সমস্ত প্রচলিত মতের দোষোদ্ঘাটন, নূতন কোন মতের সংস্থাপন অথবা কোন মতের আংশিক খণ্ডন বা গ্রহণ, বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কোন মতামত লইয়া বিতণ্ডা করা আমার অভিপ্রায় নহে। বর্ত্তমান সময়ে আমার স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদিগের দুর্দ্দশা ও ক্লেশ দেখিয়া আমার মনে যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, এবং তাহার শাস্ত্রীয় মীমাংসা আমার বুদ্ধিতে যতদূর প্রতিভাত হইয়াছে, তাহারই আলোচনা এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। যাঁহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ শাস্ত্রকে

অভ্রান্ত বলিয়া মানিয়া লইতে অশক্ত, আশা করি, তাঁহারাও "যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং বচনং বালকাদপি" এই নীতির অনুসরণ করিতে কুণ্ঠা অনুভব করিবেন না।

দুরবস্থার কারণ।
(ভ্রান্ত অদৃষ্টবাদ)

এই দেশব্যাপী দুরবস্থার সহস্র কারণ বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু আমার মনে হয়, ইহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অন্ধ, ভ্রান্ত, অবসাদকর অদৃষ্টবাদ। আমরা সকল তাতেই অদৃষ্টের দোষ দিতে শিখিয়াছি। দেশে যখন রোগ, দুর্ভিক্ষ বা মহামারী উপস্থিত হইয়া জনপূর্ণলোকালয় সমূহকে জনশূন্য করিয়া তুলে, তখনও আমরা ললাটে করাঘাত করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকি, তাহার প্রতিকারের কোন উপায় অন্বেষণ না করিয়া নিরুদ্বেগে কাল যাপন করি। সত্ত্ব সংশুদ্ধ হইলে, যে অভয় আসিয়া মানবাত্মাকে আশ্রয় করে, ইহা সে প্রকারের ভয়শূন্যতা নহে। ইহা আধ্যাত্মিক জড়তার এবং তজ্জনিত বাহ্য নিশ্চেষ্টতার ভয়াবহ পরিণাম! অবশ্য আমাদের জীবনের সমস্ত ব্যাপারে 'অদৃষ্ট' যে কিছুই কাজ করে না, সে কথা আমি বলিতে চাহিনা, কিন্তু যে 'অদৃষ্টবাদ' জীবকে উদ্যমহীন করে, মানুষকে জড়বৎ করিয়া তুলে, আমি সেরূপ অদৃষ্টবাদের পক্ষপাতী নহি। তাহা তো ঘোর তামসিকতা—আমি তাহাকে নাস্তিকতা বলিতেও কুণ্ঠিত নহি। নাস্তিক যেমন ঈশ্বর মানে না, তদ্রূপ এই জড়ভাবাপন্ন লোকেরা ঈশ্বরের নিয়ম মানে না—আত্মার শক্তিতে বিশ্বাস করে না। নিজের শক্তির

উপর যদি বিশ্বাস না থাকে, তবে পরমুখাপেক্ষী হওয়া তাহার পক্ষে স্বাভাবিক; এবং অন্যের করুণার উপর যাহার জীবন নির্ভর করে তদপেক্ষা দুঃখভাগী আর ইহ সংসারে কে থাকিতে পারে? এই যে আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস, ইহাই প্রকৃতপক্ষে ভগবানে অবিশ্বাস। যাহার ভগবানে বিশ্বাস নাই এবং বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তিও নাই, সে ভগবানের নিয়ম মান্য করিতে পারিবে কেন? সুতরাং, দুঃখকষ্টের কঠোর নিষ্পেষণ হইতেও নিষ্কৃতিলাভ করা, তাহার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার।

ভগবানের নিয়ম মানিয়া চলিলাম না, তার পর দুঃখ দারিদ্র, অকাল মৃত্যু, ব্যাধি, অস্বাস্থ্য স্বাভাবিক নিয়মেই যখন আমাদের প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করিল, তখনও তাহার উপশমের জন্য কোন পুরুষার্থ অবলম্বন না করিয়া দেবতার দ্বারে দ্বারে কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলাম এবং অবশেষে তাঁহাদিগকে মিষ্টান্ন উপঢৌকন দিয়া ও বিবিধ পূজোপচারের লোভ দেখাইয়াও যখন সফলমনোরথ হইলাম না, তখন কর্ত্তব্য পালনের আর কিছুই অবশিষ্ট নাই ভাবিয়া বিষণ্ণমুখে 'সবই অদৃষ্ট' বলিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম! আমি জিজ্ঞাসা করি ইহাই কি হিন্দুত্ব? এক দিন তো আমাদের দেশে এই কথাই প্রচারিত ছিল যে,

> "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
> দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
> দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
> যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"

কিন্তু আজকাল ঠিক ইহার বিপরীত পথে আমরা চলিতেছি। আমাদের দেশে পৌরুষহীন এই দুর্ব্বল ভাবের আত্যন্তিকতা কোথা হইতে আসিল, বুঝিতে পারি না। অদৃষ্টবাদই বাস্তবিক আমাদের এই অনিষ্ট করিয়াছে, অথবা আমরা ক্রমশঃ দুর্ব্বলচিত্ত ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়াতে, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতে তমোগুণের আধিক্য ঘটায়, আমরা পৌরুষচ্যুত হইয়া ক্রমশঃ ঘোর অদৃষ্টবাদী হইয়া পড়িয়াছি, জানিনা। কিন্তু যে কারণেই হউক, আমাদের কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা ও শক্তি যেন একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। কোন সহরে বা কোন পল্লীগ্রামে যখন কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন দেখিতে পাই, সেই ব্যাধির বিষদন্তে অভাগ্য আমরাই দলে দলে নিষ্পিষ্ট হইয়া জীবলীলা সংবরণ করি—কিন্তু সেই স্থানেরই ইউরোপীয় পল্লীতে সে পীড়া সহজে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অদৃষ্টবাদী সেখানেও অদৃষ্টেরি দোহাই দিবেন। আমি বলি অদৃষ্টের কথা বলিতে হয় শেষে বলিও কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আমাদের প্রতিবাসীরা স্বাস্থ্যবিধানের যে নিয়মগুলি মানিয়া চলেন সেগুলিকে মানিয়া চলিলে কোন সুবিধা হয় কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? আমার বিশ্বাস যদি আমাদের ঘর দ্বার ও তাহার চতুঃপার্শ্ব বেশ সুপরিচ্ছন্ন থাকে, পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত হয়, বস্ত্র ও অন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য বেশ সুপরিষ্কৃত অবস্থায় ব্যবহার করা যায়, আমরা যথাকালে জাগরিত ও নিদ্রিত হই, ভোজনে সংযম অভ্যাস করি, ইন্দ্রিয়

সকলকে তাহাদের সংক্ষোভ হইতে রক্ষা করিয়া চলি এবং ব্যায়াম, অধ্যয়ন, উপাসনা, আমোদ, প্রমোদ ও তদ্বিষয়ে সমস্ত নিয়মই যথাযথ পালন করিয়া চলি, তবে আধ্যাত্মিক ও আধি-ভৌতিক কোন পীড়ার অক্রমণ হইতেই রক্ষা পাওয়া কিছুমাত্র দুষ্কর হয় না; কিন্তু উদ্যোগ চাই, ইহার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টার প্রয়োজন। ইহা সত্ত্বেও যদি দেখি, আমরা অকাল মৃত্যুকে বাধা দিতে পারিতেছি না, তখন বুঝিব, নিয়তির কঠিন পাশ হইতে আমাদের উদ্ধারের আশা নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে একথা উচ্চারণ করাও মহাপাপ!

অনেকে বলেন অদৃষ্টবাদী বলিয়াই আমাদের দেশের লোকের চিত্তবৃত্তি অন্যান্য জাতির তুলনায় শান্ত। ইহা হয়ত কতক পরিমাণে সম্ভব, কারণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের তপস্যা লব্ধ তিতিক্ষা, উপরতি প্রভৃতি সাধনার ক্ষীণ ধারা এখনও আমাদের অস্থি মজ্জায় গুপ্তভাবে সঞ্চারিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি স্বীকার করিতে হইবে আমরাও যে আমাদের দুর্ভাগ্যকে সন্তুষ্ট চিত্তে স্বীকার করিয়া লইয়া থাকি ইহা সত্যকথা নহে। তবে হয়ত পাশ্চত্য জাতিদের মত আমাদের ভোগ প্রবৃত্তি অতটা সুতীব্র নহে, কিন্তু ইহা যে কিসের পরিণাম তাহাও নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ কিছুমাত্র নাই যে, আমরাও ভোগ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া বিষয় সমূহকে কামনা করিয়া থাকি, এবং বিষয় পাইলেই সুখী হই। সন্তুষ্ট চিত্ত হওয়া প্রকৃতই অদৃষ্টবাদের উপর নির্ভর করে না। মানুষের ভিতর হইতে যে

আত্মাতে জাগিয়া উঠে, তাহাকে নিবৃত্ত করিবার দুইটি মাত্রই উপায় আছে। এক ভোগ্য বিষয় সমূহকে ভোগ করিয়া দ্বিতীয়টি ভোগের পরিণামবিরসত্ব ও ক্ষণস্থায়ীত্ব চিন্তা করিয়া, তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকা। এইটিই ভারতবর্ষের আর্য পন্থা। ইহাতেই ভোগেচ্ছা স্থায়ী ভাবে নিবৃত্ত হইতে পারে। প্রথমটির দ্বারা আকাঙ্খার সাময়িক নিবৃত্তি হইলেও উহা স্থায়ী সুফল প্রদান করে না। সেই জন্যই ভারতীয় ঋষি দিগের উপদেশ এই যে আকাঙ্খিত ভোগ্যবস্তুর পিছনে পিছনে ছুটিয়া জীবনকে ব্যর্থ করিয়া লাভ নাই, ভোগ্যবস্তুর স্বরূপ অবধারণ করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকাই বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

——

দ্বিতীয় অধ্যায়।

দৈব ও পুরুষকার।

অদৃষ্ট কি ? "পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম"ই তো অদৃষ্ট বা দৈব। না দৈব

যথার্থ দৈব কি ?

ভগবানের খেয়াল ? যদি ভগবান্‌কে আমাদেরই মত মনে কর, তবে কোন কথা বলারই প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যিনি সত্য ও অমৃতস্বরূপ, পরিপূর্ণ মঙ্গল ও আনন্দই যাঁহার রূপ, তাঁহার রাজ্যে কি অবিচার হইতে পারে, না কোনও অনিয়ম ঘটিতে পারে ? যিনি আছেন বলিয়া,

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

তাঁহার ইচ্ছা পরিপূর্ণ জ্ঞানময়ী। তাহাতে অজ্ঞানবিজৃম্ভিত কোন বাসনার ঔদ্ধত্য থাকিতে পারে না। পূর্ব্ব জন্মের পাপ পুণ্যানুসারেই লোকের কর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। পাপ কর্ম্ম দ্বারা পাপের এবং পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা পুণ্যের বৃদ্ধি হওয়ায়, উভয়-বিধ কর্ম্মের উভয় প্রকারের এক একটি 'অপূর্ব্ব' শ জন্মিয়া থাকে, যাহাদের বলে উভয় প্রকারেরই এক একটি নূতন কর্ম্মের কারণ উৎপন্ন হয়; ইহা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকে বাধা দিয়া বলপূর্ব্বক আর একটি কর্ম্ম করায় বটে, কিন্তু এই কর্ম্মের কারণ ও তাহা হইলে সেই পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মকেই বলিতে হইবে। তা যদি হয়, তবে একথা খুবই সত্য যে আমাদের অদৃষ্ট আমরাই সৃষ্টি

করিতেছি ; দৈব বলিয়া কোন একটা বলবান্ দৈত্য আমাদের পথ আগুলিয়া বসিয়া নাই। স্বকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তিই অদৃষ্ট, ইহা ছাড়া দৈব আর কিছুই নহে ; সুতরাং, যে অদৃষ্টকে আমরা কর্ম্ম-বশে দুরদৃষ্টে পরিণত করিয়াছি, যদি আমরাই উদ্যোগী হইয়া সৎকর্ম্মশীল হই, তবে অদৃষ্টের সেই চক্রনেমিই আবার বিপরীত দিকে বিঘূর্ণিত হইয়া শুভ-ফলদানে সমর্থ হইতে পারে। পূর্ব্ব-কৃৎকর্ম্মফলের বশে দারিদ্র্য, ক্লেশ, ব্যাধি যদি আসিয়া থাকে, ত আবার সেই নিয়মবলেই শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য, আরোগ্য, বিত্ত, চিত্তপ্রসন্নতা, উৎসাহ প্রভৃতি সৌভাগ্যশ্রী একে একে আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় করিবে। "কর্ম্ম ফলায়ত্তম্", ফল কর্ম্মেরই অধীন। শুভকর্ম্মে শুভ ফল, অশুভ কর্ম্মে অশুভ ফল ফলিবে, ইহাই ভগবানের বিধান। তখন, হা কষ্ট, হা বিধাতা, হা অদৃষ্ট বলিয়া উন্মত্তের মত ব্যাকুল হইয়া বেড়াইলেও কোন ফল নাই। কাঁদিয়া ধরাতল সিঞ্চিত করিলেও কোন লাভের আশা নাই।

জগৎ কর্ম্মক্ষেত্র। আমরা সকলেই এখানে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছি। সুতরাং, অনাবশ্যক বাক্যব্যয় করায় বা নিজের

পুরুষকার।

অদৃষ্ট ভাল কি মন্দ, তাহা নির্ণয়ের জন্য গণৎকারের দ্বারস্থ হওয়ায় লাভ কি? বরং বুকে বল বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়াই কর্ত্তব্য। কর্ম্ম না করিলে যখন কোন উপায় নাই, তখন কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মপাশ ছিন্ন করিবার উদ্যমই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কোন মহাপুরুষ

বলিয়াছেন "যদি ইক্ষুতে প্রবল চাপ না দিলে রস না বাহির হয় তবে নিরুপায় ; চাপ দিতেই হইবে। শত বেদনা বিনা যদি চিত্তে প্রেমের উৎস উৎসারিত না হয়, তবে দাও প্রভো ভীষণ যাতনা !" এইত মানুষের মত কথা, বীরোচিত বাক্য, ইহাই তো ভক্তের বাণী। অনবরত "পুত্রং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে" এই বলিয়া তাঁহার নিকট আব্দার করিব, আর প্রত্যহই পরম ঔদ্ধত্যভরে তাঁহার সমস্ত আদেশ অমান্য করিব—ইহারই নাম যদি ভক্তি হয়, তবে অবিশ্বাস ও অভক্তি আর কাহাকে বলে, জানি না।

তাই বলিতেছি আবার যদি আমরা সচেতন হই, সবল হই, আবার যদি আমরা উদ্যোগী হই, কর্ম্মনিষ্ঠ হই, তবে শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত হইবার পক্ষে কোন বিঘ্ন ঘটিবারই সম্ভাবনা নাই ! এই যে দেশব্যাপী দারিদ্র্য, দুঃখ—ইহাই সমস্ত দেশবাসীর অশুভ কর্ম্মের ফল। এই যে দুঃখ এবং সুখ, দারিদ্র্য এবং সম্পৎ, পীড়া এবং অনাময়, এ সমস্তই ব্যক্তিগতভাবে নিজের এবং ব্যাপকভাবে সমাজের দুষ্কৃতির ও সুকৃতির ফল। আমাদের দেশে এই সকলের জন্য পূর্ব্বে রাজাকে দায়ী করিত। কারণ, রাজাই সমস্ত সমাজের এবং প্রজার প্রতিভূ। এ বিষয়ে পরম প্রাজ্ঞ ভীষ্মদেব রাজাধিরাজ ধর্ম্মপ্রিয় যুধিষ্ঠিরকে সুন্দর একটি উপদেশ দিয়াছিলেন, ইহাতে পুরুষকারের অপূর্ব্ব শক্তির কথা প্রকাশ পাইয়াছে। এ কথা স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়ে অঙ্কিত করিলে, অনেক দুঃখ-দুর্গতি হইতে আমরা মুক্তিলাভ করিতে পারি। কথাটা উঠিয়াছিল যুগ

পরিবর্ত্তনে মানবের চরিত্র পরিবর্ত্তিত হয়, না মানবের চরিত্র পরিবর্ত্তনের সহিত যুগের পরিবর্ত্তন হয়? কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত নহে, যত্নের সহিত বিবেচ্য। বার্দ্ধক্য কেন হয়?—না যৌবনের দোষে। যদি যৌবনে কেহ অকলঙ্ক জীবন কাটাইতে পারে, সর্ব্বপ্রকার নিয়মকে শ্রদ্ধার সহিত মানিয়া চলিতে পারে, তাহা হইলে সেই অরোগী অপ্রমাদীর বয়স ফুরাইলেও যৌবন যায় না। আর যে অত্যাচারী অসংযমী, তাহার যৌবনেই জরা উপস্থিত হয়। এমন কিছু ধরাবাঁধা নিয়ম নাই যে, চল্লিশ ফুরাইলেই যৌবন যাইবে, এবং চল্লিশের মধ্যে থাকিলেই যৌবন থাকিবে। যে রাখিতে জানে, তাহারই যৌবন থাকে, সুতরাং, যৌবন বা জরা এই যে কাল ইহা পুরুষের চেষ্টা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিতেছে। কালের প্রভাব যে নাই তাহা বলা চলে না। কালের পরিবর্ত্তনের সহিত জীবের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু জীবের স্বভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে কালের পরিবর্ত্তনও অস্বাভাবিক নহে। কেন যে জীবের স্বভাবের পরিবর্ত্তন ঘটে তাহার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। এক হইতে পারে যে, জীবের সমষ্টি কর্ম্ম ও সমষ্টি বাসনার ফলরূপে এই পরিবর্ত্তন ঘটে, কিন্তু কেন যে কর্ম্ম ও বাসনা ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা অচিন্তনীয়। যে কালে যেরূপে যে জীব সমূহের আবির্ভাব হয় তাহাদের পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ ভোগাদি প্রাপ্তির জন্য পৃথিবী, জল, বায়ু প্রভৃতির তত্তদ্রূপ পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব। কিন্তু মনুষ্যের ভোগাদি যখন তাহার স্বীয় কর্ম্মের উপরই

নির্ভর করে, তখন সত্য, কলি বলিয়া যুগ সমূহের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব—ঋতু সমূহের মত, থাকিলেও তাহার প্রভাবকে বৃদ্ধি ও হ্রাস করা মনুষ্যের আয়ত্তের মধ্যে। কলি আসিল বলিয়াই যে লোকে মন্দমতি হয় তাহা নহে, মন্দমতি জীবের প্রাচুর্য্যে সত্যকালও কলিকালে পরিণত হয়। এইরূপ কলিকাল ও সত্য কালে পরিণত হইতে পারে। সত্য ত্রেতাদি যুগেও বেণ রাজা, হিরণ্যকশিপু, রাবণাদির আবির্ভাব হইয়াছিল, আবার কলি-যুগেও বুদ্ধদেব, অশোক, শঙ্করাচার্য্য ও চৈতন্য দেবের আবির্ভাব হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের প্রভাবে এই কলিযুগই সত্যযুগের মত হইয়া গিয়াছিল। তাই ভীষ্মদেব বুঝাইতেছেন যে, কাল রাজার কারণ নহে, রাজাই কালের কারণ; এবং এ বিষয়ে তোমার সন্দেহ করিবার প্রয়োজন নাই। রাজা যখন দণ্ডনীতি অনুসারে সুচারুরূপে রাজ্য প্রতিপালন করেন, তখনই সত্যযুগ নামে শ্রেষ্ঠ কাল উপস্থিত হয়। ঐ কালে বিন্দুমাত্রও অধর্ম্মসঞ্চার হয় না। সকল বর্ণেরই অন্তঃকরণ ধর্ম্মবিষয়ে আসক্ত থাকে। প্রজাগণ অলব্ধ বস্তু লাভ ও লব্ধ বস্তু পরিবর্দ্ধন করে। বৈদিক কর্ম্ম সমুদয় দোষ-শূন্য হয়; ঋতু সকল নিরাময় ও সুখাবহ হইয়া উঠে। মানব-গণের স্বর, বর্ণ ও মন নির্ম্মল হয়। ব্যাধি সমুদয় তিরোহিত হইয়া যায়। প্রজাগণ দীর্ঘায়ুঃ হইয়া কালযাপন করে। বিধবা স্ত্রী বা কৃপণ পুরুষ কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। পৃথিবী কৃষ্ট না হইয়াও শস্য উৎপাদন করে। ওষধি, ত্বক্, পত্র ও ফল-মূল

সমুদয় তেজঃসম্পন্ন হইয়া উঠে। অধর্ম্ম এক কালে তিরোহিত হয় এবং ধর্ম্ম সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়। সত্যযুগে এইরূপ ধর্ম্মেরই প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। রাজা যখন চতুষ্পাদ দণ্ডনীতির তিন পাদ গ্রহন করিয়া রাজ্য পালন করেন, সেই কালকে ত্রেতাযুগ বলে। পাপ এক পাদ মাত্র সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট না হইলে, প্রচুর পরিমানে শস্যোৎপাদনে সমর্থ হয় না। যখন রাজা দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অর্দ্ধাংশ গ্রহণ করিয়া প্রজাপালন করেন, সেই কালকে দ্বাপর যুগ বলে। দ্বাপর যুগে ধর্ম্মের দুই পাদ ভূমণ্ডলে সঞ্চারিত হয়। তখন পৃথিবী কৃষ্ট হইয়াও সত্যযুগে অকৃষ্টাবস্থায় যে ফল উৎপাদন করিত, তাহার অর্দ্ধেক ফল উৎপাদন করে। যে সময়ে নরপতি একবারে দণ্ড-নীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রজাগণকে বিবিধ প্রকারে কষ্ট প্রদান করেন, সেই কালকে কলিযুগ কহে। কলিযুগে সকলেই প্রায় অধর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত হয়। ধর্ম্মানুষ্ঠান তিরোহিত প্রায় হইয়া যায়। সকল বর্ণেরই স্বধর্ম্ম ত্যাগে প্রবৃত্তি জন্মে, শূদ্রেরা ভিক্ষা-বৃত্তি ও ব্রাহ্মণেরা দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। সমুদয় লোকই মঙ্গল হীন এবং সর্ব্বত্র বর্ণসঙ্কর প্রাদুর্ভূত হয়। বৈদিক কার্য্য সকল অপরিশুদ্ধ ও ধাতু সকল ক্লেশকর ও রোগজনক হইয়া উঠে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মনোবৃত্তি হ্রাস হইয়া যায়। নানা প্রকার ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু জীবগণকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। রমণীগণ বিধবা ও প্রজাগণ নৃশংস হইতে থাকে। নিরূপিত সময়ে বৃষ্টিপাত বা

শস্যোৎপত্তি হয় না, এবং সমুদ্র রসহীন হইয়া যায়। অতএব রাজাকেই সত্য ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের কারণ বলিতে হইবে রাজাদিগের ব্যবহারনিবন্ধন সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এই নিমিত্তই রাজা যুগস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হন।" উপরি উক্ত আখ্যায়িকা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আমরাই এই সকল সুখ-দুঃখ, রোগ-অনাময় ও সুভিক্ষ-দুর্ভিক্ষের হেতু; কারণ, আমরা সকলে যেমন কর্ম্ম করিব, আমাদের কর্ম্মফলও সেইরূপই প্রস্তুত হইতে থাকিবে। এই যে শস্যশ্যামলা সজল দেশে দুর্ভিক্ষ স্থায়ী আসন গ্রহণ করিয়াছে, নিত্য নব-নব ব্যাধি ও পীড়ার আক্রমণে লোকে অবিরত উৎপীড়িত হইতেছে, ইহাতেই বুঝা যায় আমাদের পাপ 'চারি পোয়া' পূর্ণ হইয়াছে। আবার যদি আমরা এই সকলের প্রতীকারের জন্য পুণ্যসঞ্চয়ে সচেষ্ট হই, তবে আবার বসুন্ধরা শস্যপূর্ণা ও সমস্ত প্রজার রোগহীন আনন্দমাখা মুখে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতে পারে। ধনে ধান্যে, জ্ঞানে পুণ্যে সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু হায়! ইহা যে আমাদের সকলের শুভ কর্ম্মের উপরই নির্ভর করিতেছে।

এখন আমরা প্রায় সকলেরই অধর্ম্মে 'গা ভাসান' দিয়াছি, সুতরাং আমাদের চরিত্রগত বল ক্রমশঃই হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। তাই দেশের লোক আর তেমন করিয়া দেশের কথা ও দেশবাসীর কথা ভাবেনা, মানুষ হইয়া মানুষের কষ্টের কথা বোঝে

না! ইহা কি অত্যন্ত মানসিক অবনতির অবস্থা নহে? এ অবস্থা হইতে মুক্তিলাভ না করিলে মনুষ্যত্বলাভে আমরা চিরকালই বঞ্চিত থাকিব। দেশে রোগ, দেশে দুর্ভিক্ষ, দেশের অধিকাংশ লোক মূর্খ ও অজ্ঞানী! ধনবানেরা বিলাস প্রমোদে মত্ত, দরিদ্র-দিগের দিকে একবার তাঁহাদের তাকাইবারও অবকাশ নাই! এই সকল জাতিগত ও সমাজগত দুর্ব্বলতা আমাদিগকে ঘেরিয়া আছে। যদি ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার পথ অন্বেষণ না করি, তবে সমস্ত পাপের বোঝা বৃহৎ ভারের মত আমাদের স্কন্ধে চাপিয়া বসিবে এবং তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার কোনও আশা থাকিবে না। তাই বলিতেছি, আবার এই সুপ্ত অলস হৃদয়কে জাগ্রত করিয়া তোল। ধন, শক্তি, বিদ্যা— যাহার যাহা আছে—সমস্তই আজ বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিবার জন্য আপনাকে প্রস্তুত করিয়া তোল। তবে তোমার উন্নতি হইবে, দেশবাসীর উন্নতি হইবে, দেশের উন্নতি হইবে, এবং এই পৃথিবীর কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রথমে কর্ম্ম করিবার যোগ্যতা লাভ করা চাই; এবং এজন্য লৌকিক বিদ্যা, ধন ও স্বাস্থ্য প্রচুর পরিমাণে থাকা আবশ্যক। বিদ্যা, ধন ও স্বাস্থ্য জীবনের প্রধান শক্তি, সুতরাং এই তিনটী লাভের যাহা অন্তরায়, তাহা দূর করিবার জন্য সমাজস্থ ও দেশস্থ সকলেরই প্রাণপণে চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। যে স্বাস্থ্যহীন, সে অকর্ম্মণ্য। তাহার দ্বারা কোন শুভ কার্য্য হইবার আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র! এই জন্য শরীরকে সবল, পুষ্ট, সুস্থ ও কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্য, স্বাস্থ্যকর আহার

বিশুদ্ধ পানীয় ও নির্ম্মল বায়ু সেবন, যথাবিধি অঙ্গচালনা, ব্যায়াম এবং ইন্দ্রিয় সংযম আবশ্যক। এই সকলের জন্ত আবার অর্থের আবশ্যক। সুতরাং সদুপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে হইলে বিদ্যার্জ্জনের নিমিত্ত যত্নবান হইতে হইবে। অর্থোপার্জ্জনের জন্ত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়—সেই জন্ত সুখাদ্য ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস ও নিয়মিত ব্যায়াম, ক্রীড়া প্রভৃতি করা আবশ্যক। এই সকল বিষয়ে অবহিত হইলে আমরা আধিভৌতিক বল লাভে একপ্রকার সমর্থ হইব। তার পর হিত, অহিত, হেয়, উপাদেয় প্রভৃতি কি তাহা জানা এবং এই সকলের ত্যাগ ও গ্রহণের জন্ত মানসিক পটুতা ও বিচারবান হওয়া আবশ্যক। সে জন্ত সদ্বিদ্যার আলোচনা এবং সজ্জন সমাজে যাতায়াত আবশ্যক। কাম ক্রোধাদি রিপু সমূহ বিষয়াদি সংস্পর্শে অধিকতর উত্তেজিত হয়, তাহাদিগকে ন্যায্য পথে পরিচালনার জন্ত মনের দৃঢ়তা, সত্যভাবন, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সচ্চিন্তা, সদ্গ্রন্থের আলোচনা ও পরোপকারাদি বৃত্তি সমূহকে মার্জ্জিত ও উন্নত করা একান্তই প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহকে সুপুষ্ট রাখা কর্ত্তব্য হইবে এবং সে জন্ত দেব দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞের সেবা সাধন ভজন, বৈরাগ্য ও সাধুসঙ্গ করার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। এই সকলের যথাযথ অনুষ্ঠানে জ্ঞান ও ভক্তির উদয় হয় এবং তাহার ফলে ধৈর্য্য, সন্তোষ জ্ঞান ও শান্তির বিকাশ হয়। চেষ্টা ও উদ্যোগ সহকারে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিশক্তিকে জাগ্রত

করিতে পারিলেই আমাদের জীবন যথার্থ ভাবে কৃতকৃত্য ও ধন্য হইতে পারে।

পূর্ব্ব কর্ম্মফলে যে অদৃষ্ট সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু তাহার নিদারুণ অংশ ফলদানোন্মুখ হইবার পূর্ব্বেই যদি আমরা শুভকর্ম্মের দ্বারা শুভাদৃষ্টসঞ্চয়ে আগ্রহ প্রকাশ না করি, তবে ভীষণ বিনাশ হইতে আমাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না।

তৃতীয় অধ্যায়।

পুরুষকার।

যোগবাশিষ্ঠের মুমুক্ষুপ্রকরণে জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠদেব ত্রিলোক-পাবন শ্রীরামচন্দ্রকে নিম্নলিখিত উপদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন :—

"দৈবই বল প্রদান করে ইহা মূঢ়ের কল্পনা, কেননা পুরুষকার ভিন্ন সিদ্ধিলাভ সম্ভব নহে। সৎপথ আশ্রয়পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করাকেই পৌরুষ কহে।

পৌরুষ কাহাকে বলে।

দুর্ব্বল ও বলবানে যুদ্ধ ঘটিলে যেরূপ দুর্ব্বলের পরাজয় হয়, দৈব ও পৌরুষ এই উভয়ের মধ্যে তেমনি দৈবেরই পরাজয় হইয়া থাকে। যেরূপ লঙ্ঘনাদি দ্বারা অজীর্ণাদি রোগের উপশম হয়, তদ্রূপ ঐহিক পৌরুষ প্রাক্তন পৌরুষকে বিনষ্ট করে। কত শত মহাপুরুষ দৈবদুর্ব্বিপাকে দুর্নিবার দারিদ্র্যজনিত দুঃখে পতিত হইয়াও, পরে পুরুষকারপ্রভাবে মহেন্দ্রসাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন। পুরুষকার বলে বৃহস্পতি দেবগণের ও শুক্র দৈত্যসমূহের আচার্য্য হইয়াছেন। দীন হীন

পুরুষকার বড় না দৈব বড় ?

সামান্য ব্যক্তিও পুরুষকারের আশ্রয়ে ইন্দ্র-তুল্য ঐশ্বর্য্য লাভ করে। পৌরুষবলেই পুরুষের অভীষ্টসিদ্ধি ও বুদ্ধিবিক্রম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দুঃখের সময়ে নির্ব্বুদ্ধিতাবশতঃ দৈব আশ্রয় করা মনকে আশ্বাস দেওয়ামাত্র। যাহার পৌরুষ নাই, সে আপনার অপেক্ষা উন্নতিশালী ব্যক্তি-

দিগের উন্নতিকে দৈবমূলক মনে করে। দৈবই যদি সমস্ত করে, তবে অন্যের নিকট উপদেশ গ্রহণের প্রয়োজন কি ?"

অদৃষ্টের অর্থ, যাহা দেখা যায় না। কার্য্যের মধ্যে যে ফল নিহিত আছে তাহা বাস্তবিকই কেহ দেখিতে পায়না অর্থাৎ যাহা চেষ্টা ও পুরুষকারের সাহায্যে আয়ত্ত করিতে হয়।

দৈব কি ?

গোলাপের কলমে তাহার নবীন পত্র-পল্লব, পুষ্প-গন্ধ বা শোভা কিছুই থাকে না; জল সেচন করিতে করিতে,যত্ন করিতে করিতে পরে সেই কণ্টকমাত্র-সার, শুষ্কপ্রায় শাখা হইতে নবীন পত্র-পল্লব উদ্গত হইতে থাকে। ক্রমশঃ চেষ্টার ফলে তাহা বৃক্ষাকারে পরিণত হয়, নব নব পত্র-পল্লবে বিভূষিত হইয়া উঠে, এবং আরও অধিকতর যত্নের ফলে পল্লবগুলিকে ভিন্ন করিয়া নবীন শোভায় নব কলিকারাশি অঙ্কুরিত করে। কালক্রমে তাহাই আবার পূর্ণ বিকাশ লাভ করিয়া অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও গন্ধে জগৎকে মুগ্ধ করে। ইহা যদি আশ্চর্য্যজনক ও বিস্ময়কর না হয়, দৈবপ্রভাব না হয়, তবে মনুষ্যের মধ্যে যে সুপ্ত গুণাবলী বর্ত্তমান রহিয়াছে, চেষ্টা ও যত্ন করিলে কেন তাহা প্রকাশিত ও প্রস্ফুটিত না হইবে ?

পুরুষকার কি নিষ্ফল চেষ্টামাত্র ?

অনেকে বলেন, দেখা যায় যে যথেষ্ট আগ্রহ, যত্ন, চেষ্টা করিয়াও একজনের কাজ সফল হয় না; আবার আর একজন কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়াও, যথেষ্ট ফল লাভ করে; তখন তাহাকে দৈব বলিব না তো কি বলিব ? বরং ইহাই বুঝিব, যে

দৈবই বলবান্, পুরুষকার নিষ্ফল চেষ্টামাত্র। অবশ্য, কতকগুলি ঘটনা যে এরূপ ঘটে তাহা নিশ্চিত; তাহা হইলেও, পুরুষকারকে নিরর্থক বলা চলে না। কারণ, তুমি যাহাকে দৈব বলিতেছ, তাহাও পূর্ব্ব জন্মেরই কর্ম্মফল। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলে যদি কাহারও ধনলাভ বা ধর্ম্মলাভ স্থির হইয়া থাকে, তবে স্বল্প চেষ্টা করিলে তাহার চলে বটে, কিন্তু যাহার কর্ম্মফলে দুর্ভাগ্যের সহিত, প্রতিকূল অবস্থার সহিত বিরোধ করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে, তাহার পুরুষকার ভিন্ন আর উপায় কি? যতই অদৃষ্ট বিরূপ ও বিরুদ্ধ থাকুক, পুরুষকার দ্বারা কতকটা যে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারা যায়, সে বিষয়ে সন্দেহ করা নিরর্থক। পতিব্রতা সাবিত্রী ও রাজর্ষি ধ্রুবের জীবন ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। তবে অবশ্য, সময়ে সময়ে এমন দৃষ্টান্তও দেখা গিয়াছে যে, সুচিন্তিত পুরুষকারেও কোন ফল হয় নাই। ইহাতে পুরুষকারের কোন দোষ নাই; সেখানে বুঝিতে হইবে কোন উৎকট অতীত কর্ম্ম ফলদানোন্মুখ হইয়াছে, এবং সেইজন্যই তাহা ভীষণ বাধারূপে বর্ত্তমান উন্নত কর্ম্মচেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার প্রয়াস করিতেছে। কিন্তু এরূপ বাধা অধিকাংশ স্থলে অধিক দিন ব্যাপিয়া থাকিতে পারে না। কর্ম্মফলের পরিভোগান্তে তাহা নবীন পুরুষকারশক্তিকে পথ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়, এজন্য শুদ্ধ ধৈর্য্য আবশ্যক। যোগবাশিষ্ঠে আছে যে, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, আর এ জন্মের কর্ম্ম, এই দুইটি পরস্পরের পরাজয়েচ্ছু মেষদ্বয়ের মত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে, এবং যাহার

পুরুষকার সর্ব্বথা অবলম্বনীয় কেন?

কারণ এজন্ম যদি চেষ্টা না করি, তবে আগামী জন্মে বাধা আরও প্রবলরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে অধঃপতিত করিবার চেষ্টা করিবেই করিবে। পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের শীর্ষস্থানীয় মহাত্মা সক্রেটিস্‌কে একজন মুখচিহ্নাভিজ্ঞ (Physiognomist) ব্যক্তি বলিয়াছিলেন যে, তিনি বড় কামুক। তাহাতে তাঁহার শিষ্যমণ্ডলী ক্রুদ্ধ হইয়া সেই গণৎকারকে লাঞ্ছিত করিতে চেষ্টা করে। তখন সত্যপ্রিয় সক্রেটিস্ শিষ্যদিগকে বাধা দিয়া বলেন, "কেন তোমরা উহাঁকে পীড়ন করিতেছ? উনি সত্য কথাই বলিয়াছেন; বাস্তবিকই আমি ভয়ানক কামুক। তবে সাধারণ লোক হইতে আমার প্রার্থক্য এই যে, আমি উদ্দাম ইন্দ্রিয়কে বলপূর্ব্বক অন্যায় কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখিতে পারি, অন্যলোকে তাহা না পারিয়া অন্যায় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়।" ইহা দৈবাধীন প্রবৃত্তির হস্ত হইতে পুরুষকার দ্বারা কিরূপে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইতে পারে তাহারই একটি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এইরূপ প্রযত্ন সকলকেই করিতে হইবে; নচেৎ এজন্ম তো গেলই, জন্ম জন্মান্তরও নষ্ট হইয়া যাইবে।

অবশ্য একটি কথা মনে হয় বটে যে, সাধক সাধ্যবস্তু লাভের জন্য প্রাণপাত করিয়া চেষ্টা করিতেছেন, অথচ সিদ্ধি মরুভূমির মরীচিকার মত অনায়ত্ত হইয়া রহিল। এরূপ অবস্থায় নবীন সাধকের পক্ষে ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন নহে কি? কঠিন তো বটেই, কিন্তু তথাপি চেষ্টা বা পুরুষকারের সাহায্যে এই দুর্গম ভীষণ পথকে অতিক্রম না করিলেই নয়। জ্ঞানীরা এই জন্যই ইহাকে

ক্ষুরধার দুর্গম পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহু চেষ্টাতেও যখন বাঞ্ছিতবস্তুপ্রাপ্তি নিতান্তই অসাধ্য হইয়া পড়ে, তখন সাধকের প্রাণে শতবৃশ্চিকদংশনজ্বালা অনুভূত হয় সত্য, তবুও যিনি ক্ষোভে দুঃখে ব্যাকুল না হইয়া নিরন্তর তাঁহার উদ্যত চেষ্টাকে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া রাখেন, এবং বৎসের প্রতি হৃতবৎসা গাভীর ন্যায় দৃষ্টিকে সেই লক্ষ্যাভিমুখেই একান্ত উন্মুখ করিয়া রাখেন; সহস্র বিঘ্ন পুনঃ পুনঃ বাধা দিয়াও যাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না, সেই সার্থকজন্মা পুরুষেরই সিদ্ধি করতলগত হয়। তাঁহার দুঃখের ঘনঘোরঘটা অপসারিত করিয়া সাধনাসিদ্ধির নির্ম্মল কৌমুদী সমস্ত চিত্তাকাশকে এক অপূর্ব্ব জ্যোৎস্নায় বিমণ্ডিত করিয়া তুলে।

পূর্ব্বকর্ম্মকে বাধা দিয়া সিদ্ধিলাভ।

বুদ্ধদেবের কথা তো সকলেই শুনিয়াছেন। তপস্যায় দেহ কঙ্কালসার হইয়াছে, প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে, তথাপি তিনি সুমেরুর ন্যায় অটল! বিবিধ মায়া ও রাশি রাশি প্রলোভন তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু সেই আদর্শ তপস্বীর তপস্তেজের নিকট সেই সমস্ত কাম্যবস্তু ও মায়ামোহ ভস্মীভূত হইয়া গেল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন :—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মিতশ্চলিষ্যতে॥"

শরীর ও ভোগ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, পরমার্থ বিষয়েও সেই একই সিদ্ধান্ত করিতে গিয়া লোকে ভুল করিয়া বসে। পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপ ভোগাদি যাহা আসিয়া পড়ে আসুক, তাহার জন্ত ব্যাকুল হইয়া সমস্ত চেষ্টাকে সেই দিকে উন্মুখ করিয়া রাখায় কোন লাভ নাই। সে যেমন ভাগ্যে আছে তাহাই হউক, তাহার বেশী চাহিয়াও বিশেষ ফল নাই। কিন্তু যাহা আমার নাই, যাহা সংগ্রহ করিতেই হইবে, এইরূপ বিমুক্তি লাভের সাধনাতেও দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা বুদ্ধিমানের লক্ষণ তো নয়ই, কর্ম্ম বিমুখ আলস্য পরায়ন ব্যক্তির ইহা এক প্রকার আপনাকে আপনি ছলনা করা মাত্র। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রাজ যোগী, পূজ্যপাদ ৺শ্যামা-চরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন "পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে এ দেহটা পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে সুখ দুঃখ দুই পূর্ব্ব কর্ম্মানুরূপ ভোগ হইয়া যাইবে। তা রাজাই হও, আর ভিখারীই হও। সুতরাং সংসার যাত্রার জন্ম, যাহা না করিলে নয়, তাহাই করিবে, উহার জন্য বহু প্রয়াস করিয়া লাভ নাই। শরীর যখন ধারণ করিয়াছ তখন সুখ, দুঃখ আসিবেই; আহার, বাসস্থান, আচ্ছাদন ভালই হ'ক, মন্দই হ'ক মিলিয়া যাইবে। কিন্তু তোমার মুক্তির সম্বল যথেষ্ট নাই, তাহা যদি থাকিত তুমি জন্মাইতে না, অতএব তোমার সমস্ত পৌরুষ ঐ দিকে প্রয়োগ কর, যাহাতে জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে এড়াইতে পার। এই নরতনু ধারণের যে উদ্দেশ্য তাহা যেন বিফল না হইয়া যায়।"

কেহ কেহ বলেন কর্ম্মে বন্ধন আনয়ন করে, অতএব ভাল

অন্য কোন কর্ম্ম না করাই ভাল। তাহাও ঠিক নহে। কর্ম্মে যাহার অধিকার, তাহার কর্ম্ম না করা অকর্ত্তব্য। সাংখ্যাচার্য্যরা যে অবস্থায় কর্ম্ম ত্যাগের উপদেশ করেন তাহা সকলে বুঝিতে না পারিয়া কর্ম্ম বন্ধনের হেতু ভাবিয়া কর্ম্মমাত্রকেই ত্যাগ করিয়া থাকেন। তাহার উত্তরে ভগবান বলিয়াছেন "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" (ঈশ্বর প্রীতির জন্য ভগবানকে লক্ষ্য রাখিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহা ছাড়া অন্য কর্ম্মে পুরুষকে আবদ্ধ করে।) সেই জন্যই ঝঞ্ঝাট হেতু বা দুঃখ বোধ হেতু কর্ম্ম বিমুখ অর্জ্জুনকে ভগবান বলিলেন কর্ম্মেই তোমার অধিকার, তোমার সত্ত্বসংশুদ্ধি হয় নাই, তুমি বৈরাগ্যের বৃথা ভাণ করিলে কর্ত্তব্য অকরণ হেতু ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। অতএব "নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ। শরীর যাত্রাঽপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ॥" কর্ম্মের অনস্নুষ্ঠান হইতে কর্ম্মানুষ্ঠান "জ্যায়ঃ" প্রশস্ততর। সর্ব্ব কর্ম্ম শূন্য হইলে তোমার শরীর নির্ব্বাহই যে হইবে না।

"শাস্ত্রীয় ও অশাস্ত্রীয় দুই প্রকার পৌরুষ আছে। তন্মধ্যে শাস্ত্রীয় পৌরুষে পরমার্থসিদ্ধি ও অশাস্ত্রীয় পৌরুষে অনর্থবৃদ্ধি হইয়া থাকে।"

শাস্ত্রীয় পুরুষার্থ দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি ও তাহার লক্ষ্য

"পরাচঃ কামাননুযন্তি বালাস্তে
মৃত্যোর্যান্তি বিততস্য পাশম্।
অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥" কঠোপনিষৎ।

অল্পবুদ্ধি মানবেরা বাহ্য কাম্য বস্তুসমূহ অনুসরণ করে ও

তাহাতে সর্ব্বব্যাপী মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়; কিন্তু মেধাবিগণ ধ্রুব অমৃতত্বকে জানিতে পারিয়া সংসারে অধ্রুব পদার্থের মধ্যে কিছুই প্রার্থনা করেন না।

শারীর পুরুষকার কি কি? গীতায় অভিমত

"দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥"

তপস্যা তিন প্রকার। শারীরিক, বাচিক ও মানস। দেব, দ্বিজ, গুরু এবং জ্ঞানীদের পূজা, শৌচ, সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য, এই তপস্যাগুলি শরীর দ্বারা সম্পাদ্য। যাহাতে লোকের উদ্বেগ না হয় এরূপ বাক্য সত্য বাক্য, প্রিয়বাক্য, হিতকর বাক্য, এবং বেদাভ্যাস এইগুলি বাক্ সাধ্য তপস্যা; আর চিত্তের প্রসন্নতা অক্রূরতা, মৌনাবলম্বন, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ ও ভাবশুদ্ধি (মনে একখানা মুখে আর একখানা নয়) প্রভৃতি মানসিক তপস্যা অর্থাৎ মনের দ্বারা সম্পাদ্য।

যোগবাশিষ্ঠ

"সর্ব্বদা দান ও ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিবে, বেদাভ্যাস ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিবে, ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বদিগকে সংযত করিয়া শান্তি মার্গে বিচরণ ও সর্ব্বভূতে সমদর্শিতাসহকৃত দয়া প্রদর্শন করিবে; সরলতা অবলম্বন করিবে, ও পরদ্রব্যে লোভ বিসর্জ্জন করিবে, এবং জীবমাত্রের অনিষ্ট-

চিন্তার পরিহার ও পিতা-মাতা প্রভৃতি গুরুজনের যথাবিধি সেবা করিবে। ইহাই সুখ ও ধর্ম্মলাভের উপায়,এবং ইহাকেই সনাতন ধর্ম্ম বলে। যে ব্যক্তি এই সকলের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কখন দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। যোগপরায়ণ পুরুষগণ এই প্রকার সদনুষ্ঠানসংসক্ত ব্যক্তিগণ অপেক্ষা ও শ্রেষ্ঠ, কারণ যোগ-বল ভিন্ন সংসারবন্ধনচ্ছেদনের সহজ উপায় আর নাই। উল্লিখিত দয়াদি সদাচার দ্বারা বহুকালে সংসারমুক্তিলাভ হয় বটে, কিন্তু যোগবলে অচিরাৎ মুক্ত হইতে পারা যায়।"

"ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্ ॥"

মনুসংহিতা

"স্বাধ্যয়েনার্চ্চয়েতর্ষীন্ হোমৈর্দেবান্ যথাবিধি।
পিতৄন্ শ্রাদ্ধৈশ্চ নৄনন্নৈর্ভূতানি বলিকর্ম্মণা ॥"

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অচৌর্য্যবৃত্তি, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তত্ত্বজ্ঞান, বিদ্যা, সত্যপালন এবং অক্রোধ এই দশটী ধর্ম্মের লক্ষণ।

বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদিগের হোমকর্ম্মদ্বারা দেবতাদিগের, শ্রাদ্ধদ্বারা পিতৃগণের, অন্নদ্বারা মনুষ্য ও ইতর জীবগণকে আহার দ্বারা সৎকার করিবে।

দেহাদির ক্লেশ ও উচ্ছৃঙ্খল চিত্তের কত শত অসংযম মান-বাত্মাকে নিরন্তর ব্যাকুল করিয়া রাখে; সুতরাং হোমযজ্ঞাদি ক্রিয়াযোগ, গায়ত্র্যুপাসনাদি মন্ত্রযোগ ও যমনিয়মপ্রাণায়ামাদি লয়যোগ দ্বারা চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারিলে, জন্মজন্মার্জ্জিত

দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি ঘটে, অন্য উপায় নাই। অতএব প্রকৃষ্ট সংগ্রামের জন্য সজ্জিত হওয়া আবশ্যক। আমি দুর্ব্বল বলিয়া, বসিয়া বসিয়া একটু তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলেই যে, তিনি আমাদের শিরে জয়শ্রী ও সৌভাগ্য বর্ষণ করিবেন এ আশা করা বাতুলতামাত্র। চেষ্টা না করিয়া অকস্মাৎ কেহ স্থিরচিত্ত যোগী হইতে পারেনা; ইহাতে দৈব দুর্দ্দৈবেরই মত কার্য্য করে এবং শুধু মনুষ্যের চিরন্তন উন্নতির পথকে অবরোধ করিয়া রাখে মাত্র। সুতরাং, ভবরোগপীড়িত পুরুষের পক্ষে পৌরুষই একমাত্র পথ্য।

বিধিসঙ্গত পুরুষকারের অব্যর্থ ফল।

শাস্ত্রসঙ্গত ও বিধিসম্মত পুরুষকার প্রয়োগে যদি কিছু না হইবারই হইত, তাহা হইলে আমি বলিতাম, এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা, সত্য, জ্ঞান, ধর্ম্ম, এ সমস্তই ধাঁধা, শুদ্ধ ফাঁকিমাত্র! জীবের সুখদুঃখাদি সমস্তই নিয়তির কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত; এ জগতে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা নাই। ভগবান যদি থাকেন তবে তিনিও মস্ত একটি ভণ্ড ও প্রতারক! তিনি এ পর্য্যন্ত মনুষ্যকে যে সমস্ত আশ্বাসবাণী শুনাইয়াছেন, তাহাও প্রতারণা বই আর কিছুই নহে। কিন্তু ভগবান্‌কে সে কলঙ্কের ভাগী করা যায় না; তাঁহার বাক্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য; নিষ্কলঙ্ক তিনি, কেন কলঙ্ক বহন করিবেন? ভক্তেরা তাই তাঁহাকে আদর করিয়া "নিরঞ্জন" বলেন। তিনি নিজ হস্তে ভক্তের কলঙ্ককালিমা বরং মুছাইয়া দেন; তাই ভক্তরা তাঁহাকে আর একটী নাম দিয়াছেন "কলঙ্কভঞ্জন"। আশাকরি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সত্য-

বাদী বলিতে কাহারও সম্ভবতঃ দ্বিধা নাই; অতএব তাঁর শ্রীমুখের বাণী, আর একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। তিনি বলিতেছেন :—

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥"

"উদ্ধরেৎ," "ন অবসাদয়েৎ", "তয়ো র্ন বশমাগচ্ছেৎ", এই সকল বিধি বাক্যগুলি প্রয়োগ করা নিতান্তই অসঙ্গত হইত, যদি আপনাকে আপনার উদ্ধার করিবার শক্তি আমাদের মধ্যে মোটেই না থাকিত, অথবা জড়তাপঙ্কে অবসন্ন হইয়া পড়িবার সময়ে তাহাকে বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই আমাদের না থাকিত। তবে "তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" এ কথা বলিয়া সাবধান করিবারও কোন প্রয়োজন থাকিত না। আমাদের সঙ্গে ভগবানের পরিহাসের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়না। এক দিকে সাবধান করিবেন, এবং অন্য দিকে আমাদের নিস্ফলতার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া হাঁসিতে থাকিবেন, ভগবানের এমন ভাব, তাঁহার অসূয়াকারী নাস্তিকেরাও বোধ হয় কথন কল্পনা করিতে পারে না। সুতরাং যখন বঞ্চিত হইবার আশঙ্কা নাই, তখন তিনি যে সম্বলগুলি আমাদের সঙ্গে দিয়া এই ভবসংসারে পাঠাইয়াছেন, সেইগুলিকেই কর্মোপযোগী সুশাণিত করিয়া রাখাই কি আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিবার প্রকৃষ্ট উপায় নহে?

পুরুষকার বা চেষ্টা ভগবানের অভিপ্রেত নিয়ম

অতএব হে বন্ধুগণ, অনর্থক ভয়বিহ্বল হইয়া সংগ্রামক্ষেত্র হইতে পলাইবার চেষ্টা হইতে বিরত হও! যথার্থ যে শক্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাকে অবিশ্বাস করিও না। আমাদের মধ্যে শক্তি যথেষ্ট আছে বলিয়াই, ভগবান্ মানুষের স্মরণার্থ এই কথাগুলি গীতায় তাঁহার ভক্ত সখাকে শুনাইয়াছিলেন। আজও তাঁহার ভক্ত সেবকেরা তাঁহাদের নিভৃত অন্তঃকরণে ভগবানের এই উপদেশ-বাণী ধ্বনিত হইতেছে শুনিতে পান।

আপনাকে রক্ষা করিবার শক্তি আপনার মধ্যেই আছে

ইহা শুনিয়া কেহ কেহ বলিবেন 'একি কথা! সকলের কর্তা ভগবান্, আমরা তো তাঁহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকামাত্র, আমাদের আবার ক্ষমতা কি? তিনি যা করেন তাই হয়, অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মারাই আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে, ইত্যাদি।' অবশ্য এ সব কথায় যথেষ্ট বিনয়প্রদর্শন হয় সত্য, কিন্তু ইহাতে কে সত্যের মর্য্যাদা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অহঙ্কার করা বড়ই দোষের, এসম্বন্ধে কোন মতবিরোধ ঘটিতে পারেনা; কিন্তু যথার্থ ই যে শক্তি আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, তাহাকে স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে অমান্য করা হয় বলিয়া আমার ধারণা নাই। বরং তদ্বিপরীতেই তাঁহার অবমাননা করা হয় বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমার মধ্যে যে শক্তি আছে, সে শক্তি আমি কোথা হইতে পাইয়াছি? এওত সেই ঐশী শক্তি। আমার মধ্যে তাঁহারই শক্তির লীলা, এ তাঁহারই মহিমা। মূঢ়তা-

।শতঃ আপনার মধ্যে ভগবানের প্রত্যক্ষ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া যে মিথ্যা কল্পনায় মোহে বিভ্রান্ত হয় এবং পুরুষকার-প্রয়োগে সেই আত্মশক্তিকে বহুধা কর্ম্মের মধ্যে বিনিয়োগ করিয়া ভগবৎপ্রদত্ত শক্তির মাহাত্ম্য বুঝিতে না চায়, পরন্তু অলীক দৈবের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে, সেই অলস উৎসাহহীন ব্যক্তি পদে পদে প্রতারিত ও লাঞ্ছিত হয়, এবং সর্ব্বত্র উপহসিত হইয়া থাকে।

নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস মানেই ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস

বেদ জীবের ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

জীব অবজ্ঞার বিষয় নহে।

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া
সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্য-
নশ্নন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥" মুণ্ডক।

"সর্ব্বদা একসঙ্গযুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবপ্রাপ্ত দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে একটি স্বাদু ফল ভক্ষণ করে, অপরটি ভোজন না করিয়া দর্শন করে।"

জীব ও ঈশ্বরের ভেদ কি তুলনা নহে।

"সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নো-
হনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশ—
মস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥"

"জীব একই (শরীররূপ) বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া দৈন্যবশতঃ

মুহ্যমান হয় ও শোক করে; কিন্তু সে যখন আপনা হইতে ভিন্ন সুখ-দুঃখের অতীত ঈশ্বরকে ও তাঁহার মহিমাকে দর্শন করে, তখন ইহাতেই বিগত শোক হয় (অর্থাৎ, তাহার ক্ষুদ্র সত্তা অসীম অনন্ত সত্তায় হারাইয়া ফেলে। তখন সে শোক দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বভাবের অস্তিত্বই বুঝিতে পারে না)।”

আমরা যে ‘আমি’ ‘আমি’ করিয়া অহঙ্কারে উন্মত্ত হই, সে ‘আমি’ মিথ্যা ‘আমি’, তাহার কোন যোগ্যতাই নাই। এই তুচ্ছ মোহকর মিথ্যা অহংজ্ঞান, কুজ্ঝটিকা যেমন সমুজ্জ্বল সূর্য্যালোককে ঢাকিয়া রাখে, তেমনি প্রকৃত “আমি” বা আত্মজ্ঞানকে ঢাকিয়া রাখে। সাগর যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে না পারিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, তদ্রূপ এই মন সত্য পদার্থকে বুঝিতে না পারিয়া নিরন্তর বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে, এবং তাহাতে শান্তি আনন্দ কিছুই না পাইয়া মর্ম্মভেদী স্বরে রোদন করিয়া উঠিতেছে। মন যে এত কষ্ট পাইতেছে, তবু তাহার কিছুতেই মোহ ঘুচিতেছে না, অভিমান ও ছুটিতেছে না। এইরূপ আমিত্বের অভিমান যথার্থ অহংকার বটে, কিন্তু আমার সত্য ‘আমি’ ও আছে—যাহা সনাতন, যাহা নিত্য ও ধ্রুব। এই সত্যের মহিমাদর্শনেই জীব বিগতশোক হয়। এই ‘আমি’কে অস্বীকার করাও যা, সত্যকে অস্বীকার করাও তাই।

অনেকে বলিতে পারেন, বিশ্বশক্তির তুলনায় আমার শক্তি তুচ্ছ, নগণ্য; তাহার উপর নির্ভর করা একপ্রকার পাগলামি। আমি বলি পাগলামি কিছুতেই নয়। পরমাত্মারই স্ফুলিঙ্গ

তো এই জীব; ইহার মধ্যেও সেই ঐশী শক্তি বিরাজ করিতেছে। ভগবান্ সত্যসঙ্কল্প; সুতরাং তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্পই সত্যের রূপ ধারণ করে। মানবের সঙ্কল্পও সমস্ত সিদ্ধ হ'তে পারে, কেবল তাহার চিত্তকে বিশুদ্ধ করিতে পারিলেই হইল। এই চিত্তের অবিশুদ্ধতাই ঈশ্বর হইতে তাহাকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই জীব যখন আবার বিশুদ্ধ হইয়া সত্যসঙ্কল্প হয়, তখন এ জগতের কোন বস্তুই তাহার অনায়ত্ত থাকে না। এইরূপ বিশুদ্ধ চিত্তেই, "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী" হইয়া থাকে।

জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদ কিরূপ?

সুতরাং যখন আমি নিরহঙ্কার হইয়া অপ্রমত্তভাবে আমার শক্তির উপর নির্ভর করি, তখন আমার তাঁহারই শক্তির উপর নির্ভর করা হয়। এই যে আমার মধ্যে তাঁহার শক্তি তাহা নগণ্য নয়, ক্ষুদ্র ও নয়। আমার মূঢ়তাই সেই অসীম শক্তিকে ক্ষুদ্র বলিয়া ভ্রম জন্মাইতেছে; ইহারই নাম অবিদ্যা। যেমন আমার চক্ষুর শক্তির অভাববশতই আমি সূর্য্যকে ক্ষুদ্র দেখি, কিন্তু সূর্য্য বাস্তবিক ক্ষুদ্র নয়, তদ্রূপ সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাববশতই আমি আমার ভিতরকার শক্তিকে সামান্য মনে করি। কিন্তু ইহা কি সত্য নয় যে, একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডেও যে শক্তি বিরাজিত, একটি স্ফুলিঙ্গের মধ্যেও সেই প্রচণ্ড বিশ্বদাহিকা শক্তি বিদ্যমান, এবং আধার পাইলেই সে আপনাকে বৃহৎ হইতে বৃহত্তররূপে প্রকাশ করিতে পারে। তদ্রূপ শোকে মোহে বিমূঢ় এই জীবই আবার

যখন আপনাকে জানিতে পারে, তখন তাহার সংশয়শূন্য বাধাহীন জ্ঞান, অনন্তস্পর্শী প্রেম, চিন্ময় মধুর রসের প্রকাশ, তাহাকে নিত্য সত্য নির্ব্বিকার দ্বন্দ্বাতীত ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝাইয়া দেয়; তখন আর সে রোগে শোকে ও দেহেন্দ্রিয়ের বিকার-সমন্বিত মোহে ম্রিয়মান সামান্য ক্ষুদ্র জীব নহে; তখন সেও পূর্ণশক্তিমান্, অসীমবীর্য্যসম্পন্ন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, আনন্দ-শান্তির নিত্য নির্ঝর, অম্লান বসন্তকুসুমের মনোহর সৌরভে চিরপ্রফুল্ল ব্রহ্মানন্দনরূপ অমৃতপানে অমর, পরমাত্মার প্রিয়তম অভিন্নহৃদয় সখা।

অনন্তের মহিমাই এই যে, তাহা সর্ব্বত্রই অনন্ত, সর্ব্বাধারেই সীমাবিহীনভাবে অবস্থিত। প্রত্যেক জীবও সেই জন্য এক প্রকার অসীম অনন্ত। তবে যে সকল মহাত্মারা বলেন, ঈশ্বরভিন্ন আর কাহারও কর্ত্তৃত্ব নাই, তাঁহারা কি ভুল বলেন? এবং তাহা হইলে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"—গীতার এই শ্লোকেরই বা অর্থ কি? ইহাও মিথ্যা নহে। ইহা অনুভবসাধ্য এবং ইহারও অনুভবের একটী সময় (stage) আছে। প্রাকৃত জনের মত ঈশ্বরবাক্যে কখন ভ্রান্তি থাকিতে পারে না। অতএব ইহারও মানে আছে, বুঝিবার অবস্থা আছে। অবস্থাভেদে ভাবের ভেদ হয়। ছেলে মানুষের মুখে যদি বুড়োর মত কথা শুনা যায়, তাহাকে আমরা জ্যাঠামি বলি; কিন্তু বৃদ্ধের মুখে সে কথা শুনিলে প্রাজ্ঞোচিত বাক্য বলিয়া তাহাকে শ্রদ্ধা করি! এই দুইটি অবস্থার কথা আরও

একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। বাল্যকাল, যৌবন-কাল বা প্রৌঢ়াবস্থা একই মানুষের তিনটি অবস্থা বটে, কিন্তু অবস্থাভেদে কার্য্যের ভেদ আছে। বাল্যকালে আমরা বালকের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখি; তাহার অশন, উপবেশন, ভ্রমণ, অধ্যয়ন, শয়ন, ক্রীড়া সকল অবস্থার মধ্যেই তাহাকে খানিকটা চোখে চোখে রাখিবার আবশ্যকতা আছে। নচেৎ মনুষ্যের যে বৃহৎ আদর্শ তাহার মধ্যে আছে, তাহা পরিস্ফুট হইবার পক্ষে বিলক্ষণ বাধা পায়। পিতা মাতা সেই বাধাগুলি সরাইয়া দিয়া বালকের জীবনপথকে বাধাশূন্য করিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু সেই বালকই যখন বড় হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বেশ প্রাজ্ঞ হইয়া উঠে, তখন আর ততটা নজর রাখার আবশ্যক হয় না। কারণ, তখন সে নিজেকে নিজে রক্ষা করিবার শক্তিলাভ করিয়াছে। একই মানুষকে যেমন বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নভাবে চলিতে হয়, সেইরূপ মানুষের অন্তঃশক্তিবিকাশভেদেও কর্ত্তব্যের বিভিন্নতা স্বীকার করিতে হয়। বাহিরের কর্ত্তব্য যেমন আমরা কোন প্রকারে করিয়াই খালাস, অন্তঃশক্তি বিকাশের জন্যও কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে তাহা কোন প্রকারে করিলেই যে সব হইয়া গেল তাহা নহে। তাহা জোর জবরদস্তি, ধস্তাধস্তিতে যে বাড়িবে তাহাও নহে; নির্ব্যাকুলচিত্তে সেই কর্ত্তব্যগুলি পালন করিতে করিতে তবে অন্তঃশক্তি ধীরে ধীরে বিকশিত হইতে থাকে; এবং সঙ্গে সঙ্গে তদনুরূপ সার্থকতা লাভ হইতে থাকে, এবং দেহ ও মনের আবরণগুলি টুটিতে থাকে। ইহার প্রথম অবস্থায় 'অহংভাব'

থাকে, না থাকিলে, সাধনাতে প্রবৃত্তিই আসিতে পারে না। সেইজন্য সব সাধনাই প্রথম অবস্থায় সকাম অবস্থায় যদি সাধনায় প্রবৃত্তি না আসে, তবে তত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে কোথা হইতে? প্রথমেই তো অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত হইয়া জ্ঞানালোক প্রজ্বলিত হয় না। তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় প্রথম ভাগে কর্ত্তব্যকর্ম্মে দৃঢ় এবং যাহা মনুষ্যের শক্তিসাধ্য, তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য অর্জ্জুনকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিতেছেন। যথা—"মামেব স্মর যুধ্য চ;" "জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।" "যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ;" "যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ। শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ॥" "তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ। পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্॥" "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্।" "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন;" "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।" "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।" "শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ। কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ"—ইত্যাদি উপদেশ করিলেন।

গীতায় এই সকল উপদেশে সম্পূর্ণ বুঝা যায় যে, মানুষকে চেষ্টা করিয়া যত্ন করিয়া এই সকল সাধনাভ্যাসে উদ্যোগী হইতে হইবে। "ভগবান্ সব করিবেন"—বলিয়া আলস্যে সময়ক্ষেপ করিলে চলিবে না। যদি চলিত, তবে অর্জ্জুনের মত ভক্তকে এত রাশি রাশি উপদেশ দিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। ভগবান করিয়া দিলে অনেক দিন আগেই তাহা করিয়া দিতেন।

মনুষ্যের মধ্যে যতটুকু শক্তি আছে, সেই শক্তি দ্বারা সাধন-প্রভাবে যখন তাহার চিত্ত অন্তর্মুখীন হইতে থাকে, ক্রমেই নিবিড়ভাবে ঐকান্তিক ধ্যানের দ্বারা সমস্ত বাহ্যবিষয় ও ইন্দ্রিয়-বিষয় হইতে চিত্ত উপরত হইতে থাকে, তখন সে নিজে নিজেই বুঝিতে পারে এবং দেখিতে পায় তাহার পৃথক্ সত্তা বা শক্তি কিছুই নাই; সবই পরমাত্মার শক্তি বা যাহা কিছু সবই আত্মসত্তা দ্বারা পূর্ণ। তখন জীব সেই জ্ঞানময় পরিপূর্ণ আন্তরহিত পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হয়। তাই গীতা এবং সর্ব্বশাস্ত্রে আত্মা পরমাত্মার অভেদ দর্শনই মুক্তি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই পরমাত্মার মধ্যে এই 'অহং'-কে নিমজ্জিত করিতে পারিলেই সাধনার চরম সিদ্ধি হইল। এইখানে 'অহং' অভিমান একবারে উড়িয়া যায়। তখন সাধক দেখেন 'তুমিই সব, তোমারই সব, আমার আমিও তুমি।' তখন "তত্ত্বমসি" এই পরম জ্ঞানের বোধ হয়। এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য দ্বারা তৎ ও ত্বং এর ঐক্য অনুভূত হইয়া "অহং ব্রহ্মাস্মি" অনুভূত হয়।

ভগবানের শক্তিতেই জীবের শক্তি, তাহার পৃথক শক্তি নাই এই বোধ।

এই অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া কোন সাধক গাহিয়াছেন ;—

"আমাতে যে আমি, সকলে সে আমি,

আমি সে সকল, সকলি আমার।

আমি নিরাকার, নিত্য নির্ব্বিকার,
আমার আমিত্ব, জগতে প্রচার॥
জনকরূপেতে জন্মাই সন্তান,
জননী হইয়া করি স্তনদান,
শিশুরূপে পুনঃ করি স্তনপান,
এ সব নিমিত্তকারণ আমার॥
সম্ভবাসম্ভব আমাতে সম্ভব,
অসম্ভব ভাব হয় জীবভাব,
(আমি) ভাবময় ভাব নাম সদাশিব,
ভাবুক ভকত ভাবে ভাবাকার॥
নামরূপে হই জগতে প্রচার,
সে সব অনিত্য আমি নিত্য সার,
আমার আমিত্বে উন্মত্ত সংসার,
সত্য তত্ত্ব আমি, আমি সত্যাকার॥
আধেয় আধার আমি সর্ব্বময়,
স্থূলসূক্ষ্ম-রূপে ব্যাপ্ত জগন্ময়,
রূপ রস গন্ধ আমি অনুবন্ধ,
উৎপত্তি নিবৃত্তি আমাতে সবার॥
সৃষ্টি স্থিতি লয় বারে বারে হয়,
রবি-শশী গ্রহ আসে পুনঃ যায়,
সোঽহং আমি সত্য অচ্যুত-অব্যয়,
চরমে তুরীয় আমি মাত্র সার॥

ইহাই সত্য "আমি।"

এই "অহং" যে কি তাহা প্রত্যহই অন্ততঃ একটিবার স্মরণ করিয়া দেখিবার বিধি শাস্ত্রে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

'অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহম্ শুদ্ধমুক্তস্বভাববান্।'

ইহাই প্রকৃত অহং শব্দের লক্ষ্য। এই যথার্থ সত্য "অহংকে" বিস্মৃত হইয়া মোহবশে যখন এই দেহটাকে "অহং" বলিয়া মনে করি, তখনই আমরা খুব ভুল করি। আত্মাকে উপ-লক্ষিত যে "অহং" তাহাই প্রকৃত 'অহং'। আর যে অভিমানাত্মক অহংকার—যাহাকে আমরা ভ্রমবশতঃ আত্মার সহিত এক করিয়া ফেলি—তাহা আত্মা নহে উহা প্রকৃতিজ গুণ মাত্র। অব্যক্তাবস্থা বা সাম্যাবস্থা হইতে প্রকৃতির বিচ্যুতি ঘটিলেই সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয়। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় (frist stage) সত্ত্বগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া জ্ঞানাত্মক বা সুখাত্মক মহত্তত্ত্ব বা বুদ্ধির আবির্ভাব হয়। রজস্তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইয়া অভিমানাত্মক অহংকারের উৎপত্তি হয় এবং এই অহংকারের সাত্ত্বিক অংশ প্রবৃদ্ধ হইয়া পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও মনের উৎপত্তি হইয়াছে। এই অভিমান হইতেই স্থূল হইতে স্থূলতর দশা প্রাপ্ত হইয়া জীব আপনার জালে আপনি বদ্ধ হইয়া পড়ে, আর পালাইবার পথ খুঁজিয়া পায় না। আবার এই স্থূলশরীরকে"অহং" বলিয়া জানাই সর্ব্বাপেক্ষাই ভীষণ অহংকার, ইহার নামই অজ্ঞান। ইহার কবল হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার নামই মুক্তি।

একই জল কূপে, তড়াগে ও গঙ্গায় আসিয়া পড়িতেছে; কিন্তু গঙ্গায় মিলিলেই উহা পবিত্র গঙ্গাজল হয়, কূপে পড়িলেই কূপজল হয়, তদ্রূপ "অহং" একই, যখন ইহা দেহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তখন তাহা অপবিত্র, বিবিধ দোষের আকর এবং দোষোৎপাদক। কিন্তু সেই "অহং"ই যখন ঈশ্বরাশ্রিত (সেব্য সেবক সম্বন্ধ) বা তাঁহার সহিত যোগযুক্ত হইয়া থাকে, তখন তাহা পরম পবিত্র ও পাপনাশক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

বশিষ্ঠদেব "অহং"কে চারিপ্রকারে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা—(১) দেহোঽহম্, (২) সূক্ষ্মোঽহম্, (৩) সর্ব্বদৃশ্যোঽহম্, ও (৪) শূন্যোঽহম্। প্রথমটি তৃষ্ণা ও বাসনার হেতু বলিয়া, উহা বন্ধনের হেতু।

"এতেষাং প্রথমঃ প্রোক্তাস্তৃষ্ণয়া বন্ধ-যোগ্যতা।
শুদ্ধতৃষ্ণাস্ত্রয়ঃ স্বচ্ছা জীবন্মুক্ত বিলাসিনঃ॥"

প্রথমটিতে বিষয়তৃষ্ণা হেতু বদ্ধ হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে; (অন্য তিনটিতে শুদ্ধ অমল তৃষ্ণা অর্থাৎ বিষয় ভোগেচ্ছাশূন্য তৃষ্ণা থাকায়, জীবন্মুক্তেরা ইহাতে বিলাস করিয়া থাকেন।)

এইরূপভাবে "অহং"কে বুঝিবার চেষ্টা করিলে ক্রমশঃ তাঁহার বোধ হয়

"প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি॥

(শুভাশুভ কর্ম্মে প্রকৃতিরই কর্ত্তৃত্ব।) প্রকৃতি দেহেন্দ্রিয়াকারে

পরিণত হইয়া শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। আত্মার দেহা-ভিমান হেতু কর্তৃত্ব বোধ হয় মাত্র, স্বতঃ কর্তৃত্ব আত্মার নাই; ইহা যিনি দেখেন তাঁর দেখাই ঠিক। আত্মার যদি কর্তৃত্ব না থাকে, তবে আমার কর্তৃত্ব কিসের?

নিজেকে যতক্ষণ কর্ত্তা বলিয়া মনে হয় ততক্ষণ শান্তি নাই সত্য, কিন্তু যতদিন 'পরাবর'কে দর্শন করিয়া হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন না হয়, ততদিন এই অহং ভাব বা দেহাত্মবোধ কিছুতেই যায় না। কিন্তু সাধকের বা কর্ম্মীর যে অহং ভাব, তাহা তাদৃশ মোহোৎপাদক নয়। বদ্ধজীবেরা আপনাদের দৈন্যবশতঃ জ্ঞানাভাবহেতু আত্মাকে না জানিয়া যেরূপ মোহ বিভ্রান্ত হয়, আরুরুক্ষুদের সেরূপ মোহবিভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। কণ্টকের দ্বারা কণ্টক বাহির করার ন্যায় "অহং"এর সাহায্যেই তাঁহারা "অহং"কে তাড়াইয়া দেন। শাস্ত্রের উপদেশ এই "নাবার্থী হি ভবেৎ তাবদ্ যাবৎ পারং ন বিন্দতি।"

যেমন অহংকার অন্তর্হিত হইল, অমনি এই মায়া-যবনিকা সরিয়া গেল, ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইল, শাশ্বত অভয়পদ প্রকাশিত হইল। আর অভিমানাত্মক অহং থাকিবে কি করিয়া? (প্রভুকে সম্মুখে দেখিলে ভৃত্যের এ ভ্রম হওয়া অসম্ভব যে, সে নিজেই নিজের প্রভু।) তখন সে পুরুষোত্তম নারায়ণকে আপনার হৃদয় সিংহাসনে স্বমহিমায় বিরাজিত দেখিতে পায়। তখন সমস্ত অনর্থের মূল এই অহঙ্কার গলিত পত্রের মত ঝরিয়া পড়ে। তখন কি আর নিজ পুরুষকার বা কর্ত্তৃত্বাভিমান

থাকিতে পারে ? তখন "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ইহার জন্যই জীবনব্যাপী সাধনা এবং তজ্জন্যই বেদ বলিয়াছেন—

"তস্যৈ তপো দমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা।"—তপস্যা, দম ও কর্ম্ম এই জ্ঞানের আশ্রয়। এই জ্ঞান প্রাপ্তির জন্যই তপস্যা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ নিষ্কাম কর্ম্ম এবং সাধনাদি করা কর্ত্তব্য।

কিন্তু অপক্কাবস্থায় আমরা যতই 'ভগবানই সব' বলিতে থাকি, তাহাতে আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান নষ্ট হয় না, কারণ ঐ অবস্থাটি অনুভব করিতে হয়, এবং যিনি এই অবস্থা অনুভব করেন, তাঁহার কতকগুলি বাহ্য ও আভ্যন্তরিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। শুধু ঐ মহা-বাক্য শুকপক্ষীর মত আওড়াইলে কোন ফল হয় না। আমরা তো অনেক সময়েই বলি 'তিনিই কর্ত্তা, তিনিই সব, আমরা যন্ত্র মাত্র।' কিন্তু কার্য্যকালে অহঙ্কারের মাত্রা কিছু কম দেখা যায় না। কথাটার বেশ চটক আছে এবং উহা শ্রুতিমধুরও বটে; তাই আমরা যখন ঐ কথাগুলি কাহারো মুখে শুনি, তখনি তাঁহাকে নিরভিমান পুরুষ, প্রেমিক ভক্ত বলিয়া মনে করি; কিন্তু তাঁহার কার্য্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ও সব কথা তাঁহার অন্তরের কথা নয়, কেবল দৈন্যের ভাণমাত্র।

কাঁচা ও পাকা আমি

যখন পরিপূর্ণ প্রেমে ভক্ত তন্ময় হইয়া থাকেন, তখনই 'আত্মসমর্পণ' সম্ভব হয়। ব্যাপারটা কতকটা পক্ষিশাবকের

পক্ষ-উদ্গমের ন্যায়। কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত সবল হইলেই জ্ঞানপক্ষ বিস্তৃত হয়; তখনি সে চিদাকাশে উড়িয়া মায়ারাজ্যের সুদূর দেশে সাধনপর্ব্বতের শিখরস্থিত প্রেমফল লাভ করে ও তাহা ভোজন করিয়া পূর্ণানন্দে পূর্ণ হয়।

কখন্ আত্মসমর্পণ সম্ভব?

বহু তপস্যার ফলে, অনেক সাধ্য-সাধনার পরে, এই সৌভাগ্যলাভ হয়। তখন ভক্ত দেহের মধ্যে আপনাকে আবদ্ধ দেখিতে পান না, নিজের পৃথক সত্তাও আর বুঝিতে পারেন না। তখন তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত চেষ্টা, এই দেহ, মন, প্রাণ, সমস্তই ভগবানের বলিয়া মনে হয়, তখন ভক্ত যথার্থভাবে আপনাকে 'অকর্ত্তা' মনে করেন। তখন তিনি দেখেন, এই সমস্ত পৃথক্ শক্তি কিছুই নয়, সবই এক অখণ্ড আনন্দশক্তি হইতে নিঃসৃত ;—

অকর্ত্তারং স পশ্যতি

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।
খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥"

তখন প্রেমাকুল ভক্ত আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে গাহিয়া উঠেন ;—

"তোমাতে আমাতে লাগিল প্রেমের ফাঁসি।
নিশ্চয় করিয়া একমত হয়্যা হইনু চরণে দাসী॥"

কিন্তু যতদিন এ অবস্থা না আসে, যতদিন এ অনুভব প্রগাঢ় না হয়, যতদিন ব্যর্থ অভিমানের মোহ আমার চারিদিক ঘেরিয়া থাকে, ততদিন আমার শক্তিকে অস্বীকার করিলে চলিবে না; সেই শক্তিকেই ঐশী শক্তি মনে করিয়া সাধন

করিয়া যাইতে হইবে। এইরূপে আমার মধ্যে আমার যথার্থ 'আমি'র পরিচয় লইতে হইবে। আমি যে ক্ষুদ্র নহি, আমি যে দীন নহি, ইহা বুঝিতেই হইবে। ক্ষণিকের মোহকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রবৃত্তির চটুল চপলতাকে দূরে সরাইয়া দেয়া সংস্কারের ঘূর্ণমান বেগকে সবলে বিভিন্নমুখ করিয়া সত্যের পথে, জ্ঞানের পথে, প্রেমের পথে, চলিতে হইবে।

ঐশী শক্তির সদ্ব্যবহার ও তদ্দ্বারা লক্ষ্যস্থল-প্রাপ্তি।

যতদিন জগৎকর্ত্তাকে সত্যরূপে বুঝিতে না পারা যায়, ততদিন আপনার শক্তিতেই তাঁহার পথে চলিতে প্রযত্ন ও অভ্যাস করিতে হইবে। এই অভ্যাসবলেই 'আমি কে' বুঝিতে পারিবে এবং আত্মা দ্বারাই আত্মজয়ী হইবে। ইহাতে সিদ্ধির সম্ভাবনা যথেষ্ট, আমাদের মধ্যে সে শক্তি আছে; তাই ভগবান্ বলিতেছেন;—"বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।"

মনের দ্বারাই মনকে জয় কর। আগে আত্মজয়ী হও, তাহার পর তাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিবার শক্তি লাভ করিবে। আগে আমি আমার হই, তাহার পর তাহা সমর্পণ করিলে চলিবে; নচেৎ যাহা আমার নয়, তাহা কিরূপে অর্পণ করিব? সুতরাং, আগে আমাকে আমার আয়ত্তের মধ্যে আনি. তাহার পর একদিন মঙ্গল প্রভাতে পক্ষী যেমন পক্ক ফলকে গ্রহণ করে, ভগবান্ও তেমনি আমাকে গ্রহণ করিবেন। তাহার পূর্ব্বে জীবন সমর্পণ করিব বলিলেই কিছু সমর্পণ করা হইবে না। ইহাও সাধনাসাপেক্ষ।

যাহাদের সামর্থ্য আছে, তাহারাই সুমিষ্ট গুরুপাক দ্রব্য অনায়াসে ভোজন ও পরিপাক করে; কিন্তু সে শক্তি লাভ করিবার পূর্ব্বেই, যে দুর্ভাগ্য লোভবশতঃ গুরু ভোজনে প্রবৃত্ত হয়, গুরুদ্রব্য পুষ্টিকর হইলেও,তাহা তাহার পাক-যন্ত্রকে দুর্ব্বল এবং অকর্ম্মণ্য করিয়া তোলে।

যোগ্যতা না থাকিলে যোগ্য ব্যক্তির ব্যর্থ অনুকরণে বিপরীত ফল হয়।

অতএব অগ্রে পুরুষকার ও কর্ম্মের দ্বারা শক্তি আয়ত্ত হউক, তাহার পর আপনা-আপনি জ্ঞান, প্রেম, ভক্তির লহরীলীলা তোমার চারিদিকে নৃত্য করিয়া বেড়াইবে। নচেৎ যে মধুররস ভাবরাজ্যের চরম, অপক্বাবস্থায় তাহারও স্বাদগ্রহণে সুফল ফলেনা; বরং ভাববিকার ঘটাইয়া চিরদিনকার মত চিত্তবৃত্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। জয়দেবের মধুর কোমল পদাবলী শ্রীমদ্‌গৌরাঙ্গদেবের ভাবতরঙ্গ উদ্বেল করিত, কিন্তু প্রাকৃত জনের পক্ষে তাহাই বিষের মত কার্য্য করিয়াছে; ইহাতে অপর-ভক্তের প্রেম বর্দ্ধিত না হইয়া বিকার বর্দ্ধিত হইয়াছে। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে উপযুক্ত করিবার জন্য পুরুষকার অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ম্মযোগ আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। ইহাই একমাত্র আমাদিগকে যথার্থ মঙ্গলদানে সমর্থ।

চতুর্থ অধ্যায়।

সদভ্যাস।

সংসারে আধি-ব্যাধি ও জরা-মৃত্যুর প্রভাবে, মানুষ চিত্তে বিন্দুমাত্র শান্তি পায় না, অথচ এমনি মোহ যে, এ সকল হইতে উদ্ধারের পথ অন্বেষণ করিবারও তাহার কোন উৎসাহ বা প্রবৃত্তি দেখা যায় না। নিরন্তর সংসার তাপে জলিয়া পুড়িয়া মানুষ যে কি দুঃখ সন্তাপ ভোগ করে, তাহা স্থিরচিত্তে একবার চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই সংসারের প্রতি কাহারও আস্থা থাকিতে পারে না। সংসারে আস্থা থাকিতে পারে না বলিয়া, কেহ যেন এমন মনে না করেন যে, সংসার হইতে পলায়ন করাকেই আমি শ্রেষ্ঠপথ বলিতেছি। বাস্তবিক তাহা নহে। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও সেই সত্য বস্তুকে চিনিয়া লইতে হইবে, কারণ সত্য পদার্থকে বুঝিতে না পারিলে, মানবকে অতলস্পর্শ দুঃখের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হয়। কারণ মানবের মনই মানবকে, প্রতিদিন দুঃখের সাগরে নিপাতিত করিতেছে; মন এত চঞ্চল, এত অস্থির যে, কোন বস্তু পাইয়াও তাহার সুখ নাই, না পাইয়াও স্বস্তি নাই। অবিরত বিষয় ভোগের লালসা তাহার মধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অথচ ভোগদ্বারা সে লালসা কিছুতেই প্রশান্ত হইতেছে না। সীমাবিশিষ্ট জড় পদার্থে যতই সুখের অন্বেষণ করা যাক, মানুষ

যথার্থ সুখ তাহা হইতে পাইতে পারে না। সেই আনন্দ এই জড় পদার্থে বা বহুবিধ বিলাসোপকরণের মধ্যে কখনই কেহ খুঁজিয়া পায় না। বরং সে সকল দুরবস্থা হইতে মুক্তিলাভের উপায়ই হইল বৈরাগ্য। আজকাল কি ব্রাহ্মণ, কি শূদ্র, কি ভদ্র, কি ইতর সকলেই বিলাসভোগে প্রসক্ত। ইহাতে প্রকৃত সুখ পাইতেছি কিনা তাহা একবার কেহ স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখে না। সকলেই ধনীদিগের মত বিষয়ভোগে উন্মত্ত ও সম্পৎ-প্রাপ্তির দুরাকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। এই ভয়ঙ্কর দুরাকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান থাকিতে, কেহ কখন শান্তিলাভ করিতে পারে না, বা যথার্থ সুখের মুখও দেখিতে পায় না। কেন যে আমার এত উপকরণের প্রয়োজন, ইহা কেহ না ভাবিয়াই শুদ্ধ দুরাকাঙ্ক্ষার ও মিথ্যা বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই চাহিয়া বসে, এবং অনবরত তাহারি চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করে। যেটুকু না হইলে নয়, তাহা সংগ্রহ করা অবশ্য মানুষমাত্রেরই কর্ত্তব্য ; কিন্তু অতিরিক্ত লোভ করিলে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা নষ্ট হইয়া যায়। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ ধনম্।"—ভগবান আমার জন্য যাহা কিছু ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাই সন্তুষ্ট হইয়া ভোগ কর, অপর কাহার ও ভাগ্যের প্রতি লোভ করিও না। ইহার অর্থ এও হয় যে যখন সমস্তই ভগবৎ সত্তায় পূর্ণ, তিনি ছাড়া অন্য কিছু নাই, তখন ভোগ্যবুদ্ধি দ্বারা পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থকে গ্রহণ না করিয়া, ইহা ভগবদ্রূপই এইরূপ ত্যাগ বুদ্ধিদ্বারা অনাসক্ত হইয়া ভোগ কর।

ঋষি বালক নচিকেতা যমরাজপ্রদত্ত ভোগৈশ্বর্য্য লাভের বর কিরূপে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, তাহা ভারতবর্ষীয় ঋষি সন্তানদের কখনই ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। নচিকেতা বলিয়াছিলেন—

শ্বোভাবা মর্ত্ত্যস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ
অজীর্য্যতামমৃতানামুপেত্য
জীর্য্যন্মর্ত্ত্যঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্।
অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্
অতিদীর্ঘে জীবিতেকো রমেত॥ (কঠ)

হে যমরাজ! ভোগ্য বস্তু সমূহ ক্ষণস্থায়ী এবং মরণশীল জীবের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের যে তেজ তাহা ভোগ দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়। আর মনুষ্য প্রভূত বিত্ত পাইয়াও তৃপ্ত হয় না। অতএব জরামরণশীল কোন ব্যক্তি পৃথিবীর ভোগ সুখ সমূহের অনিত্যতা জানিয়া এবং চক্ষের সম্মুখে তাহার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিয়া, তাহার ভোগের জন্য দীর্ঘজীবন কামনা করিবে।

ইহাই বেদোক্ত উপদেশ। হায়! এমন অমৃতময় বাক্য মানিয়া চলিতে কেন আর আমাদের প্রবৃত্তি হয় না! যাহাতে মনে এই বিবিধ উপকরণের প্রতি লোভ জন্মিতে না পারে, তজ্জন্য বৈরাগ্য এবং তিতিক্ষার আশ্রয় লওয়া, মনুষ্য মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু যতক্ষণ সাধুসঙ্গ প্রভাবে কি হেয়

কি উপাদেয়, এইরূপ মনে মনে বিচার করিবার স্বতঃ ইচ্ছা না জন্মে ততক্ষণ বৈরাগ্য আসিতে পারে না। অন্ধকার রাত্রিতে পথিমধ্যে পতিত রজ্জুকে যেমন সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন সংসারপথে বিবিধ সুখদুঃখাদি অজ্ঞানীদিগের মোহ উৎপাদন করে। এই সমস্ত অনর্থের হেতুভূত অজ্ঞান্ত দূরীভূত না হইলে, কিরূপে এই বাসনাতরঙ্গ বিক্ষোভিত মোহতটিনীর ধ্বংসসাধন হইবে? অতএব বশিষ্টদেবের নিরুপম উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। তিনি রামচন্দ্রকে বলিতেছেন, "শান্তি, বিচার, সন্তোষ ও সাধুসঙ্গ এই চারিটি মোক্ষদ্বারের দ্বারপাল। সবিশেষ যত্ন-পূর্ব্বক এই চারি জনের এবং অশক্ত হইলে, তিন, দুই অথবা এক জনের সেবা করিবে। কেন না, ইহাদের একজন বশ হইলে, অবশিষ্টেরাও বশ হইয়া থাকে। বৃষ্টিকালে জল যেমন ঘন হইয়া শিলা হয়, অতত্ত্বজ্ঞ মূঢ়গণ তেমনি প্রগাঢ় অজ্ঞানবশে স্থাবরাদি-যোনি লাভ করে। সূর্য্যোদয়ে পদ্ম যেমন প্রফুল্ল হয়, জ্ঞানালোকে আত্মাও তেমনি বিকসিত হইয়া থাকে। যাহার জ্ঞান নাই, সে জড; যাহার বিবেক নাই, সে অবস্তু; যাহার বিদ্যা নাই, সে পশু, এবং যাহার বিচার নাই, সে নামমাত্র মানুষ। যাহাতে বিনাশ নাই, তুমি বৈরাগ্য ও যোগাভ্যাসসহায়ে সেই শান্তিলাভে ও সৌজন্যরূপ পরম সম্পৎসঞ্চয়ে কৃতযত্ন হও এবং সর্ব্বদা সৎ-শাস্ত্রালোচনা, ইন্দ্রিয়সংযম ও তপস্যা দ্বারা স্বীয় প্রজ্ঞা বর্দ্ধিত কর, সংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।"

বৈরাগ্য ব্যতীত জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জ্ঞান না হইলে পুনঃ পুনঃ সংসার ক্লেশের নিবৃত্তি নাই। বৈরাগ্য মানেই ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে আসক্তিহীন হওয়া। যাহার ইন্দ্রিয় বশীভূত নহে, তাহার প্রজ্ঞাই উৎপন্ন হইতে পারে না, বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হওয়া তো দূরের কথা। (ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহে ইন্দ্রিয়ের লোলুপতা নষ্ট না হইলে কেহই স্থিতপ্রজ্ঞ হইতে পারেন না)
"বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"

অনেকে বলেন, বৈরাগ্য ও মুক্তিই যদি জীবনের লক্ষ্য হয়, তবে প্রথমতঃ মানুষের সংসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? দ্বিতীয়তঃ, মুক্তিই যদি সর্ব্বপ্রধান লক্ষ্য হয়, তবে এত কর্ম্মের বোঝা অনর্থক বহিয়া মরায় লাভ কি? যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহাকে পূর্ব্ব হইতে ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ, পঙ্ক মাখিয়া ধুইয়া ফেলিবার প্রয়োজনীয়তা কি? আদৌ পঙ্ক না মাখিলেই হয়। এইখানে ভারতবর্ষীয় আর্য্যঋষিদের কর্ম্মরহস্য জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। মোটামুটি একটা কথা এখানে বলিয়া রাখি।

বৈরাগ্য ও মুক্তি।

বৈরাগ্য বলিলে, ঠিক নিষ্কর্ম্মা ভাব বুঝায় না। যথার্থ কর্ম্মবীরই বৈরাগ্য-সম্পন্ন হইতে পারেন। কারণ মঙ্গল কর্ম্ম করিতে গেলেই সত্ত্বসংশুদ্ধি হওয়া আবশ্যক। ফলকামী স্বার্থান্ধ দীনাত্মারা কখন মঙ্গল কর্ম্মে দীক্ষিত হইতে পারে না। সত্ত্বসংশুদ্ধি না হইলে যথার্থ মঙ্গল কর্ম্মের কেহই অধিকারী হইতে পারে না।

সুতরাং শুভ-কামী ব্যক্তিমাত্রকেই বৈরাগ্যবান হইতে হইবে। বৈরাগ্য-বিহীন ব্যক্তি কখনই নিষ্কাম ভাবে, নিঃস্বার্থ ভাবে জগতের হিতের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে না। অনেকে মনে করেন, অর্থোপার্জ্জনই বুঝি সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র উদ্দেশ্য, তাই তাঁহারা কোন কর্ম্মে যদি আর্থিক বা সাংসারিক লাভ না দেখেন, তবে তাঁহারা তাহাকে কর্ম্ম বলিতেই প্রস্তুত নহেন। বুদ্ধির এই বিপর্য্যয় সংসারে ঘোর আপদের মত কার্য্য করিতেছে। লাভ না থাকিলেও যে কার্য্য করা যায় এবং সেরূপ কার্য্যেও কর্ম্মীর কিছুমাত্র শৈথিল্য থাকে না, বর্ত্তমান যুগে স্বার্থান্ধ মানবের পক্ষে তাহা উপলব্ধি করা কঠিন হইলেও ইহা অসম্ভব নয়, একথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। যাঁহারা খুব হিসাবী লোক, কড়া ক্রান্তিটির পর্য্যন্ত খবর রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহার মর্ম্ম বুঝা একটু শক্ত বটে, তথাপি যিনি সত্যের মর্য্যাদা রাখিতে চান, তাঁহাকে বলিতেই হইবে, জগতে শুধু নিজের দেখিলে চলিবে না, শুধু স্বার্থ খুঁজিলে চলিবে না। সেই পরম দরিদ্র যাহার বাসনার অন্ত নাই এবং যাহার স্বার্থ আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। প্রকৃত বৈরাগ্য ও নিষ্কাম কর্ম্মের রহস্য অবগত হইতে হইলে কিছুকাল নিবিষ্টচিত্তে সাধনা করা আবশ্যক ও চিত্তকে বিচারবান করিতে হইবে। বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে—"বাসনাই পুনর্জ্জন্মের হেতু, বাসনা হইতেই সংসার বন্ধন সংঘটিত হয়।" প্রতিদিন যথা বিধানে পরাৎপর পরমাত্মার স্মরণ, মনন ও উপাসনাদি দ্বারা চিত্তের

মালিন্ত দূর হইলেই বাসনা বিনষ্ট হইয়া থাকে। বাসনার ক্ষয় হইলে বাসনা সমূহের আশ্রয় মনও বিগলিত হইয়া যায়।” যোঃ বাঃ। এই বিচার ও সাধনাভ্যাসের বলেই সাধকের নিকটে সত্যের স্বরূপ প্রকাশ পায়। তখন আর সত্যবস্তুকে বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় না। এই সত্য যতদিন অপ্রকাশ থাকেন,ততদিন বিবিধ সদভ্যাসের দ্বারা সত্যানুসন্ধানের প্রযত্নকে দৃঢ় করিতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনকে স্বজনবধ-রূপ ঘোর কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে গিয়াও নিষ্কাম কর্ম্ম ও বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন “হে অর্জ্জুন! তোমাকে কর্ম্ম করিতেই হইবে; ইহাতে কর্ম্ম বন্ধনে পড়িবে সে ভয় করিও না। যদি আত্মসুখেচ্ছা না থাকে,ঈশ্বরার্পিত চিত্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে কর্ম্মবন্ধন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই।” যাঁহারা মনে করেন কিছু “লাভের আশা”ই আমাদিগকে কর্ম্মে উত্তেজিত করে, সুতরাং ফলাশা ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করা অসম্ভব, তাঁহাদের এ কথা সমীচিন নহে। ভগবানে অর্পিত চিত্ত নিষ্কামী পুরুষেরা কর্ম্ম করিয়া ফলের আশা করেন না, অথচ সকামীদের মতই তাঁহাদের কর্ম্মোৎসাহ থাকে. শ্রীকৃষ্ণ নিজ জীবনে এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিয়া জগতকে নিষ্কাম কর্ম্ম বুঝাইয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কংসকে বিনাশ করিয়া দুষ্টের দমন করিলেন, কিন্তু সিংহাসন গ্রহণ করিলেন না। সাংসারিক লোভ তাঁহার ছিল না, কিন্তু যাহা কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম তাহা হইতে তিনি কখন আপনাকে বিমুখ করিয়া রাখেন নাই। এরূপ মহাপুরুষ এই পার্থিবতা-

সর্ব্বত্র সভ্যতার যুগে বিরল হইলেও দুর্লভ নহে। শুভকর্ম্ম করিলে সেই সুকৃতির ফলে প্রকৃত বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়, কারণ শুভকার্য্য করিতে করিতে সত্ত্বগুণের উদয় হয়, তখন স্বতঃই হৃদয়ে কর্ম্মফলে স্পৃহা থাকে না, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে কখনও বিগতস্পৃহ সাত্ত্বিক ব্যক্তির আলস্য বা ঔদাস্য দেখা যায় না; বরং তিনি সকাম ব্যক্তি অপেক্ষা আরও দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করেন। তাই ত্রিলোকপূজ্য শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশ ;—

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে॥
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥

যে সকল ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণকে মনদ্বারা সংযত করিয়া অর্থাৎ বিষয় ভোগে অতিমাত্র লোভযুক্ত না করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ম্ম সকল করিয়া থাকেন—সেই অসক্ত ব্যক্তিই বিশিষ্ট অর্থাৎ এরূপ পুরুষের চিত্তশুদ্ধি হেতু জ্ঞান প্রাপ্তি হইয়া থাকে, অতএব হে অর্জ্জুন তুমিও অনাসক্ত হইয়া অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত হইয়া অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে চিত্তশুদ্ধি হয় এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি পরং অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

বৈরাগ্য-বিহীন চিত্তের শান্তি নাই, সুতরাং প্রকৃত শান্তিলাভের জন্যই যে বৈরাগ্য হওয়া চাই। বিচার বশীকৃত চিত্তে বিষয়ের প্রতি তাদৃশ লোভ থাকিতে পারে না, অতএব ইহা স্থির নিশ্চয় যে

বিচার প্রভাবেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বৈরাগ্য দ্বারাই চিত্ত নির্ম্মল হয়। যতক্ষণ বিষয় গ্রহণ স্পৃহা বলবতী থাকে, ততক্ষণ চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে। বিক্ষিপ্তাবস্থাই চিত্তের মলিনতা। সমল চিত্তে ঠিক বিচার আসে না, সুতরাং কি হেয় কি উপাদেয় বুঝিতেই পারা যায় না। প্রকৃত হেয় ও উপাদেয় কি ঠিক না হইলে, আপাতমধুর বিষয় রসকে উপেক্ষা করা যায় না, এবং বিষয় না পাইলে চিত্ত অশান্তি পূর্ণ হইয়া উঠে। শরীরকে সর্ব্বস্ব মনে করিয়া লওয়া এ অবস্থায় স্বাভাবিক বলিয়া তাহারই আরাধনায় দিনরাত্র ব্যাপৃত থাকা অসম্ভব নহে। এই যে দেহাত্ম-বোধ ইহাই ভ্রান্তিজ্ঞান বা প্রমাদের নিকেতন। এইরূপ প্রমত্তভাব থাকিতে সুখলাভের আশা দুরাশা মাত্র। দেহাত্মবাদীরা দেখে তাহার চারিদিকে যাহারা আছে তাহাদের অনেকের অবস্থা হয় ত উন্নত; তাহাদের অপেক্ষা অনেকেই ভাল খায়, ভাল পরে—তাহাদের মত আমারও হইতে ইচ্ছা করে, তাই বহুবিধ অধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বদা ধনার্জ্জনের চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া ফিরি। সুতরাং এরূপ যাহাদের চিত্তের অবস্থা তাহারা সত্যানুসন্ধান করিবে কি প্রকারে? সত্যকে না চাহিয়া আমরা যাহা চাই, তাহা না হয় পাইলাম; কিন্তু সে সব পাইলেই কি সুখ আছে, আবার লুব্ধের মত আরও অধিক চাহিয়া বসি; এইরূপে আশা বাড়িয়াই চলে, আমরাও উন্মত্তের মত আশার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুটিয়া শেষে ক্লান্ত হইয়া পড়ি—তবুও আশাকে

বৈরাগ্য কিরূপে উদয় হয়।

ছাড়িতে পারি না। কত পরিশ্রম করি, কত চেষ্টা করি তবু দেখি আশা আর ফুরায় না, বাঞ্ছিত বস্তু চির অলব্ধই রহিয়াছে। আশা মরীচিকার মত, পার্থিব সুখ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের মত, কখনই কাহারও আয়ত্বের মধ্যে আসিয়া পৌঁছায় না, চিত্তও আমাদের সেই জন্য কোন কালে শান্তি লাভ করে না। সুতরাং প্রকৃত সুখ কি এবং তাহা কোথায় ও কিরূপে পাওয়া যায়, তাহা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া লইতেই হইবে, নচেৎ এ শরীর ধারণই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আত্মানুসন্ধান করিলেই আমরা বুঝিতে পারিব যে আমরা ঠিক গন্তব্য পথে চলিতেছি না, আমরা কুসঙ্গী ও কুদৃষ্টান্ত দ্বারা পথ হারা হইয়া কুপথে চলিয়াছি। প্রকৃত পথের অন্বেষণের জন্য এইখানে আমাদের গতিকে বন্ধ করিয়া একবার দাঁড়াইতে হইবে; বিচার করিয়া দেখিতে হইবে কোন পথ ধরিলে আমরা লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিব। কোন্ কোন্ সাথীকে সঙ্গে লইতে হইবে এবং কাহার সঙ্গই বা ত্যাগ করিতে হইবে। ভ্রান্তিজ্ঞান এখানেও যৎপরোনাস্তি বাধা দিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু মিথ্যা মোহের ঘোরে ভুলিলে আর চলিবে না। মিথ্যা সুখের যে মোহ তাহা চিত্ত হইতে মুছিয়া ফেলিতেই হইবে, নচেৎ সুখ শান্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। এখন দেখা যাক্ কিসে এই মোহ ঘুচিবে? শাস্ত্র বলিয়াছেন, সাধুসঙ্গ দ্বারাই চিত্তের এই বিকলতা নষ্ট হয়। সাধুদের নির্ম্মল চরিত্র, পবিত্র ভাব, তাঁহাদের চিত্তের স্থৈর্য্য ও আনন্দ আমাদিগকে

এক অভিনব অপার্থিব চিন্ময় রাজ্যের সংবাদ আনিয়া দেয়। যে সত্যের স্বর্ণজ্যোতিঃ তাঁহাদের নির্ম্মল অন্তঃকরণে উদ্ভাসিত হইয়াছে—তাহারই কিরণধারা আমাদিগের মোহযুক্ত চিত্তের অন্ধকার বিধ্বংশ করিয়া এক অপূর্ব্ব জ্ঞানময় আলোক বিকীর্ণ করিবে। সেই জন্যই সাধু সঙ্গের এত মহিমা। শ্রীমদ্ভাগবতে মহাত্মা ভরত রহুগণকে উপদেশ করিতেছেন,—

সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য

রহুগণ তত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নৈবাপনাদ্ গৃহাদ্ বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ
র্বিনামহৎপাদ রজোভিষেকং॥

সাধু কৃপা ব্যতীত এই পরম দুষ্কৃতির নিষ্কৃতি কোথায়? এই সাধুর কৃপাতেই আমাদের জীবনের লক্ষ্য-পথ কি বুঝিতে পারি, এবং তাঁহারাই পথপ্রদর্শক হইয়া এই অপার ভব-সংসারের অপর পারে আমাদিগকে উত্তীর্ণ করিয়া দেন।

এইরূপে সাধুসঙ্গ, সন্তোষ, বিচার ও শান্তি এই চারিটিকে আশ্রয় করিয়া আমরা ক্রমশঃ মুক্তি-পথে অগ্রসর হই। উপরোক্ত চারিটির মধ্যে প্রথম তিনটি কারণস্বরূপ ও চতুর্থটি তাহাদের ফলস্বরূপে প্রকাশ পায়। (প্রথম তিনটির সাধনা দ্বারাই আমাদের চিত্তমল নষ্ট হইয়া যায়।) চিত্তশুদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা অধ্যাত্মমার্গে প্রকৃত পক্ষে প্রবেশ লাভ করি না। যাহাতে চিত্তশুদ্ধি ঘটে ও মোক্ষ-মার্গের কবাট উন্মুক্ত হয় তজ্জন্য

মুক্তির সোপান—সাধুসঙ্গ, সন্তোষ, বিচার ও শান্তি।

ইহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং প্রাণপাত করিয়া লক্ষ্য লাভে চেষ্টা করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে শাস্ত্রানুমোদিত পুরুষকার প্রয়োগ করিলে কোন কর্ম্মই অসম্পন্ন হইয়া থাকিতে পারে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

"যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করম্।
সর্ব্বন্তু তপসা সাধ্যং তপোহি দুরতিক্রমম্ ॥"

যে কেহ, যে কিছুর জন্য তপস্যা করিবেন, তাহার অন্ততঃ আংশিক সফলতা লাভ হইবেই হইবে। তপস্যার এমনই প্রভাব। **এই তপস্যাই—সদভ্যাস।** পাঠক যদি অদৃষ্টবাদী হন তাহা হইলেও চেষ্টা করা তাঁহার কর্ত্তব্য। নিশ্চেষ্টতা জড়ের ধর্ম্ম, চেতনের নহে। অতএব চেষ্টাহীন হইয়া থাকা সর্ব্বথা অন্যায় ও নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা বুদ্ধিমান মাত্রেরই প্রণিধান করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা অদৃষ্টবাদী অর্থাৎ পুরুষকার মানিতে চান না তাঁহাদেরই ত বরং আরও অধিকতর চেষ্টাশীল হইবার কথা। কারণ তাঁহারা আপনার শক্তির উপর বিশ্বাস করেন না; জ্ঞান বুদ্ধির অতীত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বরের শক্তির উপরই তাঁহাদের বিশ্বাস, সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে অধিকতর চেষ্টাশীল হওয়াই স্বাভাবিক। বরং যাহারা নিজের শক্তির উপর নির্ভর করে, তাহারা সামর্থ্যের অভাব বশতঃ সময়ে সময়ে ভগ্নোদ্যম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যাঁহারা "দৈবকেই" সকল সফলতার হেতু বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যে উৎসাহ হীন

সকলেরই যথাসাধ্য পুরুষকার প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান কালে আমাদের চিত্তশুদ্ধি হয় না বলিয়াই আমরা যে কর্ম্মের যে ফল তাহা লাভ করিতে পারি না। অপরিণত বৃক্ষের অসময়ের ফলের মত আমাদের শুভ ইচ্ছাগুলিও যথাযথরূপে পুষ্ট হইয়া উঠিতে পারে না। তাহারা অকালে উদয় হয় এবং অকালেই ধ্বংস হয় সুতরাং পুনঃপুনঃ বিফলতার নির্ম্মম কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া পড়ি। সাত্ত্বিককার্য্য, কোন হিতানুষ্ঠান, অথবা জ্ঞানার্জ্জন এ সকলের জন্য আমাদের চিত্ত সময়ে সময়ে ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল চেষ্টা করিয়া সেগুলিকে আয়ত্ত করিবার মত ক্ষমতা যেন আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি। তাহার কারণ শিক্ষার অভাবে মন ঠিক আমাদের গঠিত হয় নাই। আমরা গৃহী হইতে চাই অথচ গৃহস্থালী করিবার পটুতা আমাদের নাই—আমাদের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী হইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু আশ্রমোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি না—শুধু সং সাজা মাত্র সার হয়। সেই জন্যই আমার মনে হয়, গোড়া হইতে কতকগুলি সদভ্যাসে অভ্যস্ত হওয়া আমাদের বিশেষ প্রয়োজন, এবং এ জন্য প্রথম হইতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। যেমন কেহ যদি বিদ্যাশিক্ষা করিতে চায়, অথচ পাঠাভ্যাসে মনঃসংযোগ না করিয়া শকট চালনায় ব্যতিব্যস্ত হয়, তবে তাহার ফল কি হইবে অনুমান করা কাহারও পক্ষেই কঠিন নয়, তদ্রূপ আমরা যাহা হইতে চাই প্রথম হইতেই তদনুকূল শিক্ষা প্রণালীর অনুসরণ না করিলে সফলতা লাভ একেবারেই অসম্ভব,

হইবার কোন কারণ দেখা যায় না। এই জন্তই গত শতাব্দীর ইয়ুরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ও ধীমান্ পুরুষ সম্রাট নেপোলিয়ন্ অদৃষ্টবাদী হইয়াও কখন পৌরুষ হইতে বিচ্যুত হন নাই। তিনি জানিতেন অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ত হইবেই, সুতরাং কাপুরুষের মত নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকায় কোন লাভ নাই। এই জন্ত তুমুল সংগ্রামের মধ্যে বা ভীষণ আগ্নেয়াস্ত্রের সম্মুখে আসন্ন মৃত্যু বুঝিয়াও, তিনি অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা খণ্ডিত হইবার নহে ভাবিয়া সে সকল বিপদ্‌পাতের মুখে বীরদর্পে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না; আর আমরা দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই অদৃষ্টকে প্রবল বলিয়া স্বীকার করিয়াও আসন্ন বিপদের ভয়ে এতই ব্যাকুল হই, যে তাহা দেখিলে স্ত্রীলোকদিগেরও লজ্জানুভব হয়। পুরুষকারবাদীরাও যে অদৃষ্টকে মান্ত করেন না তাহা নহে; তবে তাঁহারা "যাহা হইবার তাহা হউক" বলিয়া চেষ্টাকে আরও প্রবল করিতে চেষ্টা করেন কারণ পূর্ব্ব-কর্ম্মকে বর্ত্তমান কর্ম্মই নষ্ট করিতে সক্ষম; সেইজন্ত শাস্ত্র ও সদা-চারকে মান্ত করিয়া কর্ম্ম হইতে তাঁহারা কখনই নিবৃত্ত হ'ন না। কিন্তু আত্ম-দৃষ্টিহীন জড়বুদ্ধি মূর্খেরা 'যা হবার তা হবেই' ভাবিয়া একবারে লেপ চাপা দিয়া শুইয়া পড়ে। 'রোগস্থান-সহস্রানি ভয়স্থান শতানিচ' ইহাই এই জড় সংসারের নিয়ম, মূর্খের সেই সব স্থলেহাত পা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়ে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সে সব স্থলে কিছুতেই অবসন্ন হ'ন না। অবশ্যম্ভাবী দুর্ভাগ্যের জন্ত তাঁহারা খেদ করেন না; চেষ্টা দ্বারা যাহা হইবার তাহাই

আরম্ভ করিবার জন্য দৃঢ় প্রযত্ন করিতে থাকেন। দেহাত্মবাদী মূর্খদের নিকট সবই দুঃখ, সবই ভয়, সবই মৃত্যু, সবই অন্ধকার বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু আত্মদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষের নিকট সমস্তই আনন্দ, সমস্তই ব্রহ্মের কনককিরণোদ্ভাসিত—তাঁহার কাছে কিছুই প্রহেলিকা নয়—সবই স্পষ্ট, সবই সহজ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তাঁহার কাছে শোকও নাই, দুঃখও নাই, বিরহও নাই, সন্তাপও নাই—'সমস্তই পূর্ণানন্দপূর্ণ ভবে'; তিনি বলেন "অমৃত করিয়া পান, অমর হয়েছি এবে।"

কেহ কেহ বলেন "চেষ্টা আসে না যে, করি কি?" ঠিক কথা, চেষ্টা সব সময় আসে না; কিন্তু চেষ্টা কেন আসে না তাহা কি ভাবিয়া দেখিয়াছি? গীতায় আছে "অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠোনৈষ্কৃতিকোঽলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে।" অর্থাৎ 'অনবহিত, বিবেকহীন, উদ্ধত, শঠ, পরাপমানকারী, অলস, বিষাদী ও দীর্ঘসূত্রী কর্ত্তা তামস বলিয়া উক্ত হয়।' অর্থাৎ যে সকল তামসিক প্রকৃতির লোক তাহারা স্বভাবতঃই নিশ্চেষ্ট, অলস ও বিবেকহীন। তাহাদের বুদ্ধিও তমোগুণাচ্ছন্ন বলিয়া তাহারা ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই ঠিক করিতে পারে না, সুতরাং আসক্তি-শূন্য "অহং", অভিমানশূন্য ধৈর্য্যও উৎসাহযুক্ত সিদ্ধিও অসিদ্ধিতে বিকারশূন্য সাত্ত্বিক কর্ত্তার অবস্থা তাহারা কিরূপে লাভ করিতে পারিবে? এইজন্যই তামস প্রকৃতির লোকদিগের জন্য শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্ম বা অনুষ্ঠানের বিধান আছে, সে সব অনুষ্ঠান গুলি ঠিক ঠিক মত করিয়া গেলে তাহাদের সাত্ত্বিক

বুদ্ধির বিকাশ হইতে পারে। আলস্য তমোগুণের লক্ষণ। অতএব প্রথম প্রথম বৃত্তিগুলি রাজসিক ভাবাপন্ন হওয়াও মন্দ নহে, তমোগুণের নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা বহুগুণে তাহা শ্রেয়ঃ। তবে এইটুকু লক্ষ্য রাখিলেই হইল যে, রজোগুণের প্রাবল্যে চিত্ত অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে। রজোগুণ অত্যধিক বাড়িলে আবার তমোগুণ প্রবল হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং নিত্য নিয়মিত সদালাপ ও ভগবদ্বিষয়ক আলোচনা ও কথাদি শ্রবণ করিবার অভ্যাস করিলে ঐরূপ বিড়ম্বনা না ঘটিতেও পারে। এইরূপে তমোগুণ, এবং ক্রমশঃ রজোগুণ অতিক্রম করিলে চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মল হইয়া আসিবে। চিত্ত যতই নির্ম্মল হইতে থাকিবে ততই অনিত্যবস্তুর প্রতি বিরাগ এবং নিত্যপদার্থের জন্য আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক—চিত্ত এইরূপে ক্রমশঃ সাত্বিক হয়। (সত্বের স্বভাবই প্রকাশ, সত্বগুণ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ততই নিত্য সত্য ধ্রুব পদার্থের জ্ঞান আপনা আপনিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।) অবশ্য প্রথমেই বিবেক, বৈরাগ্য বা জ্ঞান সমুদিত হয় না—এই নিরতিশয় বিষয়-লোলুপ চিত্তে প্রথম প্রথম মুমুক্ষুতা জাগিবার আশাও বিড়ম্বনা মাত্র। তবে যিনি দীর্ঘকাল সাধুসঙ্গ করিবেন এবং তাঁহাদের মুখ হইতে ভগবদ্-গুণানুকীর্ত্তন শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিবেন, তাঁহাদের স্বধর্ম্মের প্রতি এবং তদনুকূল অনুষ্ঠানাদির প্রতি শ্রদ্ধা বুদ্ধি জন্মিবেই। জীবন এইরূপেই কৃতার্থ হয়।

বৈরাগ্যাদি কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে শাস্ত্রে তাহার উপদেশ এই :—

"স্ববর্ণাশ্রম ধর্মেণ তপসা হরিতোষণাৎ।
সাধনাক্ত ভবেৎপুংসাং বৈরাগ্যাদি চতুষ্টয়ম্॥"

'স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা এবং তপস্যার দ্বারা হরিতোষণ হয় এবং এইরূপে বৈরাগ্যাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া থাকে।' ইহার ফল কি তাহাও শাস্ত্রে বলিয়াছেন "সারাবলোকিনী-বুদ্ধির্জায়তে দীপকোপমা।" অর্থাৎ সাধুসঙ্গ ও তপস্যাদ্বারা যাঁহাদিগের পাপ ক্ষয় হয়, তাঁহাদিগেরই পরমার্থ-দর্শিনী সমুজ্জল বুদ্ধি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।" অপতন্ত্র ব্যক্তির পরমার্থ প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ হয়না এবং ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধির ও উদয় হয় না। মনের আবার দুটি দিক আছে একটি মলিন ও আর একটি স্বচ্ছ। সমুদ্রের যেমন উপরেই তরঙ্গ, কিন্তু তাহার গভীর নিম্নপ্রদেশ স্থির, তদ্রূপ মনের বাহিরের দিকটাই বিষয়-বিষ-জর্জ্জরিত, তাহার ভিতরের দিক খুব স্বচ্ছ ও নির্ম্মল। মনের সেই স্বচ্ছাংশে পৌঁছিতে হইবে। মনের যে অংশটি নির্ম্মল, নির্ব্বিকার ও জড়ত্বাদি গুণ বর্জ্জিত সেখানে স্বতঃই আত্মবিচার শক্তির বিকাশ হয়। সেই স্বচ্ছাংশে পঁহুছিবার উপায় কি তাহা বশিষ্টদেব এইরূপ বলিয়াছেন—

বিচারে প্রবৃত্তি কিরূপে হয়?

"ক্রিয়াক্রমেন মহতা তপসা নিয়মেন চ।
দানেন তীর্থযাত্রাভিশ্চিরকালং বিবেকতঃ॥
দুষ্কৃতেঃ ক্ষয়মাপন্নে পরমার্থবিচারণে।
কাকতালীয়যোগেন বুদ্ধির্জন্তোঃ প্রবর্ত্ততে॥"

'দীর্ঘকাল যজ্ঞদানাদি ক্রিয়াকলাপ, সুমহৎ তপস্যা, নিয়ম ও তীর্থযাত্রাদ্বারা বিবেক বৃদ্ধি হয় এবং তদ্বারা দুষ্কৃত ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে কাকতালীয় ন্যায়ে মনুষ্যের পরমার্থ বিচারে বুদ্ধি প্রবৃত্ত হয়।'

প্রত্যহ নিয়মিত পূজার্চ্চনা, হোম, সন্ধ্যা, তর্পণ এবং সদাচার অনুষ্ঠান করিতে করিতে একটু একটু করিয়া মলিন বাসনা সমূহ ক্ষয় হইতে থাকে, চিত্তও ক্রমশঃ নির্ম্মল ও প্রশান্ত হইয়া আইসে।

'জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ॥'

জ্ঞান কিরূপে উদয় হয়?

এইরূপ নির্ম্মল চিত্তেই আত্মার স্বরূপ প্রতিবিম্বিত হয়। 'অন্তঃকরণসংশুদ্ধৌ স্বয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে।' তখনই এই জগতের নাম-রূপ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন অন্ধকার অপসারিত হইয়া যায়, তদ্রূপ জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দেহাত্মবুদ্ধি অন্তর্হিত হইয়া যায়, তখনই যথার্থ বিবেক-খ্যাতি ও পরা বৈরাগ্যের উদয় হয়। এতদবুদ্ধি লাভের জন্যই বিচারনিষ্পন্ন-ধ্যান ও সাধননিষ্পন্ন-স্থিরবুদ্ধির আবশ্যকতা। মলিন মনোবুদ্ধি থাকিতে এরূপ বিচার সুনিষ্পন্ন হইবার নহে। বাহ্যবস্তু বিচার শাস্ত্রের লক্ষ্য নহে। কারণ তাহা ত সাধারণ বৈষয়িক বুদ্ধি দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। তজ্জন্য সংযম, নিয়ম, তপস্যা, তীর্থ-পর্য্যটনের কোনই প্রয়োজন নাই। শাস্ত্র তাহাকেই বিচার বলিয়াছেন যাহাতে আত্মজ্ঞান সঞ্জাত হয়। তাহার প্রণালী এইরূপ—

'কোঽহং কথমিদং জাতং কোবৈ কর্ত্তাস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ॥'

বিচার প্রণালী

'আমি কে, কি প্রকারে এই দৃশ্য জগত সমুদ্ভূত হইল, ইহার কর্ত্তাই বা কে এবং এই জগতের উপাদানই বা কি, এই সকল অনুসন্ধানকেই বিচার কহে।'

এইরূপ বিচার করিতে করিতেই ক্রমশঃ সম্যক পরমার্থতত্ত্ব জানিবার স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠে, তখন সে আর ভূমানুসন্ধান না করিয়া কিছুতেই স্থির থাকিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় ভগবদ্ কৃপা যাহা আলোকতরঙ্গের মত সমস্ত বিশ্বকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার উপলব্ধি হইতে থাকে। ভগবানকে পাইবার জন্য যে ব্যাকুল তাহাকে ধরা দিবার জন্য তিনিই তাহার ব্যবস্থা করেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে।"

চেষ্টাশীল ব্যক্তির ভগবদকৃপা লাভ হয় এবং ভগবদকৃপা দ্বারা জ্ঞান লাভ হয়।

এইরূপে "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ॥"

প্রীতি পূর্ব্বক আমার যে ভজনা করে তাহাকে আমিই জ্ঞান দান করি। অনন্যচিত্ত হয়ে অর্থাৎ জগতের আর কিছু না চেয়ে যে কেবল আমাকেই চায় তার পক্ষে আমি খুবই সুলভ।

ইহাতে আরও একটি কথা স্পষ্ট বুঝা গেল, যে পরমাত্মার

নিত্য স্মরণ চিন্তন করিতে করিতেই তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া যাইতে পারে। এইরূপ যোগযুক্ত যতদিন না হওয়া যায়, ততদিন এই দৃশ্য পদার্থ এবং স্রকচন্দন ঐহিকভোগের প্রতি চিত্তের একান্ত আসক্তি কমিবার নহে। বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন—

ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি কিরূপে হয়?

"নতপোভির্ন দানেন নতীর্থৈরপিজায়তে।
ভোগেষু বিরতির্জন্তোঃ স্বভাবালোকনাদৃতে॥"

'আত্মদর্শন ব্যতীত তপস্যা, দান, কিম্বা তীর্থদর্শন দ্বারাও ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি হয় না।'

কেহ বলিতে পারেন আত্মদর্শন ব্যতীত যদি ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি না হয়, তবে তীর্থ পর্য্যটনাদি করিয়া ফল কি? সম্পূর্ণ ভোগেচ্ছানিবৃত্তি যদিও আত্মদর্শন ব্যতীত হয় না, কিন্তু আত্মদর্শনের জন্য মনোনিবৃত্তির প্রয়োজন, এবং মনোনিবৃত্তির জন্য পাপক্ষয় ও বাসনাশুদ্ধির প্রয়োজন। তীর্থপর্য্যটন, দান এবং তপস্যাদি দ্বারা বাসনাশুদ্ধি ও পাপক্ষয় ঘটিয়া থাকে, তাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি।

জানি না কেমন করিয়া ঐশীশক্তি-প্রভাবে ঈশ্বরোপাসনা ও তপস্যা দ্বারা সাধকের অন্তঃকরণের মধ্যে জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। কিন্তু হয় যে তাহা নিশ্চিত। একবার এই জ্ঞানালোক প্রত্যক্ষীকৃত হইলে মন তাহার দিকে হেলিয়া পড়িবেই, এবং মনের পূর্ব্ব সংস্কারসমূহ একে একে অদৃশ্য হইতে থাকিবে। তখন কোন কর্ম্মই চিত্তে আর তেমন দাগ রাখিয়া যাইতে পারে না, তখনই সমস্ত কর্ম্ম বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ সম্পন্ন হয়। এই অবস্থা পরিপক্ব

হইলেই সাধক যথার্থ ভাবে নিষ্কাম হইতে পারেন। 'তিনিই সব তাঁহারই সব' 'আমি কিছু নয়, আমার কিছু নয়' এ অবস্থা তিনিই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে সমর্থ হ'ন। সুতরাং তাঁহার স্ত্রীপুত্র সংসার থাকিলেও, প্রকৃত পক্ষে তাঁহার কিছুই থাকে না। তিনি সকল অবস্থাতেই,—সকল ঘটনার মধ্যেই আপনাকে সর্ব্বতোভাবে 'অকর্তা' বলিয়া দেখিতে পান এবং উক্তভাবে সর্ব্ব কার্য্য করিতে অভ্যস্ত হইয়া যান। কোন কার্য্যের লাভালাভ, সুখ দুঃখ তাঁহাকে আর তখন বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। এইরূপে যোগীরা পুরুষকার প্রভাবে অর্থাৎ শ্রদ্ধা, বীর্য্য ও নিত্য অবিস্মৃতি দ্বারা অত্যন্ত অসম্ভব ব্যাপারকেও সম্ভব করিয়া তুলেন, অর্থাৎ মানসিক-ব্যাপার-শূন্য বুদ্ধিকে নিশ্চল করিয়া তুলিলে ব্যাপার-নির্ব্বাহসত্ত্বেও স্মৃতি সাধন দ্বারা তাঁহারা কর্ম্ম করিয়াও বদ্ধ হন না। কারণ কর্ম্মফলে তাঁহারা স্পৃহাশূন্য। মনের এরূপ অবস্থা লাভ করা কেহ যেন অসম্ভব মনে না করেন।

শ্রীরামচন্দ্র বন্ধুদিগের প্রতি উপদেশ দিয়াছেন—হে বন্ধুগণ, এ সংসার কিছুই নহে, সুতরাং তুমি আমি কেহই কিছু নহি। সর্ব্বদা এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া কোন বিষয়েই বদ্ধ ও আসক্ত হইবেনা। ইহাই পরমপদরূপ অত্যুচ্চ প্রাসাদে আরোহণের সুখময় সোপান। হে সুহৃদ্বর্গ সংসার যখন কিছুই নহে, তখন শত্রু মিত্র ও আত্মীয় অনাত্মীয় সমুদায়ও কল্পনামাত্র। 'আমি কিছু নয়' 'আমার কিছু নয়।" যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি স্পর্শ করিতেছি, ও আস্বাদন

করিতেছি—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গের যাহা গোচর হইতেছে, তাহা সমস্ত তাঁহারই প্রকাশ—অতএব তিনিই সব, তাঁহারই সব,—এইরূপ দৃঢ় ভাবনা করিতে করিতে ও এইরূপ বিচার প্রণালী অবলম্বন করিয়া তত্তৎ বিষয়ে ধ্যান লাগাইতে লাগাইতে, আত্মা অনাত্মা কি, বস্তু ও অবস্তু কি, এ সমস্ত ধারণা দৃঢ়ভাবে জন্মিতে থাকে। তখন যথার্থই মন হইতে বিষয়-লালসা ও 'আমিত্বের' অভিমান খসিয়া পড়ে। অতঃপর আত্মার ও পরমাত্মার নিত্যস্মরণ-মননরূপ ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারা, সাধক পরমাত্মাতে আপনার অভিমান "আমিত্ব" হারাইয়া ফেলেন। এরূপ হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নহে, মনকে নির্ব্বিষয় করা যায়, কেবল চেষ্টার আবশ্যক। চেষ্টা করিয়া দেখিলে সকলেই নিজ জীবনে ইহার সাফল্য অনুভব করিতে পারিবেন। মনের একটি বিচিত্র শক্তি এই যে মন যখন কাহাকেও ভাল বলিয়া ধারণা করে, তখন তাহার সমস্ত কার্য্যই মনের নিকট ভাল বলিয়া প্রতীতি হয়—আবার যদি কোন কারণ বশতঃ তাহার প্রতি প্রতিকূল ধারণা জন্মে, তখন মনের সমস্ত শক্তি তাহার বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হয়। সেই একই তো মন, কিন্তু এরূপ অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। মনের ধর্ম্মই এই। জল যখন যেরূপ পাত্রে থাকে সেইরূপ পাত্রের আকারে আকারিত হয়, মনও যখন যে ভাবকে আশ্রয় করিয়া থাকে তখনই সেই ভাবে ভাবিত হইয়া যায়। সুতরাং যে চিত্ত এখন সংসারবাসনায় অভিনিবিষ্ট হইয়া নিতান্ত মলযুক্ত

রহিয়া আছে, সেই চিত্তকে তোমার দ্বারা ব্রহ্মভাবে ভাবিত করিলে সে তখন ব্রহ্মের নির্মল ভাব গ্রহণ করিতে করিতে নির্মল নির্বিকার ব্রহ্মের সহিত একই ভাবাপন্ন হইয়া যায়।

অভ্যাস ও বিচার সাহায্যে মনের এইরূপ স্থিতিসাধন করিয়া লওয়া সকলেরই কর্তব্য ও ধর্ম।

সেই জন্যই বশিষ্ঠদেব জোর করিয়া বলিয়াছেন যে, চিত্ত আছে বলিয়াই সংসার রহিয়াছে, অতএব 'তস্মিনক্ষীণে জগৎ-ক্ষীণং'—সুতরাং রোগ আর অন্য কোথাও জন্মে নাই, রোগ এই চিত্তেই জন্মিয়াছে অতএব তাহারই চিকিৎসার বিধান কর। শাস্ত্র বলিতেছেন :—

> "পরস্য পুংসঃ সঙ্কল্পময়ত্বং চিত্তমুচ্যতে।
> অচিত্তত্বমসংকল্পান্মোক্ষস্তেনাভিজায়তে॥"

'পরম পুরুষের যে সঙ্কল্পময়ত্ব, তাহাকেই চিত্ত কহে, উক্ত সঙ্কল্পের অভাবে, চিত্তেরও অভাব হয়; তাহা হইলেই মুক্তি-লাভ ঘটে'।

"সঙ্কল্প করিবনা" বলিয়া দৃঢ়ভাবে বসিয়া মনে সঙ্কল্প বিকল্প আসিতে দিওনা, দেখিবে শীঘ্রই সঙ্কল্প ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে, ও পরিশেষে সংকল্প শূন্য হইয়াও থাকিতে পারিবে। এইরূপ স্থিতি যত বাড়িতে থাকিবে, আমরা ততই মুক্তির নিকটস্থ হইতে পারিব। কিন্তু উঠিয়া পড়িয়া লাগা চাই, করচি, করবো ভাবে হয় না।

আত্মজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত মানুষের কিছুতেই মুক্তি নাই।

বিবিধ বিষয়বাসনা এই আত্ম-জ্ঞানরাজ্যের [illegible]

বিচার ও ধ্যানাভ্যাস।

প্রাচীরের পর প্রাচীর রচনা করিয়া যেমন অন্তঃপুরকে দুর্ভেদ্য করিতে পারা যায়, তদ্রূপ মনের কল্পনাজাত অসংখ্য বাসনাই আত্মজ্ঞানের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। এই কল্পনা-প্রাচীর বিধ্বস্ত করিতে হইলে বিচাররূপ আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্য লওয়া আবশ্যক। বিচারের দ্বারাই সাধন চতুষ্টয়ের প্রধান সাধন 'নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক' অরুণালোকের ন্যায় সাধকের হৃদয়াকাশে সমুদিত হইতে থাকে। ইহার পর ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধারূপ ষট্‌সম্পত্তি মুমুক্ষুত্বের যাহা অধিকার তাহা জন্মিতে থাকে। বলিয়া আসিয়াছি বিচার কি? এক কথায় "আত্মা কি এবং আত্মা কি নয়"—এই তত্ত্ব নিরূপণই প্রকৃত বিচার। পূর্ব্বেই বলিয়াছি শুদ্ধ বাহিরের বিচারেই বিবেকের উদয় হয় না—এই জন্য মনন্, নিদিধ্যাসন, ধ্যানাভ্যাস করিতে হইবে। এই (ধ্যান দ্বারাই মন প্রকৃত সঙ্কল্প-রহিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং বাসনাশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াই যোগী মুক্ত হ'ন।) তখন তাঁহার চক্ষে এই লোক, এবং এই লোকস্থ জীব এবং পদার্থাদি সমস্তই ব্রহ্ম বলিয়া মনে হয়। রজ্জুকে যতক্ষণ সর্প বোধ থাকে, ততক্ষণ ভয় হয় কিন্তু সর্পভ্রম দূর হইলে আর ভয় থাকে না, তদ্রূপ এই জগৎ, জীব এবং তাহার সুখদুঃখাদি ততক্ষণই প্রতীতি হয়, যতক্ষণ এই চরাচর ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ না হয়। সাধকেন্দ্রয়া, এই মনঃকে ব্যোমস্বরূপে এবং ব্যোমকে

পরব্যোমের সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে পাইয়া সর্ব্বচিন্তা হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া থাকেন। এ জগৎ বা দেহাদি অনাত্মপদার্থ হইতে আত্মবোধ তিরোহিত হইলেই মানবের আধ্যাত্মিক জাগরণের অবস্থা লাভ হয়। গীতা বলিয়াছেন :—

"যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ॥"

এইরূপ জাগ্রত হইবার অভ্যাস যিনি না করেন, তাঁহার মনের সন্দেহ কখনই মিটে না এবং তিনি দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বও কখন উপলব্ধি করিতে পারেন না। যাঁহারা যথার্থ সত্যকে আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা এইরূপ "প্রবুদ্ধ" হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন। তাহা না করিয়া জ্ঞানালোচনা প্রভৃতি মৌখিক জল্পনা মাত্র। এখন দেহেন্দ্রিয়ে যে আত্মবুদ্ধি রহিয়াছে ইহাই প্রকৃত অবিদ্যার বন্ধন। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্যে ও দেহাদি বাহ্যবস্তু প্রভৃতিতে অভিমান তিরোহিত হইলেই কল্পনার "অহং" জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন উহা পরিপূর্ণ চৈতন্য সমুদ্রে অবগাহন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে। এই জন্যই সর্ব্বদা বিচার করা প্রয়োজন। বিচার ছাড়িলেই আমাদের ইন্দ্রিয়াদি পূর্ব্বাভ্যস্ত বিষয়ের অনুসরণ করে। সেই জন্য আত্মস্বরূপ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সমূহ পুনঃ পুনঃ শ্রবণ ও মনন কর্ত্তব্য। আত্মেতর যাহা কিছু তাহা সমস্তই অনিত্য ও দুঃখের মূল, ইহা নিশ্চয় জানিয়া নিত্য শ্রবণ ও মননাভ্যাসে আত্মবিষয়ক স্মৃতি ধারা প্রবাহিত হইতে থাকিলে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইয়া

আসে। আত্মস্বরূপ প্রতিপাদক বাক্যার্থ শ্রবণে আত্মবিষয়ক জ্ঞান লাভে স্পৃহা বলবতী হয় এবং আত্মধ্যান দ্বারা আত্মবিষয়ক অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু এই স্মৃতিধারার বিচ্ছেদ ঘটিলে আবার মোহ আসিয়া আচ্ছন্ন করে। সেই জন্য আত্মবিষয়ক জ্ঞান বিদিত হইয়া থাকিলেও পুনঃ পুনঃ তাহাই আলোচনা করিবে যেন কিছুতেই স্মৃতিধারার বিলোপ না ঘটে। পূর্ব্ব বিচারিত বিষয়ই পুনঃপুনঃ বিচার করিবে। "বিজ্ঞায় অপি প্রজ্ঞানং কুর্ব্বীত" ইহাই শ্রুতি-শাসন। যে অজ্ঞান হেতু জীব বদ্ধ, সুতরাং জন্ম-মরণাদি দুঃখ ক্লেশে নিরন্তর জর্জ্জরিত, কিছুতেই অপনাকে অপনি বুঝিতে পারিতেছে না সেই জন্য মাতার ন্যায় কল্যাণময়ী শ্রুতি, দুঃখ দাবাগ্নিক্লিষ্ট জীবের পরিত্রাণের জন্য এবং যে অজ্ঞান হেতু জীবের এই পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ সেই অজ্ঞান নিবারণ জন্য জীব-ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদক বাক্য সমূহ উপদেশ করিয়াছেন। জ্ঞেয় পদার্থের (আত্মার) স্বরূপ জ্ঞান অবরুদ্ধ হইলেই তৎসম্বন্ধে বিপরীত জ্ঞান জন্মিবেই। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম হইবার আগে, রজ্জুতে রজ্জু জ্ঞান আচ্ছাদিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে "তাহা সর্প" এই অভিনব-জ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। তদ্রূপ অনাদি অবিদ্যা প্রভাবে আত্মার স্বরূপ-জ্ঞান আচ্ছন্ন হওয়াতে তাঁহাতে কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, স্থূলত্ব, হ্রস্বত্ব, সুখীত্ব, দুঃখীত্ব প্রভৃতি অনাত্ম ধর্ম্ম পরিকল্পিত হইতে থাকে। শ্রুতি সেই জন্য "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" "সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা জীবের মোহ-মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন। এই

মহাবাক্য গুলিকে ধ্যান ও বিচার করিতে করিতেই মোহ পাশ হইতে মুক্তি লাভ ঘটে। এ সম্বন্ধে আর একটি নিগূঢ় কথা এই যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে হইলেই স্থূল চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর সূক্ষ্ম দেহকে ও কারণ দেহকে বুঝিতে পারা চাই। সূক্ষ্ম দেহকে দেখিলেও অনেক ভ্রম বিদূরিত হয়। কারণ সূক্ষ্ম তেজোময় দেহ প্রকাশ পাইলে তবে আত্মবিষয়িণী অন্যান্য গূঢ় রহস্য সকল উদ্‌ঘাটিত হয় এবং সমস্ত ভ্রান্তি ঘুচিয়া যায়। সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নির আলোকে যেমন সমস্ত রূপ আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হইয়া উঠে, তদ্রূপ অধ্যাত্ম জগতও ব্রহ্মলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আমাদের জ্ঞান-নেত্রে ভাসিয়া উঠে; সংশয়, সন্দেহ চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়া যায়।

এই সকল বিষয়ে পুরুষকার প্রয়োগ না করিয়া আমরা কত অনর্থ বিষয়ের জন্য নিরন্তর বৃথা পরিশ্রম করি এবং অবশেষে 'নাস্তিক' হইয়া দাঁড়াই। কারণ মস্তিষ্কে যে শক্তি থাকিলে ঈশ্বরাস্তিত্ব সহজে বুঝিতে পারা যায়, তাহা কদাচার ও কুব্যবহারে মলিন করিয়া ফেলিয়াছি, তাই মাথায় এখন সে কথা আর প্রবেশই করিতে চায় না। ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগের মধ্যে ত্রিবর্ণের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের আস্তিকতাই (জ্ঞানবিজ্ঞান-মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্) স্বাভাবিক, কিন্তু এমনই দুর্দ্দৈবের ফের যে সেই আর্য্যকুলোদ্ভব ঋষি-বংশধরদিগকে এখন আবার ঈশ্বরের অস্তিত্ব তর্ক করিয়া বুঝিতে হয়। এ সকল বিড়ম্বনার একমাত্র কারণ যে আমরা আর পূর্ব্বের মত আর্য্য সদাচার

সমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন করি না। অনভ্যাসে অনভ্যাসে চিত্তের মধ্যে এতই আবর্জ্জনা জমিয়া উঠিয়াছে, যে এখন আর সহজে তাহা দূরীভূত করিবার উপায় নাই। তাই আবার আমাদিগকে বিচারবান হইয়া অনুকূল সদাচারের অভ্যাসে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইবার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করিতে হইবে। এখনও যদি যত্ন করি, এখনও যদি অভ্যাসে দৃঢ়তা দেখাইতে পারি, তবে এই বিড়ম্বিত অবস্থাতেও আর্য্যজনোচিত মনঃপ্রাণ, আর্য্যোজনোচিত নিয়ম নিষ্ঠা, আর্য্যজনোচিত সদাচার ও সভ্যতা ফিরাইয়া পাওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র হইবে না। ভারতবর্ষীয় আর্য্য-ঋষিসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে যাঁহারা গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা ভারতের এই দুঃসময়ে পুরুষকার দ্বারা পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবার জন্য কি অভ্যাস ও প্রযত্ন করিবেন না?

পঞ্চম অধ্যায়।

কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ।

অভ্যাস যোগ বুঝিতে হইলে অগ্রে কর্ম্মযোগ বুঝা আবশ্যক, সুতরাং কর্ম্ম কি, অগ্রে তাহাই বুঝাইতেছি।

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।"

'কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কর্ম্মফলে নহে'—একথা হিন্দু-দেরই ঘরের কথা, তাই প্রাচীন মনীষীগণ নিরলস হইয়া কর্ম্ম করিতেন। তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া কিন্তু হাতে হাতে ফল পাইবার জন্যও আকুল হইতেন না। একটি ব্রাহ্মণোচিত ধৈর্য্য তাঁহাদিগকে কর্ম্মের শুভাশুভ ফল এবং তজ্জনিত সুখ ও দুঃখ হইতে উদাসীন করিয়া রাখিত। ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা যাহা কিছু করিতেন, সমস্তই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ, সমস্তই ভূমার জন্য, সমস্তই বহুজনের শুভ সংসাধনার্থ—কেবলমাত্র আপনার কথা বা আপনার মঙ্গল চিন্তা করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকিতেন না। 'বিষ্ণুপ্রীতি'ই তাঁহাদের সকল কর্ম্মের লক্ষ্য ছিল।* নিজের

---

* 'বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ' মানে বহুজনের মঙ্গলার্থ কেন বলিলাম, তাহার হেতু আছে। 'বিষ্ণু প্রীত্যর্থ'—'বিষ্ণুকে আনন্দিত করিবার জন্য' ইহার অর্থ নহে। যিনি স্বয়ং সচ্চিদানন্দ নিত্য নির্ম্মল স্বভাব, তাঁহাকে আনন্দিত করার প্রয়োজনীয়তা কি? তাঁহার তো কোন দিন কোন মুহূর্ত্তে আনন্দের অভাব নাই,—তিনি নিত্য আনন্দপূর্ণ। তবে 'বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্মের' মানে কি? সচ্চিদানন্দময়ের বিশ্বব্যাপী যে আনন্দ, তাহাই লাভ করা যে কর্ম্মের অর্থ অর্থাৎ প্রয়োজন। বিশ্ব-মানবকে প্রীতি

সুখ দুঃখ যত বড়ই হউক, তাহা যে কিছুই নয়, এ কথা তাঁহারা সাধনসুলভ দৃষ্টিপ্রভাবে বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের উপদেশবাণীর মধ্যে নিষ্কাম কর্ম্মের প্রশংসা সুমধুর বংশী-ধ্বনির মত মনঃপ্রাণকে শীতল করিয়া দেয়—এক অনির্ব্বচনীয় শান্তির সুমধুর স্নিগ্ধতা হৃদয়কে মুগ্ধ করে। ক্ষত্রিয়েরও তাই—তাঁহার রাজ্যশাসন, করগ্রহণ প্রভৃতি সমস্তই লোকস্থিতির জন্য—তাঁহার নিজের জন্য কিছুই নহে। তাই ভুবন বিজয় করিয়াও রঘু মৃৎপাত্রে ভোজনরত! সমস্ত ধার্ম্মিক রাজারাই যজ্ঞাদি করিয়া তাঁহাদের প্রায় সর্ব্বস্বই দান করিতেন। প্রার্থীদের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিয়া, দীনের দৈন্য না ঘুচাইয়া, আর্ত্তের শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করিয়া কখনই তাঁহারা হৃদয়ে শান্তি পাইতেন না। এমনই তাঁহাদের বিশ্বপ্রীতি ছিল, এমনই তাঁহারা নিষ্কাম উদার স্বভাব-সম্পন্ন ছিলেন। আশ্রয় লাভার্থ উপস্থিত শ্যেন পক্ষীর জন্য শিবি আপনার শরীর হইতে মাংসখণ্ড কাটিয়া কাটিয়া ব্যাধকে প্রদান করিতেছেন। পক্ষীরও প্রাণ রক্ষা চাই, আবার ব্যাধেরও ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়া তো চাই। পক্ষীটী সামান্য প্রাণী বলিয়া, ব্যাধ ইতর জাতি বলিয়া উপেক্ষা করা নাই। এমনই

করা, বিশ্বের সকল জীবকেই সমান ভাবে ভালবাসা, হইতেছে বিষ্ণুপ্রীতি। সুতরাং সকল জীবের কল্যাণার্থ যেকর্ম্ম করা যায়, তাহাই বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ কর্ম্ম হয়। বিষ্ণুর ধাতুঘটিত অর্থ দেখিলেও উহার লক্ষ্য ভূমা বা বিশ্ব বলিয়া মনে হইবে। বিষ—ব্যাপনে নুক্। শাস্ত্রে আছে—"যস্মাৎ বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ। তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ॥"

নিষ্কাম ধর্ম্মের সাধনা! কর্ণ নিজের বক্ষঃ চিরিয়া কবচ প্রদান করিতেছেন, আপনার মৃত্যুর কথা ভাবিতেছেন না। দুঃখিত শত্রুপীড়িত পাণ্ডবদিগকে পিতামহ ভীষ্ম আপনার মৃত্যুর উপায় বলিয়া দিতেছেন! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পরম শত্রু আততায়ী দুর্য্যোধনের প্রাণ মান বাঁচাইবার জন্য ব্যাকুল! বনবাস-ক্লেশ, বিবিধ উৎপীড়ন কিছুতেই শত্রুদিগের বিপদে তাঁহাকে উদাসীন করিয়া রাখিতে পারিল না—এমনই ধর্ম্মপ্রাণ, এমনই আশ্রিত-বৎসল হৃদয়! এই পরম পবিত্র ধর্ম্মের অনুষ্ঠান আগে ভারত-বর্ষেই অনুষ্ঠিত হইত; এরূপ জগতপাবন ধর্ম্মের কথা জগতের অন্যান্য জাতীর ইতিহাসে বিরল। যে সকল বিষয়াসক্ত পুরুষেরা ধনধান্য উপার্জ্জনে অধিকতর মনোযোগী হইলেন তাঁহারা বৈশ্য হইলেন; কারণ তাঁহারা ফলকামী ও লোভী, অতএব নিষ্কাম ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে অসমর্থ। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সেই সকল লোকদিগকে স্মরণ করিয়া "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ" এইকথা বলিয়াছেন। শূদ্রদের চিত্তের অবস্থা আরও মলিন, তাই তাঁহারা বেদবিধির বহির্ভূত হইলেন। যাহাদের হৃদয় দুর্ব্বল, যাহাদের বুদ্ধি অপরিমার্জ্জিত, যাহারা অত্যন্ত ব্যসনাসক্ত, এবং অত্যন্ত শোক মোহের বশীভূত তাহারা বেদবিধি গ্রহণে সম্পূর্ণ অযোগ্য—সুতরাং তাহারা শূদ্র। আজ শূদ্র দ্বারাই সমস্ত ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত। তাই আমরা নিষ্কাম ধর্ম্মের কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠি। প্রকৃতই বর্ত্তমান যুগে আমরা কেবল আশাপাশ-বদ্ধ কামোপভোগপরায়ণ হইয়া বিষয়ভোগকেই পরম পুরুষার্থ

বলিয়া ভাবিতেছি—অর্থসংগ্রহের বিপুল আগ্রহে আমরা সকলেই আবদ্ধ। 'ত্যাগাচ্ছান্তি নিরন্তরম্' এ কথার অর্থ কয়জনেই বা আমরা উপলব্ধি করিয়া থাকি? 'কঃ ধর্ম্ম ভূতে দয়া' ইহাই বা কয়জনে প্রতিপালন করিয়া থাকি? পরমার্থ চিন্তায় মন প্রাণকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার আগ্রহ ও সামর্থ্য আমাদের মধ্যে কয়জনার আছে? আমরা কয়জনই বা পরার্থে আত্মত্যাগের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বসিয়া আছি? বিস্ময়ের বিষয় এই, তথাপি আমরা ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, বিদ্বান, ভদ্রলোক, সাধু, দেশ-হিতৈষী, সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম্ম-প্রচারক বলিয়া পরিচয় দিতে কোন লজ্জা অনুভব করি না, এবং আজ কাল আমাদের খুব উন্নতি হইতেছে ভাবিয়া কেহ কেহ আবার স্পর্দ্ধাও করিয়া থাকি! এই তো আমাদের বিচারের ক্ষমতা। 'আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি' যেমন হইয়া থাকে আমাদেরও ঠিক তাহাই হইয়াছে। তাই আমরা সম্যক্‌দর্শী অভ্রান্ত ঋষিবাক্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করিয়া কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারি না। পাশ্চাত্য প্রথা ও সভ্যতার ব্যর্থ অনুকরণের মোহে আমরা অন্ধ, নিজের ঘরের পানে ফিরিয়া চাহিবার তাই আমাদের অবসর নাই। যাহাদের অনুকরণ করিবার জন্য আমরা এত লালায়িত, তাহারাই তাহাদের সভ্যতার বিষপানে জর্জ্জরিত হইয়া তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য রোদন করিয়া ফিরিতেছে। * পাশ্চাত্য গুরুরা, তাঁহারা তাঁহাদের সভ্যতায়

* কয়েকজন পাশ্চাত্য মনীষী তাঁহাদের সভ্যতার ও দেশের অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সন্তুষ্ট নন—কিন্তু শিষ্যদের তাহাতে ভক্তি অচল। এমনই অদৃষ্টের উপহাস্‌।! এই সকল লোকেই আবার সেই

'To be dignified is the glory of civilisation. To suppress natural laughter, and smile instead, is grand; to "put the best side out" and to conceal the natural ; to pretend to be greater, or better than we are ; to think more of our looks, walk, manners, clothing, and the wealth we have robbed the poor of—this is civilization.

To turn away from one poorly clad, not deigning an answer to a civil question ; to look coldly in the eye of a stranger, without speaking when accosted, because you have not been introduced · this is dignity ; this is fashionable * * * * to murder each other without enmity—this is to be civilised.

The earth is drenched with human gore, and her fair fields are rich with the bone dust of humanity. The glory of one nation is the destruction of another. * * * * Man has made this earth one vast pandemonium—a cesspool, out of which came malarial vapours and malarial beings, distorted in body, deformed in mind, dwarfed in spirit.

Alas ! how we degrade nature or God in the bare idea. Not willing to assume the responsibility that nature puts upon him, he, Adam like, hides behind the fig leaves his nakedness, and ascribes to fate, nature, chance or necessity the actions he is ashamed of.

আবার অন্য দিকে ভারতবর্ষের উচ্চ অধ্যাত্ম জ্ঞানের অমর জ্যোতিঃতে মুগ্ধ হইয়া বিশ্ববিখ্যাত অধ্যাপক ম্যাক্ষমূলর তাঁহার "What can India tea h us" গ্রন্থে civil service পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শাস্ত্র প্রণেতা ভূদেব আপ্তকাম ঋষিদিগকে স্বার্থপর বলিয়া গালি দেন। শূদ্রেরা যদি বেদ বহির্ভূত না হইত, তবে এতদিন ধর্ম্ম বলিয়া কোন পদার্থ জগতে থাকিত কি না সন্দেহ। অবশ্য শূদ্র বলিতে আমি বর্ত্তমান শূদ্রজাতিকে শুধু লক্ষ্য করিতেছি না। শূদ্র তাহারাই, যাহারা বেদবিধি গ্রহণে অসমর্থ—ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অযোগ্য। শাস্ত্রে কাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন দেখুন—

'ক্ষান্তং দান্তং জিতাত্মানং জিতক্রোধং জিতেন্দ্রিয়ং।
তমেবং ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃত॥"

নিষ্কাম ধর্ম্মটা লইয়া আজকাল খুবই নাড়াচাড়া চলিতেছে।

If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power, and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to Indla. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thougnts of Greeks and Romans, and of one Semitic race the Jewish, may draw that corrective which is most wanted, in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only, but a transfigured and eternal life again I should point to India.

'নিষ্কাম ধর্ম্ম, নিষ্কাম ধর্ম্ম' আজকাল শিশুর মুখেও শুনিতে পাওয়া যায়। যেন এটা খুবই সোজা জিনিষ এবং যেন তাহা আয়ত্ত করাও খুব অনায়াসসাধ্য। গীতার সংস্করণের উপর সংস্করণ হইতেছে, বহুলোক গীতা ব্যাখ্যা ও প্রকাশ করিতেছেন সত্য, কিন্তু নিষ্কাম ধর্ম্মটা মানবের মনে কোন বিশেষ সংস্কার রাখিয়া যাইতেছে কি না সন্দেহ হয়। আজ কাল যত লোক গীতা পড়ে, তাহার সহস্র ভাগের একভাগ লোকও যদি নিষ্কাম ধর্ম্মটা বুঝিতে পারিত, তবে ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক অবস্থা অন্যরূপ ধারণ করিত। হায় ভগবান্! তুমিই না অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলে;—

নিষ্কাম ধর্ম্ম।

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

'এই গীতার্থ পরম তত্ত্ব, হে অর্জ্জুন! তুমি অতপস্ক, অভক্ত, শুশ্রূষা-বিহীন অসূয়াকারীকে কদাচ বলিও না'।

ধর্ম্মই কি বুঝিলাম না তার "সকাম" আর "নিষ্কাম", সুতরাং আমার মত অতপস্ক ব্যক্তি গীতা পাঠ করিয়া কি ফললাভ করিবে? সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা গীতার মর্ম্মার্থ কি সাধারণ লোকের

ম্যাক্সমূলরের উক্ত গ্রন্থের—'Truthful character of the Hindoos' অধ্যায়টি হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করিয়া দেখা উচিৎ। তিনি চীন, মুসলমান, ইংরাজ এবং অন্যান্য ইয়ুরোপীয় সকল শ্রেণীর গ্রন্থকর্ত্তা এবং উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—যে হিন্দুরা সত্যের কি পরিমাণে আদর করিতেন; বাহুল্য ভয়ে এখানে সেগুলি উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না।

ধারণা করিবার উপায় আছে? আমাদের হৃদয় গীতার একটি শ্লোকার্ধও ধারণ করিতে অসমর্থ—তাই গীতা পাঠ করিয়া আমাদের চিত্তশুদ্ধি হওয়া দূরে থাক্, আমাদের দেহাত্মাভিমান আরও বাড়িয়া উঠে! আমরা জানিনা যে—

"সাধোর্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্।
শ্রদ্ধাহীনস্থ তৎ কার্য্যং হস্তিস্নানং বৃথৈব তৎ॥"

'গীতারূপ সলিলে সাধুর স্নান, সংসার মল নাশক হইয়া থাকে, কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির তাদৃশ কার্য্য হস্তিস্নানের স্থায় বৃথা।'

বক্ যতই গম্ভীরভাবে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ধ্যানের ভাণ দেখাক্, তাহার লক্ষ্য কিন্তু "মৎস্যের উপর"—সেইরূপ আজ কাল "নিষ্কাম ধর্ম্ম" লইয়া আমরা যতই বাড়াবাড়ি করি না কেন, আসলে আমাদের দৃষ্টি "কামোপভোগ"কে আজও অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই,—ইহা আমি প্রত্যহই প্রত্যক্ষ করিতেছি। যাঁহারা মুখে "নিষ্কাম ধর্ম্ম" লইয়া বড়াই করেন, আসলে 'নিষ্কাম ধর্ম্ম' যে কাহাকে বলে তাহাও তাঁহারা অবগত নন। তাঁহারা প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম্মের অধিকারী হইলে তাঁহাদের হৃদগত দুর্ব্বলতা বিদূরিত হইত। কিন্তু তাহা হয় নাই বলিয়াই মুখে তাঁহারা যাহা বলেন, কার্য্যকালে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করেন। এইরূপ কপটতাই শূদ্রের লক্ষণ, ইহাদের নিকট কখনই নিত্য সত্য বেদজ্ঞান উদ্ভাসিত হইতে পারে না। মুখে উচ্চ জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা উচ্চারণ করিলেও, কপট, ইন্দ্রিয়ারাম, দেহাত্মা-বাদীদের নিকট, দেহ হইতে যে আত্মা পৃথক, এই উচ্চ অধ্যাত্ম-

বিজ্ঞান সম্যক প্রস্ফুটিত হইতে পারে না সুতরাং নিষ্কামধর্ম্ম যে কি, তাহা তাঁহাদের কখন বুদ্ধিগম্য হইতেই পারে না। আবার এই সকল লোকই যখন ধর্ম্মোপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন, তখন ধর্ম্মজগতে এক অভিনব উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বার উন্মুক্ত হয়। ধর্ম্ম অনুষ্ঠানগত, ধর্ম্ম শুধু বাক্য মাত্র নহে। বাক্যার্থ বুঝিলেই ধর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না, ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে অনুষ্ঠান করিয়া দেখিতে হয়। আমরা অনুষ্ঠান করিয়া দেখিব না, ধর্ম্মকে জানিতে হইলে যে সব নিয়ম পালন আবশ্যক তাহা পালন করিব না, অথচ তাহার গূঢ়ার্থ বুঝিয়া লইব—এরূপ কখনই হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় যিনি "ওসব কিছুই নয়" বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন—ইহাতে তাঁহার হঠকারিতাই প্রকাশ পায়। সাধু পুরুষেরা এরূপ বুদ্ধিকে কখনই প্রশংসা করেন না। অনুষ্ঠান ও অভ্যাসের মধ্য দিয়া যিনি আপনার জীবনকে বিশুদ্ধ করিয়াছেন, যাঁহার হৃদয়-কপাট উন্মুক্ত হইয়াছে, যিনি আত্মার মধ্যে পরমাত্মার দিব্য জ্যোতিঃকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন—তিনিই ঋষিদিগের অলৌকিক শক্তি ও অসামান্য জ্ঞান পরিদর্শন করিয়া আনন্দিত হন তিনি লৌকিক তর্ক দ্বারা অতীন্দ্রিয় বিষয়ের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব জানিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন। সেই সকল আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন মনীষীগণ আচরণের দ্বারা ধর্ম্মের ও ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের যথার্থতা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করেন, বৃথা তর্কের দ্বারা সময়ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন না। এই সকল সৎপুরুষেরা একদিন উপদেষ্টা

হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদিগকেও বলিতে হয় "ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্য্যেন শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ, যথা কামং প্রশ্নান পৃচ্ছত, যদি বিজ্ঞাস্যামঃ সর্ব্বং হ বো বক্ষ্যামঃ।" "তোমাদিগকে আরও সংবৎসর কাল তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধা অবলম্বন করিয়া বাস করিতে হইবে। তাহার পর তোমরা ইচ্ছানুসারে প্রশ্ন কর, আমি যদি জানি তোমাদিগকে সমস্তই বলিব।" কিন্তু আজকাল আমরা শিষ্যবিত্ত অপহরণ করিবার জন্য সকলেই গুরু সাজিয়া সবজান্তা হইয়া বসিয়া আছি। ধর্ম্ম এত সহজে বুঝিবার জিনিষ তো নয়! এত সহজে বুঝিতে পারিলে বুদ্ধদেবকে ঘর ছাড়িয়া ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইত না, শঙ্করাচার্য্যকে সন্ন্যাস লইতে হইত না এবং চৈতন্য-দেবকেও কাঁদিয়া কাঁদিয়া পথে পথে বেড়াইতে হইতনা। ধর্ম্মের ব্যাকুলতা ক্ষুধার তাড়না অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর—একবার যাহার অন্তরে স্থান পাইয়াছে, তাহাকে পাগল করিয়া ছাড়িয়াছে। তা ছাড়া শাস্ত্র ও সদাচার না মানিয়া শুধু আপনার বিকৃতমস্তিষ্ক ও গায়ের জোরে কেহ কখন ধর্ম্মলাভ করিতে পারে না। আমরা নিষ্কাম ধর্ম্ম বুঝিব কি, আমাদের এমন নীচ অন্তঃকরণ যে আমরা নরকে আছি কি পৃথিবীতে আছি, তাহা স্থির করা সময়ে সময়ে দুরূহ হয়। আমাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহাদের বলিতে শুনিয়াছি 'আমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিয়া মরি, আর আমার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ পাঁচভূতে খাইয়া নষ্ট করিবে—

ইহা কিরূপে সহ্য করি'—হায়, ভারতবর্ষীয় আর্য্য সন্তান-গণ! তোমরা তোমাদের পিতামহ ঋষিদের বাক্য কি সমস্ত একবারে বিস্মৃত হইলে? তাঁহারাই যে বলিয়াছেন—'অতিথি দেবোভব'; এই দেশেই ভক্ত প্রহ্লাদ প্রার্থনায় বলিয়াছিলেন "নৈতান বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষো একঃ" 'অন্যান্য অভক্ত অসুর বালকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একা আমি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা করি না'—আর একজন ভক্ত তাঁহার ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য অন্নপূর্ণার নিকট অন্ন প্রার্থনা করিতেছেন—কিন্তু তাঁহাকে বলিতেছেন "মা এ ক্ষুধা আমার একার নয়—আমি একার জন্য তোমার নিকট ভিক্ষা করিতে আসি নাই "জায়াসুতা পরি-জনোতিথয়োন্নকামা"—সকলের জন্যই আজ তোমার নিকট ভিক্ষার ঝুলি পাতিয়াছি—সেই দেশের লোকে কেমন করিয়া একথা বলিতে শিখিল যে "তোমরা সকলে মিলিয়া খাইলে আমার অর্থেরই অপব্যয় হইবে।" আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডি ছাড়া আর কাহাকেও আপনার মনে করিতে পারি না এ কি সামান্য হীনতার কথা। আমি ও আমার স্ত্রীপুত্র ছাড়া অন্য কেহ ভোগ করিলে তাহাকে লোকসান বোধ করা, এ যে কতটা স্থূলদৃষ্টি, তাহা সেই স্থূলধীরা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। ইহা কি প্রকৃতই সত্য কথা নহে যে আমার উপার্জ্জিত অর্থে সকলেরই অধিকার আছে। আমার শরীর মনকে পুষ্ট করিবার জন্য কতযুগ ধরিয়া কত লোক পরিশ্রম করিতেছে তবে আমি মানুষ হইতে পারিয়াছি—মানুষের উপযোগী জ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান লাভ

করিতে সমর্থ হইয়াছি তাহা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়। এ ঋণ পরিশোধের জন্য আমি বিশ্বমানবের নিকট দায়ী। এই অধিকারকে সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করা এবং এই বিশ্ব নিয়মের নিকট প্রণত হওয়া—ইহাই যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম্মের ভিত্তি। বিশ্বের মধ্যে, সমস্ত জড় ও চেতনের মধ্যে এই কর্ম্মের প্রবাহ নিরন্তর অবিশ্রান্ত গতিতে বহিয়া চলিয়াছে; মূঢ় আমরা তাহা চাহিয়া দেখি না। বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য আলোক ও উত্তাপ দিয়া সমস্ত জগতের জীবনসঞ্চার করিতেছে, চন্দ্র স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় নিখিল জগতকে প্রসন্ন ও শীতল করিতেছে; অগ্নি, জল, আকাশ, মৃত্যু সকলেই তাঁহার নির্দ্দেশ মত জগৎ কার্য্যের শৃঙ্খলা সম্পাদনের জন্য আপনাদিগকে নিরত নিযুক্ত রাখিয়াছে—তজ্জন্য তাহারা কাহারো নিকট কিছুমাত্র প্রার্থী নহে। অথচ সকলেই কাজ করিতেছে—কেহ কিছু পাইবে না বলিয়া কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া বসিয়া নাই। এই অনন্ত জীবনপ্রবাহ শতমুখী হইয়া ভগবানের চরণসিন্ধু পানে ছুটিয়া চলিয়াছে—পথে তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, "কেন" চলিতেছি এ প্রশ্ন নাই। কারণ এই তাঁহার আদেশ। এইরূপ নির্ব্বিচারে তাঁহার আদেশ মানিয়া চলাই নিষ্কাম কর্ম্ম—ইহাতে কর্ম্মবন্ধন হয় না। আর যা কিছু করিবে, সকলেতেই বন্ধন—সকলেতেই মোহের ফাঁস্।

ভগবান গীতায় কর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন, এবং যেরূপভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম বন্ধন ঘটে না, তাহাও তিনি অর্জ্জুনকে শুনাইয়া-

ছেন। নিষ্কাম কর্ম্ম কিরূপে হয় সেই কথা বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন "বুদ্ধ্যাযুক্তঃ যয়া পার্থ কর্ম্ম বন্ধং প্রহাস্যসি।" ইহার টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—"যয়া বুদ্ধ্যাযুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিত কর্ম্ম-যোগেন শুদ্ধান্তঃকরণসংস্তৎপ্রসাদলব্ধা পরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি।" অর্থাৎ ঈশ্বরার্পিতচিত্তে কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি ঘটে। তখন ভগবৎ প্রসাদলব্ধ অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা কর্ম্মবন্ধন সব ক্ষীণ হইয়া যায়। ভগবান আরও বলিয়াছেন "ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা। নিরাশী নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ।" ইহার শাঙ্কর ভাষ্য এই:—"ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্য নিক্ষিপ্য অধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যাহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা। কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ। নির্ম্মমো মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বং। নির্ম্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব। বিগতজ্বরো বিগত সন্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ"। শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় 'অধ্যাত্মচেতসা'র অর্থ লিখিয়াছেন—অন্তর্য্যাম্যধীনোঽহংকর্ম্মকরোমীতিদৃষ্ট্যা—মোটের উপর দুজনের একই কথা। কর্ম্মের ফলাকাঙ্খা না করিয়া কর্ম্মেতে মমত্ব বুদ্ধি না রাখিয়া—বিবেকবুদ্ধিযুক্ত হইয়া অর্থাৎ জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের ভৃত্য আমি তাঁহার নিদেশ পালন করিয়া চলিতেছি—ইহার ভালমন্দ ফলাফল কিছুই বুঝি না—এইরূপভাবে কর্ম্ম করার নামই নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করা। কর্ম্মে যদি মমত্ববুদ্ধি না

কর্ম্ম সম্বন্ধে গীতার অভিপ্রায়।

থাকে তবে কর্ম্মের লাভালাভে হর্ষ বা সন্তাপ হইবার সম্ভাবনা নাই।

কর্ম্ম সম্বন্ধে এখনও সমস্ত কথা বলা হয় নাই, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে কর্ম্ম করিবার সামার্থ্যলাভ কিসে হয় সে কথাটা এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক। ভগবান বলিয়াছেন,—

নিষ্কাম কর্ম্ম করিবার সামর্থ্যলাভ হয় কিসে?

"জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃকৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্‌॥"

জরামরণের নাশ জন্য আমাকে আশ্রয় করিয়া যাহারা প্রযত্ন করেন (এই প্রযত্নের কথা—অভ্যাসের প্রভাব উল্লেখের সময় পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে) তাঁহারা সেই পরব্রহ্মকে, অধ্যাত্মকে এবং সমুদায় কর্ম্মকে অবগত হ'ন।

এখন বোধ হয় বুঝিলাম সরহস্য কর্ম্মকে অবগত হইতে হইলে ভগবদাশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে—প্রপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাগত হইতে হইবে। এইরূপ প্রযত্নে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহাদের সমস্ত কর্ম্মই নিষ্কাম কর্ম্মে পরিণত হয়। তাঁহার শরণাগত হওয়াও ঠিক সোজা নয়, শুধু মুখে "শরণ লইনু তুয়া পায়" বলিলে হইবে না। সেই যথার্থ শরণাগত হইতে পারে যে দৃঢ় ভজনাকারী, যাহার পাপ ক্ষয় হইয়াছে, এবং যে পুণ্যকর্ম্মদ্বারা মোহনির্ম্মুক্ত হইয়াছে। ভগবান বলিয়াছেন,—

"যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্‌।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ॥"

'কিন্তু যে সকল পুণ্যকর্ম্মকারী জনগণের পাপ নষ্ট হইয়াছে, দ্বন্দ্বজনিত মোহ হইতে যাঁহারা মুক্ত,তাঁহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া আমাকে ভজনা করেন।' এই দ্বন্দ্বজনিত মোহ ঘুচিয়া যাওয়া কি সহজ কথা? ইচ্ছাদ্বেষ হইতেই এই দ্বন্দ্বমোহ জাত—সেই ইচ্ছাদ্বেষ এই স্থূল শরীর হইতেই হয়। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে এই স্থূল শরীরের মোহ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে হইবে। স্থূল শরীরের মোহ যাঁহার ঘুচে নাই তিনি নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিবেন কিরূপে? অতএব "প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ। অনেকজন্ম-সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥" 'কিন্তু প্রযত্ন সহকারে উত্তরোত্তর যোগে অধিক যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ হইয়া অনেক জন্মে সাধন-সংবর্দ্ধিত-যোগ দ্বারা সিদ্ধি-লাভ করিয়া অনন্তর পরমা গতি প্রাপ্ত হ'ন।' যোগাভ্যাসের বলে মনে সাত্ত্বিক ভাবের সঞ্চার হয়, মনের সংকল্প বিকল্প নষ্ট হয়, চিত্ত স্থির হয়। সেই অবস্থায় ভগবানের সহিত যোগযুক্ত হওয়া যায়, পাপক্ষয় প্রযুক্ত তখন নিরন্তর ভগবৎ স্মরণ হইতে থাকে। এইরূপে যোগী অনন্য-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারিলে সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে তিনি সুলভ হ'ন। এ কথা তিনি নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছেন।

পূর্ব্বে যে ভাবে কর্ম্ম করার কথা বলা হইয়াছে, সেই ভাবে কর্ম্ম করিয়া মুমুক্ষুরা মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু কর্ম্ম-রহস্য বড়ই জটিল ও দুর্বোধ্য—বুদ্ধিমান পণ্ডিত ব্যক্তিদেরও ইহাতে সময়ে সময়ে ভ্রম হইয়া থাকে, তাই বলিয়াছি নিষ্কাম

তাবে কর্ম্ম করিলেই হইল না। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন।—

"কর্ম্মণ্য কর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
* স বুদ্ধিমান মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ॥"

'যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান এবং সর্ব্বকর্ম্মকারী হইলেও তিনি যুক্ত।' অর্থাৎ কর্ম্মবন্ধনের ভয়ে অথবা আলস্য বা কায়ক্লেশ ভয়ে যিনি কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, তিনি কর্ম্ম না করিলেও, কর্ত্তব্য কর্ম্ম অকরণের জন্য পাপভাগী হ'ন। কিন্তু যিনি জানেন যে ঈশ্বরার্পিতচিত্তে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্ম বন্ধন হয় না, তিনি কর্ম্ম করিতে কখনই ভয় পান না। তিনি সহস্র কর্ত্তব্য-কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াও কর্ম্মবন্ধন প্রাপ্ত হন না। সুতরাং তাঁহার কর্ম্ম—কর্ম্ম না করারই সমান হইল। আর যিনি কর্ম্ম করিলেন না—তাঁহার অকর্ম্মই কর্ম্ম হইল অর্থাৎ কর্ত্তব্য অপালন হেতু তাহাতেই কর্ম্ম-বন্ধন ঘটিল। সুতরাং যে গৃহে থাকে (ভগবদর্পিতচিত্ত গৃহী) এবং যে গৃহ ত্যাগ করে (সন্ন্যাসী) ইহার মধ্যে লাভবান কে অধিক হয়, তাহা নির্ণয় করা সময়ে সময়ে বড়ই কঠিন হইয়া পড়ে। আসল কথা কর্ম্ম করিয়া যখন আনন্দ হয়, কর্ম্ম যখন শুধু কর্ত্তব্য

---

* স্বামীকৃত টীকা :—অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ। প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ: পরমেশ্বরারাধনলক্ষণেকর্ম্মণিকর্ম্মবিষয়ে। অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ তস্য জ্ঞান হেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ। য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান পণ্ডিতঃ।

প্রণোদিত হইয়াই করিতে হয় না—তাহার মধ্যে বেশ প্রীতি, আনন্দ—নির্ঝরের ধারার মত ফুটিয়া বাহির হয়, তখন সে কর্ম্ম করিতে চিত্তবিদ্রোহ উপস্থিত করে না—আর তাহাই নিষ্কাম—তাহাই ভগবৎ অর্পিত কর্ম্ম। আর যে কর্ম্মে নিরানন্দে হৃদয়কে ভরিয়া রাখে, যাহা করিতে ভার বোধ হয়, চিত্ত বিমুখ হইয়া বসে—বুঝিতে হইবে সে কর্ম্ম কখনই ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম হইতে পারে না। (কারণ ভক্তের কাছে ভগবানের কর্ম্ম বড়ই আনন্দের—বড়ই সুখের।) ভক্ত কবি গাহিয়াছেন :—

"তুমি যত ভার দিয়েছ সে ভার করিয়া দিয়েছ সোজা"
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলি হয়েছে বোঝা।

সুতরাং কি ভাবে কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম অকর্ম্ম না হইয়া যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্ম হইবে তাহা ভগবান গীতার অষ্টম অধ্যায়ে আরও বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুনের "কর্ম্ম কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন :—

"ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মঃ সঞ্জিতঃ ॥"*

---

* ভূতানাং ভাবো ভূতোভাবঃ। তস্যোদ্ভবো ভূতোভাবোদ্ভবঃ। তং করোতীতি ভূতভাবোদ্ভবকরঃ। ভূতবস্তুৎপত্তিকর ইত্যর্থঃ। বিসর্গোবিসর্জ্জনং দেবতোদ্দেশেন চরুপুরোডাশাদে দ্রব্যস্ত পরিত্যাগঃ। স এষ বিসর্গলক্ষণোযজ্ঞঃ কর্ম্ম সঞ্জিতঃ কর্ম্ম শব্দিত ইত্যেতৎ। (শঙ্কর)।

ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাব উৎপত্তিঃ। উদ্ভবশ্চ অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্য মুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্টি বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ। ইত্যু ক্রমেন বৃদ্ধিঃ। তৌ ভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ। সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ। স চ কর্ম্ম শব্দবাচ্যঃ। স্বামীকৃত টীকা।

"ভূতানাং ভাবাঃ ভূত ভাবাঃ, তেষাং উদ্ভবকরঃ বিসর্গঃ ত্যাগঃ।" (যে ত্যাগ ক্রিয়া জীবের ভাবের উদ্ভাবন করিয়া থাকে, উহারই নাম কর্ম্ম।) জীবের অন্তরস্থ অস্ফুটিত ভাবনিচয় যাহা প্রসুপ্ত অবস্থায় আছে উহাদিগকে ফুটাইয়া তোলার নাম কর্ম্ম। দেবোদ্দেশে ত্যাগরূপ ক্রিয়া দ্বারা, এই ভাবকুসুম ফুটানকার্য্য সংসাধিত হয়। যে বিসর্গ বা ত্যাগ ভূতগণের ভাবের বিকাশক এবং যাহা দেবোদ্দেশে ব্যয়িত হইয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাই কর্ম্ম শব্দ বাচ্য। কিন্তু যাহা দ্বারা শক্তির অপব্যয় হয় তাহার নাম অকর্ম্ম। সুতরাং একই কর্ম্ম কর্ত্তার ভাবানুরূপ কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মঅবস্থা প্রাপ্ত হয়। ফুটনোটে শ্রীমদ্‌শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদ্‌ শ্রীধরস্বামী যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক দেখিবেন আপাত দৃষ্টিতে এই অর্থেরসহিত ভাষ্য ও টীকার অর্থের ভিন্নতা লক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে খুব বেশী পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হইবে না। উঁহারা "ভূতভাব" শব্দের অর্থ "জীবের উৎপত্তি" করিয়াছেন, আর আমরা বলিতেছি জীবের অন্তরের ভাব। জীবের উৎপত্তি মানেই সৃষ্টি। সৃষ্টি মানেই তো ভাবের বিকাশ। জগৎপিতা পরমেশ্বরের অন্তরে, জগৎ যাহা ভাবরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, কর্ম্মদ্বারা তাহারই বিকাশ সাধন করাই সৃষ্টি। সেই জন্য ব্রহ্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে তপস্যা করিয়াছিলেন 'স তপোঽতপ্যত'—অর্থাৎ যে সৃষ্টি ভাবরূপে বিদ্যমান ছিল, তপস্যা প্রভাবে, তাহাই ক্রমশঃ জমাট বাঁধিয়া জগদ্রূপে পরিণত হইল। দৃশ্যমান সমস্ত পদার্থই ভাবরূপে বিদ্যমান

ছিল বলিয়াই তাহাদের এই রূপ পরিগ্রহ সম্ভবপর হইয়াছে। তা ছাড়া এ জগতে মনুষ্য যাহা কিছু গড়িয়া তোলে, তাহা কি ভাব-রূপে (ঠিক চিত্রকরের চিত্র ভাবনার ন্যায়) মনুষ্যের চিত্তাকাশে অগ্রে হইতে রূপ পরিগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান থাকে না?

ইহাই ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিদিগের "কর্ম্মের" বিশেষত্ব। যাঁহারা নিজে বুঝেন এবং লোককে বুঝাইতে চান যে পূর্ব্বতন ঋষিরা কেবল সংসারকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাদের মুক্তির কথাই ভাবিতেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। *

---

* শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের লক্ষণ বলিয়াছেন,—

"শমোদমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমে চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্॥

'শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম।' এজন্য ব্রাহ্মণ সন্তানকে বিশেষ শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করিতে হয় না। অন্ততঃ কিছু না কিছু এই সকল লক্ষণ ব্রাহ্মণের মধ্যে থাকিবেই থাকিবে। যদি না থাকে, তবে বুঝিতে হইবে তিনি ব্রাহ্মণ নন।

গুণ, কর্ম্ম ও নাম এই তিনটি দ্বারা ব্রাহ্মণ বর্ণ সিদ্ধ হয়। যাঁহার প্রথমোক্ত দুইটি লক্ষণ না থাকে তিনি নাম মাত্র ব্রাহ্মণ। যাঁহারা বলেন সে কালের ব্রাহ্মণেরা স্বার্থপর ছিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণের লক্ষণগুলি ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখিবেন। "জ্ঞান" একটি ব্রাহ্মণের গুণের মধ্যে, এই জ্ঞান তাঁহারা কাহাকে বলিতেন দেখুন "সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্‌জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥" যাহা দ্বারা বিভক্তরূপ সর্ব্বভূতে অবিভক্ত এক বিকারহীন ভাব অবলোকিত হয় সেই জ্ঞানকে সাত্ত্বিক জানিবে। সুতরাং যে উদারতা ও যে জ্ঞানের অধিকারী না হইলে ব্রাহ্মণ হওয়াই অসম্ভব সেরূপ

ফুলটি সুচারুরূপে ফুটিলেই তাহার শোভায় ও গন্ধে দিক দিগন্তকে আমোদিত করিয়া রাখে—ইহা হইলেই ফুল জীবনের পূর্ণ সার্থকতা হইল। এইরূপ ফুটন্ত ফুলই দেবপূজায় প্রশস্ত। মনুষ্যজীবনটি ও ঠিক এই ফুলের মত। ভগবচ্চরণে পূজোপহারের জন্যই তাহার জীবন, এবং ইহাতেই তাহার চরম সার্থকতা। ফুল যেমন বৃক্ষশাখাকে ভেদ করিয়া বৃন্ত হইতে উদ্গত হয়, এবং ক্রমশঃ যতই সে ফুটিতে থাকে, ততই সে বৃন্ত হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া প্রকাশ করে, ক্রমে পূর্ণ পরিস্ফুট হইলে, অতি সহজেই বৃন্তচ্যুত হইয়া স্বাধীন হয়, তদ্রূপ এই বৃক্ষরূপ কলেবর হইতেই সাধন ও অভ্যাস বলে আত্মা আপনাকে স্বতঃ প্রকাশিত করিতে থাকে এবং ক্রমশঃ দেহের বন্ধন হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া ফেলিবার অবসর পায়। মনুষ্যের মধ্যে যে সব অফুটন্ত ভাব, কুসুমকলিকার গন্ধের মত সুপ্ত ও মুদিত থাকে—সেই সকল ভাবগুলি * যদি ফুটিতে পায়, তবে তাহার গন্ধেও মাধুর্য্যে,

---

ধীমান পুরুষরা স্বার্থান্ধ হইয়া কখনই শাস্ত্র রচনা করিতে পারেন না। বরং তাঁহাদের মত এতটা উদার ও পবিত্রভাব পৃথিবীর আর কোন জাতির মধ্যে আছে কি?

* গীতাতেও ভগবান এইগুলিকে "ভাব" বলিয়াছেন
যথা :—"বুদ্ধি র্জ্ঞানমসং মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেবচ ॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপোদানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥"

মানব-সমাজে আনন্দের নিত্য নব উৎস ফুটিতে থাকে, কাল তাহাকে ধ্বংস করিতে পারে না, জরা তাহাকে জীর্ণ করিতে পারে না। ভারতবর্ষে এইরূপ কত জীবন-পুষ্প পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া ভগবচ্চরণে পুষ্পাঞ্জলিরূপে প্রদত্ত হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছে তাহার সংখ্যা নাই। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে এই পুষ্পগুলি অপ্রত্যাশিতভাবে সময়ে সময়ে ফুটিয়া উঠে। একদিন জেরুজেলামে এই ফুল ফুটিয়াছিল, আজ সমগ্র খ্রীষ্টিয়ান জগৎ তাহার শোভায় মুগ্ধ। লুথার, হাওয়ার্ড, ফাদার-ডামিয়েন, মুলার, নাইটিঙ্গেল্, কার্পেণ্টার, টলষ্টয়, ইমার্সন্, কার্লাইল, হার্ব্বার্ট-স্পেন্সার, কাণ্ট, গেটে প্রভৃতি উদার চরিত মহানুভব মানবাত্মা য়ুরোপ খণ্ডেও জন্মগ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য দেশকে ধন্য করিয়াছেন। ভারতবর্ষ এই ফুলের বাগান। অতীত যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত, সর্ব্বযুগেই ভারতবর্ষ শোভন-পুষ্পের উদ্যানভূমি। এখানে শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ, ব্যাস বশিষ্ঠ, জনক যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল অষ্টাবক্র, বুদ্ধ শঙ্করাচার্য্য, ধ্রুব প্রহ্লাদ, নারদ শুকদেব, যুধিষ্ঠির বিদুর, ভীষ্ম অর্জ্জুন, সীতা সাবিত্রী, মৈত্রেয়ী গার্গী, দময়ন্তী শৈব্যা, কুন্তী গান্ধারী প্রভৃতি কত ফুলই ফুটিয়াছিল, এখনও সমস্ত জগত যাহাদের সৌগন্ধে আকুল। চারি শত বর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গদেশে আবার কয়েকটী ফুল ফুটিয়াছিল—নবদ্বীপ আলো করিয়া শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গ [illegible] তাঁহা দের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভক্তের কথায় বলিতে গেলে "যার রূপ লাগি আঁখি ঝুরে, গুণে মন ভোর।" আমাদের ঘোর দুর্দ্দশার দিনেও, এই অতি অল্পকাল আগেও ধর্ম্মবীর রাজ

রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ, ভক্তবীর পরমহংস রামকৃষ্ণ, দানবীর দয়াসিন্ধু বিদ্যাসাগর, বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ ভূদেব, যোগীশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গস্বামী ও শ্যামাচরণ; বাগ্মীশ্রেষ্ঠ কেশব শ্রীকৃষ্ণানন্দ ও বিবেকানন্দ, ভাবুকশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখনও মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি মহানুভব পুরুষেরা এই পুণ্যভূমিকে পুণ্যময় করিয়া রাখিয়াছেন। এ তো সব লোকোত্তর পুরুষের কথা—এখনও লোকচক্ষুর অন্তরালে কত সুনির্ম্মল শোভাময় সঙ্গীতময় জীবনপুষ্প সঙ্গোপনে প্রস্ফুটিত হইতেছে—তাঁহাদিগের কয়জনের খবরই আমরা রাখিয়া থাকি? যাঁহাদের গোপন হৃদয়ের অসীম মাধুর্য্য আমাদের অজ্ঞাত ক্ষেত্রের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া চরম সার্থকতা লাভ করিতেছে। ইঁহাদের সংখ্যাও অল্প নহে।

জীবনের এই ভাবটুকু, মাধুর্য্যটুকু ফুটাইয়া তোলা এবং তাহা দেবোদ্দেশে ত্যাগ করিতে পারার নামই "কর্ম্ম"! ভাব কুসুম যখন ফুটিয়া উঠে, তখনি তাহা অতি সহজে আপনাপনি ভগবচ্চরণে লুটাইয়া পড়ে। তখনই ইহাকে প্রেমভক্তি বলে—ইহাই "ঈশ্বরে পরানুরাগ।" (কর্ম্মে যদি ঈশ্বরানুরাগ বর্দ্ধিত না হয় তবে বুঝিতে হইবে সে কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম নহে, তাহা অকর্ম্ম ও ব্যর্থশ্রম মাত্র।)

শুভকর্ম্মের দ্বারা নিষ্কাম ভাব যতই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই জ্ঞান ও প্রেম প্রগাঢ় হইয়া উঠে। ইহাই মনুষ্য-জীবনের চরম লক্ষ্য। ইহাই মনুষ্য-জীবনের পরম সমাপ্তি। অনেকে "ভক্তি"

কথাটি লইয়া বড় ভুল করেন। ভক্তি শুধু ভাবপ্রবণতা নহে। যাঁহারা কর্ম্মের দ্বারা অশুভ বাসনাকে অপসারিত করিতে না পারিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্তে জ্ঞানের নির্ম্মল আলোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠে নাই, সমুদ্রবক্ষে নাবিক-হীন তরণীর ন্যায় যাঁহাদের চিত্ত সতত বিঘূর্ণীত ও বিক্ষুব্ধ, তাঁহারা কখনও ভক্তিলাভ করিতে পারেন না। (যে ভক্তি সাধনা মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব সাধনে দীন করিয়া রাখে, জড়বৎ করিয়া সমস্ত কর্ম্ম চেষ্টা হইতে বিমুখ করিয়া তুলে; কোন প্রকার ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়িতে যাঁহাদের চিত্ত বিদ্রোহ উপস্থিত করে, তাঁহারা হরিনাম করিয়া যত অশ্রুই বর্ষণ করুন, যত ভাবোন্মত্ততার অভিনয়ই করুন তাহা কখনই প্রেমশব্দবাচ্য নহে। তাহা শুদ্ধ ভক্তির ভাণ মাত্র!) সাধনসিদ্ধ ভক্ত কবীর যথার্থ ই বলিয়াছেন "প্রেম প্রেম সব কোঈ কহে, প্রেম ন জানে কোঈ।" প্রেমিককে আপনার মস্তক প্রেমময়ের পদে অগ্রে বলিদান দিতে হয় তবে তিনি প্রেমিক হইতে পারেন। প্রেম "বিরিখের ফল" নহে যে হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে। ভক্ত যিনি তিনি সরল ও বীর্য্যশালী হইবেন, সর্ব্ব কর্ম্মে সুদক্ষ হইবেন।* সর্ব্বভূতে সমদর্শী

নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা ভক্তিলাভ।

---

* গীতায় ভক্তের লক্ষণ বলিয়াছেন :—

"সন্তুষ্টঃ সততং যোগী—যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥

ও সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ যিনি হইবেন, তাঁহার নির্ব্বোধ হইলে চলিবে না এবং সে ব্যক্তি কর্ম্মকে কখনও অবজ্ঞা করিয়া জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না। সুখ দুঃখের অতীত, সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম অকর্ম্মের বহির্ভূত জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও লোক রক্ষার জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাই দেখিতে পাওয়া যায় অরণ্যবাসী, প্রতিগ্রহ-হীন, যোগৈশ্বর্য্যযুক্ত মুক্ত পুরুষেরাও সময়ে সময়ে এই বিচিত্র কর্ম্মের রঙ্গভূমি সংসার-মঞ্চে আসিয়া দাঁড়াইতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের লাভালাভে আসক্তি না থাকিলেও, তাঁহারা "বহুজনহিতায়" কর্ম্ম করিয়া থাকেন। নচেৎ লোকরক্ষা এবং সমাজরক্ষা হয় না।

ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ অসুর বালকগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভক্তির লক্ষণ ও ভগবদ্ভজনা যে কি তাহা এইভাবে বুঝাইয়াছিলেন :—

"সর্ব্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত। সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য।"

"হে দৈত্যগণ তোমারা সমতাকে প্রাপ্ত হও, অর্থাৎ সকলকে সমান ভাবে দেখিতে শিক্ষা কর। কাহারও প্রতি দ্বেষ হিংসা করিও না। কারণ এই "সমভাব"ই অচ্যুতের উপাসনা'। এই যে সমত্বের বা ঐক্যের উপলব্ধি এবং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি—ইহা কর্ম্মযোগ-

---

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান মে প্রিয়ো নরঃ॥"

সাপেক্ষ, পরে ইহাই বিশ্বপ্রেম বা ভগবদপ্রেমে পরিণত হয়। (বহু সাধ্যসাধনায় এই অবস্থা লাভ হয়। ভক্তকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হয়। (যিনি বলবান তিনিই দুর্ব্বলের উপদ্রব সহ্য করিতে পারেন ;) বলহীন কখনও উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারে না। যাঁহারাই জগতের ও জীবের মঙ্গলসাধন করিতে যান, জগতের হিরণ্যকশিপুদের অত্যাচার তাঁহাদিগকে সহ্য করিতেই হয়। তাই মঙ্গলকামী সাধকেরা অপমান অত্যাচার আপনাদের মাথার মুকুট করিয়া লইয়াছেন। নচেৎ এ জগতের মঙ্গল করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হইত। সক্রেটিস যাঁহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে চাহিলেন, তাহারাই তাঁহাকে বিষ দান করিল ; যিনি জীবের দুঃখে ব্যথিত হইয়া সত্য ধর্ম্মের আলোক প্রদান করিতে লাগিলেন, সেই মহর্ষি যীশুকে তাঁহারই স্বদেশবাসীরা ক্রুশবিদ্ধ করিল ; যিনি ধর্ম্মকে কখনই পরিত্যাগ করিবেন না বলিয়া কৃতসঙ্কল্প, মনুষ্যত্বের উচ্চাদর্শ ভারত-বর্ষীয় আর্য্যসভ্যতার অত্যুৎকৃষ্ট ফল ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে পদে পদে কত লাঞ্ছনাই ভোগ করিতে হইয়াছিল। জগৎপূজ্য সাধ্বীশিরো-মণি মা জানকীর মাথার উপর দিয়া অজ্ঞ মনুষ্যসমাজের কত নির্য্যাতনই চলিয়া গিয়াছে ! আদর্শ মানব শ্রীরামচন্দ্র কতই না বিড়ম্বিত হইলেন। ধ্রুব প্রহ্লাদ নিতান্ত আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে কত না অমানুষিক ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেন। মহামুনি দধীচি পরহিতের জন্য তনু ত্যাগ করিলেন ; ভক্ত হরিদাস ভক্ত কবীর কতনা উৎপীড়িত হইলেন। (কিন্তু এই সকল আদর্শ পুরুষেরা

ভক্তের পরপীড়ন সহন

উৎপীড়িত হইয়াও কদাপি একদিনের জন্যও অত্যাচারকারী-দিগের অমঙ্গল কামনা করেন নাই কারণ তাঁহাদের হৃদয় ভগবৎ-প্রেমে বিভোর।)

মঙ্গলাকাশ অমঙ্গলের কুজ্ঝটিকা দ্বারাই আচ্ছাদিত থাকে, এই কুজ্ঝটিকা যে শ্রদ্ধালব্ধ, ভক্তিমার্জ্জিত পৌরুষ বলে অপসারিত করিতে পারে, সেই মঙ্গল-লক্ষ্মীর নিরাবরণ ফুল্লকমলসদৃশ শুভ্র মুখ, জ্যোৎস্নাবিমণ্ডিত চন্দ্রমার ন্যায় অবলোকন করিয়া ধন্য হয়। এই পথ চিরদিনই অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল ও কণ্টকময়। সে পথে বিচরণ করিতে গেলেই পদে পদে ক্ষতবিক্ষত ও শোণিতাপ্লুত হইতে হয়। প্রেমের পথ কখন সহজ হইয়া প্রেমিকের ক্লেশ নিবারণ করে নাই! (প্রেমই প্রেমের পুরস্কার ও পথপ্রদর্শক)। যাঁহারা 'কিনিবেচি' করিতে চান, তাঁহারা এ পথের পথিক হইতে পারেন না, তাঁহারা অব্যবসায়ী'। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের "তৃণাদপি সুনীচেন" প্রভৃতি বৈষ্ণব লক্ষণ দুর্ব্বলকে কখনই আশ্রয় করিতে পারে না। কে বিষয় ভোগ বিলাসকে তুচ্ছ করিয়া, ঐহিক পদমর্য্যাদা ও সম্ভ্রম প্রতিপত্তিকে পদদলিত করিয়া—সেই ভূমার মধ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সমস্ত বাসনার স্রোতকে নিঃশেষে নিমজ্জিত করিতে পারে? তাঁহার বিরাট আত্মত্যাগ এবং প্রতিদিনের অনলস চেষ্টা—কেহ দেখিল বা না দেখিল তজ্জন্য যিনি বিন্দুমাত্রও উদ্বিগ্ন ন'ন—এরূপ ধীর পুরুষ কে? না যিনি প্রেমবলে জ্ঞানবলে বলীয়ান, যিনি ভগবানের ত্রিলোকশরণ্য অভয় চরণাম্বুজে পরমাশ্রয় লাভ করিয়া বীতশোক হইয়াছেন—যাঁহার জীবন মুকুল পরিস্ফুটিত হইয়াছে,

যিনি বিপদ ও মৃত্যুর মাঝখানেও নির্বাত প্রদীপের মত স্থির ও অবিকম্পিত—যিনি তাঁহার 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং' মূর্ত্তির অন্তরালে করুণার স্নিগ্ধ শান্ত সুমোহন মুখচ্ছবি দেখিয়া পরম নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন—তিনিই প্রকৃত ভক্ত—তিনিই যথার্থ কর্ম্মী। তাঁহার "জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন।" ভক্ত দুঃখ শোকের মধ্যেও ভগবানকে দেখিতে পাইয়া নির্ব্যাকুল। ভক্ত বলেন;—

"দুখের বেশে এসেছ বলে'
তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা
নিবিড় করে ধরিব হে।
আঁধারে মুখ ঢাকিলে, স্বামি,
তোমারে তবু চিনিব আমি,
মরণরূপে আসিলে, প্রভু,
চরণ-ধরি' মরিব হে—

দুর্ব্বল চিত্তের ভক্তি ও জ্ঞান লাভে অযোগ্যতা

এইরূপ আত্মনিবেদিত ভক্তকেই যথার্থজ্ঞানী ও প্রেমিক বলা যাইতে পারে। বেদের এই অবিনশ্বর বাণী যেন নিরন্তর আমাদের স্মরণ-পথে সমুদিত থাকে যে "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য"। 'দুর্ব্বল ব্যক্তিরা এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' অতএব ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়। শুধু চোখে দুই ফোঁটা জল ফেলিলেই হইবে না। ভক্তকে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হইবে। হরিদাসের মত বত্রিশ বাজারের বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া,

প্রহ্লাদের মত শত নির্য্যাতনে উৎপীড়িত হইয়া, বিশুখৃষ্টের মত কুশবিদ্ধ হইয়া, ভক্ত কবীর সাহেবের মত অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়াও, যাঁহারা তাঁর সুরাসুর-সেবিত অখিলবন্দিত চরণকমলের আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পারেন না—তাঁহারাই ভক্তনামের যোগ্য, তাঁহারাই যথার্থ প্রেমিক। বহু তীব্র সাধনা, বহু জন্ম তপস্যার ফলে মনুষ্যের এই সৌভাগ্যোদয় হইয়া থাকে। যাঁহারা বলেন "প্রেমের পথ বড় সহজ, ভক্তির পথ বড় সুখকর বড় আরামের"—যাঁহারা বলেন "আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল তাঁর মাধুর্য্য-রস সম্ভোগে মত্ত হও"—নিশ্চয় জানিয়া রাখুন তাঁহারা প্রেমিক নহেন, তাঁহারা প্রতারক! অখিল জগতের নাথ, সর্ব্ব জীবের প্রাণারাম ও প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণের সেবক হইতে পারা কি অল্প সৌভাগ্যের বিষয়? ঘোর তমসাচ্ছন্ন দুর্ব্বলচেতারা কখনই তাঁর অনুগ্রহ লাভ করিতে পারেনা। ব্রজ গোপীকাদের প্রেমের ছায়াও স্পর্শ করিবার তাহাদের শক্তি কোথায়? ভক্তকে লইয়া তো ভগবান ভাঁটা খেলা করেন, তাহা সহ্য করিতে পারেন কেবল তিনিই—যিনি যথার্থ ভক্ত। স্বামীর আবদার ও অত্যাচার সাধ্বী স্ত্রীই নীরবে সহ্য করিতে পারেন—আর যিনি বিলাসিনী, তিনি তো স্বামীর শুধু সোহাগ কুড়াইয়া বেড়ান। যথার্থ পতিব্রতা ভক্তিমতী সাধ্বীর মুখেই এই কথা বাহির হইয়াছে—

"উপপত্নী তোমার নহি তাইত ভুলাওনাকো।
মিথ্যা সুখে, মিথ্যা মানে দূরে ফেলাওনাকো॥

পতিব্রতা সতী আমি তাই তো তোমার ঘরে।
যে ভিখারী সব দারিদ্র্য আমার সেবা করে॥
তোমার সুখের ভৃত্য নহি (তাই) চাইনা সুখের দান।
আমি তোমার প্রেমের পত্নী এইত আমার মান॥
তুঁহা বিনা সকল দুঃখ বিচ্ছু আমার দান।
বঞ্চিত করোনা প্রভু! এইত আমার মান॥"

জগতের সমুদয় ভার ভক্তের স্কন্ধে সে তার ভক্তির জোরেই বহন করা যায়—শুধু চালাকী করিয়া কেহই সে সৌভাগ্য লাভ করিতে পারে না। লোককে ঠকানো সহজ কিন্তু ভক্তি পাওয়া দুর্লভ। দেবতারাও সহজে পান নাই। নারদের মত অগ্রগণ্য ভক্তকেও বহু বেগ পাইতে হইয়াছিল। ভক্ত কবীর তাঁহার গাথায় বলিয়াছেন—

"ভক্তি ভেখ্ বড় অন্তরা য্যায়ছে ধরণী আকাশ।
ভক্ত যো সুমরে রামকো, ভেখ জগত কি আশ॥"

যথার্থ ভাবে যিনি ভক্তি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি সেই জন্যই কর্ম্মকে বা জ্ঞানকে কখনই অবজ্ঞা করিবেন না। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্য দিয়াই ভক্তি পূর্ণতা লাভ করে—তাই প্রেমিক ভক্ত শরীর ও মনকে তাঁহার জীবননাথের—সেবায় নিযুক্ত করেন যিনি বিশ্বরূপে এবং এই জগৎ জীবরূপে নিত্য প্রকাশিত তিনি তাঁর প্রাণের অভীষ্ট দেবতাকে কোন একটি মূর্ত্তিবিশেষের মধ্যে আবদ্ধ রাখেন না, অথচ কোন মূর্ত্তিকে অশ্রদ্ধাও করেন না। তিনি সর্ব্বত্র তাঁহার প্রেমময়ের ভাবমদিরাপূর্ণ মুখশোভা

দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া যান। ভক্তের ভ্রান্তি যাহা সেই সময় সব ঘুচিয়া যায়। তখন তিনি বলেন

ভক্তের আত্মবিস্মৃতি ও সর্ব্বাত্ম বোধের বিকাশ

"আপনার নাম মোর নাহি পড়ে মনে, পরাণ হরিল রাঙা নয়ন নাচনে।" ভক্ত সর্ব্বজীবের মধ্যে তাঁহার করুণ-কোমল লোচন-কমল দুটী দেখিতে দেখিতে বিহ্বল হইয়া পড়েন। তখন এই জগৎকে আর জড় বলিয়া তাঁহার কাছে বোধ হয় না—সমস্তই ব্রহ্মরস পূর্ণ বা ব্রহ্মময় বলিয়া বোধ হয়। মাধুর্য্যরসে তখন ভক্তের মন প্রাণ মধুময় হইয়া উঠে। তখন তাঁহার নিকট এই নীলাকাশ, এই ধরণীধূলি, এই তরুলতাপুষ্প শোভিত কানন, নদ নদী গিরিশ্রেণী, মলয় বায়ু,পবন হিল্লোল, বিক্ষোভিত সাগর-তরঙ্গ, বিহগ-কাকলী, জলকলতান সমস্তই অপরূপ সুষমায় ভরিয়া উঠে—তখন বাস্তবিকই ভক্তের নিকট বোধ হয় "মধু বাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সৈন্ধবঃ, মাধ্বীর্ণ সন্ত্বোষধীঃ মধুমৎ পার্থিবংরজঃ"—সর্ব্বত্রই মধু, সর্ব্বত্রই প্রেমানন্দ। এইরূপে সর্ব্বজীবের মধ্যে, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে, ভক্ত তাঁহাকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হ'ন। ভগবান বলিয়াছেন—

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥"

ভক্ত কিছুতেই তাই ভয় পান না কিছুতেই তাঁহার হৃদয় দমিয়া যায় না। তিনি বিপদে, সম্পদে' রোগে, [শোকে, সুখে, দুঃখে, জীবনে মরণে চিত্তকে অবিচলিত রাখেন। সরোবরবক্ষ-শোভিত কমলের মত

ভক্তের অভয়পদ লাভ

ভগবানের অরুণরাগরঞ্জিত পাদপদ্ম দুটি ভক্তের হৃদয় সরোবরে নিরন্তর প্রেমবায়ুভরে হিল্লোলিত হইতে থাকে। আর তাঁহার চিত্তে ভয় বা শোক আসিবে কোথা হইতে?

"আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন॥

ভগবৎ কৃপা সম্বন্ধেও লোকের অত্যন্ত একটা কুসংস্কার আছে। কেহ কেহ বলেন "চেষ্টা চরিত্র করিলে কি হইবে বাপু, ভগবৎ কৃপা ব্যতীত যে কিছুই হয়না।" একথাতে এমনি মনে হয় ভগবান যেন স্বেচ্ছাচারী সম্রাট বিশেষ, তিনি আপনার খেয়াল মত কৃপা করিয়া থাকেন; ব্যক্তি বিশেষের কর্ম্ম, অকর্ম্ম, যোগ্যতা, অযোগ্যতার কথা কিছুই বিচার করেন না। তাঁহার সম্বন্ধে এরূপ ধারণা পোষণ করা আস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে। যিনি "যমঃ সংযমতা-মহং"—যিনি সাক্ষাৎ নিয়মস্বরূপ, তাঁহার বিধানের মধ্যে কি অনিয়ম (lawlessness) থাকিতে পারে? তিনি আপনার নিয়মকে আপনি কখন ভঙ্গ করেন না এবং অন্য কেহ ভঙ্গ করিয়া যে নিষ্কৃতি পাইবেন তাহার জোটিও নাই—দেবতারাও পান না। জগৎকর্ত্তা যিনি, তিনি যদি নিয়মকে শ্রদ্ধা না করিতেন, তবে এই জগতের আজ কি দুর্দ্দশা হইত, তাহা আমারা কল্পনাও করিতে পারি না।

ভগবৎ কৃপা।

তিনি যে পরম কৃপালু ইহা তাঁহার জাগতিক নিয়ম শৃঙ্খলা দেখিলেই বুঝা যায়। তাঁহার নিয়মই তাঁহার অনন্ত করুণার পরি-চায়ক। মানুষের মত গলিয়া যাওয়া ভাব—যাহা কতকটা দুর্ব্বল-

তাঁরই পরিচায়ক—সেরূপ দয়া তাঁহার আছে কিনা বলিতে পারি না, কারণ সেরূপ দয়া—দয়াই নয়। তাঁহার কৃপা সূর্য্যালোকের মত, সর্ব্বত্রে সমস্ত প্রাণীর উপরেই নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে—তাঁহার কৃপার কোন স্থানে বা কোন কালে অভাব হইতে পারে না। আমরাই সে কৃপা গ্রহণ করি না। যদি কেহ দরজা, জানালা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকে, সূর্য্যালোক যেমন তাহার গৃহমধ্যে তেমন স্বাধীন ভাবে প্রবেশ করিতে পারে না, তদ্রূপ যে চিত্ত-বৃত্তিকে ভগবদভিমুখী করিতে পারে নাই, পরন্তু বিবিধ অসচ্চিন্তা ও অসৎ কার্য্য দ্বারা আপনার চারিদিকে একটি দুর্ব্বাসনার প্রাচীর গ্রথিত করিয়াছে, সেও এই নিরন্তর প্রবাহিত, অসীম অফুরন্ত ভগবৎ করুণারূপ-কিরণ লাভে আপনাকে আপনি অযোগ্য করিয়া তুলে, এবং চেষ্টা করিয়া তাহা হইতে আপনাকে বঞ্চিত করে। তুমি সদভ্যাসে রত হও, চেষ্টা কর, তপস্যা কর, হাতে হাতে ভগবদ্কৃপা দেখিতে পাইবে, অসদাভ্যাসে রত হও অতপস্ক হও, তাঁহার করুণা কিরণ তোমারি কর্ম্ম মেঘে আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হইবে। তাই ভগবানের উক্তি এই—

"সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।"

'আমি সর্ব্ব ভূতেই সমান, অতএব আমার দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই; কিন্তু আমাকে যাঁহারা ভক্তি সহকারে ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে মগ্ন থাকেন এবং আমিও তাঁহাদের মধ্যে আছি বলিয়া তাঁহাদের প্রতীতি হয়'। তুমি কিছুই চেষ্টা করিবে না,

আর অকস্মাৎ এৰ প্রহ্লাদ হইয়া উঠিবে, এরূপ দুরাশা স্বপ্নেও মনে স্থান দিও না।(সেই তাঁহার কৃপা বুঝিতে পারে, যে কর্ম্মী—যে চেষ্টাশীল।) অকর্ম্মণ্য অলস ব্যক্তিরা চিরদিনই তাঁহার কৃপায় বঞ্চিত। তাহাদের অকর্ম্মণ্যতার জন্য তাহারা "দৈবকেই" দায়ী করিয়া পরম নিশ্চিন্ত থাকে। তাহাদের সম্বন্ধেই ভগবানের এই উক্তি

জ্ঞান ভক্তি হীনের দুর্গতি।

"আসুরিং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়,ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥"

'হে কৌন্তেয়, মূঢ়গণ,জন্মে জন্মে আসুরিযোনি প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে না পাইয়া আরও অধমাগতি প্রাপ্ত হয়।'

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি দয়া, প্রেম, জ্ঞান প্রভৃতি যে সকল ভাব কুসুম অস্ফুটস্থ ভাবে আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে, (the latent energies) তাহার বিকাশ সাধন করিতে হইবে। শক্তির এই বিকাশ সাধনের—নামই কর্ম্ম। তা ছাড়া সবই অকর্ম্ম। এই কর্ম্ম আবার "নিষ্কাম কর্ম্ম" হওয়া প্রয়োজন। আপনার মধ্যে সমস্ত শক্তি গুলি বিকশিত হইবে, সমস্ত বৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হইয়া বিভিন্ন শক্তির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিবে না এবং যখন তাহা পরার্থে উৎসৃষ্ট হইবে,* তখনই কর্ম্ম

* জগতের মঙ্গলের জন্য ঋষিরা যজ্ঞ করিতেন। তাঁহারা অগ্নিতে মন্ত্রঃপূত হবি নিক্ষেপ করিতেন, তাহা প্রথমে আদিত্যমণ্ডলে গিয়া, পরে তথা হইতে বৃষ্টি রূপে পতিত হইয়া এই শস্য ও প্রজা সকলের উৎপত্তির কারণ হইয়া থাকে। সুতরাং ইহাও পরার্থে কর্ম্ম।

যথার্থ নিষ্কাম হইবে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মই ভগবানের অভিপ্রেত। জপ তপ নিয়মাদি অনুষ্ঠান করিতে করিতে এবং সদ্বিদ্যালব্ধ জ্ঞানের আলোচনা করিতে করিতে, মানসিক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হয়। কিন্তু শুধু নিজের অন্তঃকরণের অন্ধকার ঘুচিলেই চলিবে না—আমার অর্জ্জিত বিদ্যা যেন অপরের অবিদ্যা তমস্কে অপসারিত করিতে পারে—ইহাতেই বিদ্যার সম্যক সার্থকতা। আবার অর্থের সার্থকতাও ঐ প্রকারে করিতে হয়। আমার কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ অপরের প্রয়োজন সাধনে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থকে "অনর্থ" অপযশ হইতে মুক্তিদান করিবে। এই শরীরও অন্যের কল্যানার্থ নিযুক্ত থাকিবে তজ্জন্য কোন প্রকার আলস্য বা ক্লেশ অনুভব করিবে না। কারণ এই "আমি" তো শুধু আমার শরীরটি নহে। এই "আমি" অখণ্ড মণ্ডলাকারে বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। এই সর্ব্বব্যাপী বৃহৎ "অহং" কে স্বীকার না করিলে, কোন কিছুকেই স্বীকার করা হয় না। এই জন্যই সমস্ত জগতের মধ্যে, সমস্ত জীবের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করার উপদেশ শাস্ত্রে পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিয়েছেন ;—"সকল প্রাণীতে আমার ভাবনা করা, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্য, মহদ্ব্যক্তির প্রতি

বহুমান প্রদর্শন, দীনের প্রতি অনুকম্পা, আপনার তুল্য লোকের প্রতি মৈত্রী, যম ও নিয়ম; আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের শ্রবণ, নাম সঙ্কীর্ত্তন, সরলভাব, আর্য্য সঙ্গ, নিরহঙ্কার—এই সকল গুণ দ্বারা শোভিত হইয়া যে পুরুষ ভগবদ্ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন—তাঁহার চিত্ত অত্যন্ত বিশুদ্ধ হয়। আমি সকলভূতেই আত্মরূপে অবস্থিত, যে ব্যক্তি সেই ভূতের অবজ্ঞা করে অথচ আমাকে প্রতিমাদি দ্বারা অর্চ্চনা করে—তাহার অর্চ্চনা বৃথা বিড়ম্বনা। সর্ব্বভূতে আত্মারূপে অবস্থিত আমাকে ঈশ্বর জ্ঞান না করিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত যে ব্যক্তি প্রতিমার অর্চ্চনা করে—সে কেবল মাত্র ভস্মে ঘি ঢালে। মানগর্ব্বিত, ভিন্নদর্শী, যে ব্যক্তি পরের শরীরে দ্বেষ করে, ভূতের প্রতি বদ্ধবৈর সেই ব্যক্তি শান্তিলাভ করে না। যদি কেহ ভূতগ্রামের অবমাননা করিয়া মূল্যবান দ্রব্যদ্বারা আমার প্রতিমার অর্চ্চনা করে—সে অর্চ্চনা দ্বারা আমি পরিতুষ্ট হই না।"

কেবল মাত্র প্রতিমা পূজা দ্বারাই ভগবানকে লাভ করা যায় না।

এইরূপ সত্যভাবে আপনাকে ও পরমাত্মাকে জানিতে পারাই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা। নচেৎ "মৃত্যুঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

প্রকৃত কর্ম্ম কি?

ভাব সমূহের বিকাশ ও তাহা পরার্থে উৎসর্গ ই [illegible]াম কর্ম্মের প্রাণ এবং ইহাই কর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য। কর্ম্মকে এইভাবে দেখিতে না শিখিলে শান্তিলাভ হয় না। বিধিবৎ কর্ম্মের অনমুষ্ঠানে দৈবশক্তি

সংবর্দ্ধিত না হইয়া আসুরী শক্তিকে পরিপুষ্ট করে"। সুতরাং সমস্ত পরিশ্রমই পণ্ডশ্রম হয়।

ইচ্ছায় হ'ক, অনিচ্ছায় হ'ক, সকলকেই এই "কর্ম্ম" করিতে হইবে। ইউরোপীয়গণ এই কর্ম্মের সাধনা আরম্ভ করিয়াছেন—তাই তাঁহাদের এত উন্নতি। শুধু আর্থিক উন্নতি নয়, মানসিক উন্নতিও তাঁহাদের যথেষ্ট হইতেছে। তাই দেখি তাঁহাদের মধ্যে ক্রোড়পতি ধনী যদি নিঃসন্তান হ'ন, তবুও তিনি পোষ্যপুত্র গ্রহণ * করেন না। তাঁহার ধনরাশি তিনি জীবের মঙ্গলার্থ,—হয় ধর্ম্ম প্রচার, নয় জ্ঞানোন্নতির সাহায্য জন্য অথবা দারিদ্র্য দুঃখ অপনোদন বা পীড়িতের সেবার জন্য—উৎসর্গ করিয়া যান। আর আমাদের দেশের ধনীদের অর্থ অধিকাংশ সময়েই "ন দেবায় ন ধর্ম্মায়"—কেবল "ভূত ভোজনে" ব্যয়িত হয়। প্রাণ থাকিতে এই যে আমরা পরার্থে ত্যাগ করিতে পারি না, ইহা আমাদের

---

* আমাদের শাস্ত্রে দত্তক গ্রহণের বিধি আছে। এই দত্তক গ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য তাহাকে বিষয়ের অধিকারী করিয়া যাওয়া নহে। বংশের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও বিশেষ সাধনার প্রবাহ বিলুপ্ত না হয় এবং পূর্ব্ব পিতামহদের জলপিণ্ডাদি অক্ষুণ্ণ রহিবে বলিয়া এই ব্যবস্থা। কিন্তু হায় সে দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন ঔরসজাত সন্তানেরাই পূর্ব্বপুরুষকে বড় জলপিণ্ড দেয়—তার আর পোষাপুত্র। কেহ বলিতে পারেন যে আজকাল বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে—তাই জলপিণ্ডদানাদি আর কেহ করিতে চায় না। ভাল কথা—বিশ্বাস মতই কার্য্য করিয়া যাও কিন্তু পোষাপুত্র লওয়া কেন? বিষয় থাকে, দেব সেবায় বা 'বহুজনহিতায়' কোন কর্ম্মের জন্য ত্যাগ করিতে পার—ইহাতে কোন কুসংস্কার স্পর্শ করিবে না।

আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা ও ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থার ফল! ইহা আমাদের নিজকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের পরিনাম—ইহা অদৃষ্ট নহে।

আপনাকে আপনি ফোটাইয়া তোল। এবং এই জীবনটিকে ভগবানের কর্ম্মের যোগ্য করিয়া লওয়া মানবের সম্পূর্ণ ইচ্ছার অধীন। মানবের ইচ্ছাধীন বলিলাম তাহার হেতু আছে।

জীবনকে ভগবনমুখী করা মানবের ইচ্ছাধীন

তোমার হস্তটিতে কত শক্তি আছে তাহা বুঝিবার উপায় নাই, যদি তুমি তোমার হস্তটিকে কোন প্রকার কর্ম্ম করিতে না দাও। কেহ যদি স্বাভাবিক দুর্ব্বল হয়, সেও নিয়মিত ব্যয়ামের অনুশীলন করিয়া সবল হইতে পারে। অনেককে এরূপ হইতে আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি! সুতরাং পিতামাতার নিকট হইতে স্বাভাবিক দুর্ব্বল দেহ প্রাপ্ত হইলেও অনুশীলনের ফলে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই সেই ত্রুটীর সংশোধন হইতে পারে। অনুশীলন দ্বারা সর্ব্বপ্রকার শক্তিরই উৎকর্ষ সাধন বর্ত্তমান বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও অনুমোদিত। শক্তি আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, কেবল অনুশীলন দ্বারা শক্তির উৎকর্ষ সাধন করার যা কিছু অপেক্ষা।

শরীরকে বলবান করা যেমন আমাদের ইচ্ছার ও চেষ্টার ফল, মনকে ও মানসিক শক্তি নিচয়কে শক্তি সম্পন্ন ও বিকসিত করাও তদ্রূপ আমাদের চেষ্টা সাপেক্ষ। যে প্রকৃতির এই নিগূঢ় রহস্য মানিতে পারে না, সেই অন্ধ-অজ্ঞান, এবং সেই প্রকৃতপক্ষে অধার্ম্মিক। কারণ তাহার আত্মশক্তির উপর বিশ্বাস নাই। একথা তাহা হইলে অবশ্যই সত্য যে আমরাই আমাদিগকে রক্ষাও করিতে

পারি, ধ্বংসও করিতে পারি। এ ক্ষমতা আমাদের মধ্যে আছে। ঠিক যেমন অগ্নি। অগ্নিকে বুদ্ধির সহিত চালাও, সে তোমার গৃহের অন্ধকার নাশ করিবে, রন্ধনাদি করিয়া তোমাকে তৃপ্তিদান করিবে, সমস্ত আবর্জ্জনা পুড়াইয়া স্থানগুলিকে পরিচ্ছন্ন করিয়া দিবে ; রোগ,সংক্রামক ব্যাধি,অস্বাস্থ্যকে বিতাড়িত করিয়া দিবে। আবার সেই অগ্নির অপব্যবহারে ধন, সম্পত্তি, গৃহ, উপকরণ এমন কি শরীর পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হইয়া দারুণ দুঃখের অভিনয় উপস্থিত করিতে পারে। ইহাতে অগ্নির দোষ বা গুণ নাই! অগ্নি শক্তিময়—ব্যবহারকর্ত্তার গুণে কিম্বা দোষে অগ্নির শান্ত বা প্রলয় মূর্ত্তির প্রকাশ হইয়া থাকে। মনুষ্য জীবনও ঠিক ঐ অগ্নির মত। ঠিক পথে চালনা কর—এই মনুষ্য জীবনেই স্বর্গের শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইবে। বিপথে চালাও জীবন দুর্গন্ধ অন্ধকারময় হইবে—প্রাণে নরকের অন্ধকারে ছাইয়া থাকিবে। তুমি আপনি আপনার কথা ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিবে। তুমি হয়তো ইহাকেও অদৃষ্ট বলিয়া মানিবে। আমি বলি ইহাকে অদৃষ্ট বলিতে হয় বল, কিন্তু এই অদৃষ্টের কর্ত্তা আর কেহ নয়—তুমিই স্বয়ং! অবশ্য এই যে একজন অনায়াসে ভাল হইতে পারে, স্বভাবতঃই মঙ্গলের পথে চলে ; আর একজন তেমনি সহজেই মন্দ হইয়া উঠে,স্বভাবতঃই অমঙ্গলের পথে চলিতে তাহার প্রবৃত্তি হয়—ইহার কি কোন পূর্ব্বাপর কারণ পরম্পরার সংযোগ সম্বন্ধ নাই? ইহা কি সমস্তই আকস্মিক ঘটনা? অবশ্যই তাহা নহে। যাঁহারা জন্মান্তর স্বীকার করেন,

নিজের অদৃষ্টের কর্ত্তা নিজেই

তাঁহারা ইহাকে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল বলিয়া মানিবেন; আর যাঁহারা পূর্ব্বজন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহারাও ইহা আকস্মিক বলিতে পারেন না। কারণ এই যে আমার বর্ত্তমান "আমি" ইহা আমার অতীত চিন্তা, সংসর্গ ও কর্ম্মের ফল মাত্র। এ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের নিকটও অখণ্ডনীয়। আমরা সকলেই জানি যে যদি কাহাকেও বাল্যকাল হইতে সাধু সমাজ,সৎসঙ্গ ও সৎসান্নিধ্যের (Environments) মধ্যে রাখিয়া তাহার সৎশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া যায়, তবে স্বভাবতঃই সেই বালকের প্রবৃত্তি উত্তরকালে কল্যাণ-মুখে প্রবাহিত হইয়া থাকে। আবার স্বভাবতঃ সাধু সচ্চরিত্র শান্ত ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন হইয়াও, যদি তাহার অসাধু সমাজ ও অসৎসংসর্গে বাস হয়, তবে তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিভা ও স্বভাবশুদ্ধ-বুদ্ধি কিছুই তাহাকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইতে পারে না। অনেক দেশী ও বিদেশী শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট লোকেদের জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। সময়ে সময়ে এই নিয়মের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় সত্য, যেমন হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ—কিন্তু সে জন্য ইহাকে নিয়ম বলা চলে না, বরং নিয়মের ব্যতিক্রম বলা চলিতে পারে। অবশ্য এই ব্যতিক্রমের মূলেও ভগবানের কোন বিশেষ নিয়ম কার্য্য করে, যদিও আমরা তাহা অবগত নহি। সুতরাং জন্মান্তর কেহ মানুন বা নাই মানুন, কর্ম্মফল মানিতেই হইবে। কর্ম্মই যে আমাদের শুভাশুভ গতির ব্যবস্থাপক ও নিয়ন্তা একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং একথা ইহলোক এবং পরলোক উভয়তঃই খাটে। তাহাই

যদি হয় তবে কর্ম্ম যাহাতে "শুভ কর্ম্ম হয়" এবং "অকর্ম্ম" না হয়, আগাগোড়া সেই চেষ্টাই আমাদিগকে করিতে হইবে ; এবং চেষ্টা না করিলেও নিষ্কৃতিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। পুরুষকার দ্বারা দুরদৃষ্টকে শুভাদৃষ্টে পরিণত করিতে পারা যায়—তাহা না করিয়া যে মূঢ় সহস্র দুর্গতি সহ্য করে, এবং তজ্জন্য আপনার অদৃষ্টকেই ধিক্কার দেয়—কোন প্রতীকারের চেষ্টা করে না, জ্ঞানীর শিরোমণি বশিষ্ঠদেব সেই সকল "ক্ষীণ কর্ম্ম ক্ষীণ পুণ্য উৎসাহ উদ্যম শূন্য" পুরুষকে গর্দ্দভের সহিত তুলনা করিয়াছেন।

অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায়, যে ভালকে ভাল বলিয়া ও মন্দকে মন্দ বলিয়া জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও, বহুলোক শুভের পরিবর্ত্তে অশুভকে, কল্যাণের স্থানে অকল্যাণকে বরণ করিতে বাধ্য হয়। কেন এরূপ হয় ? কেন তাহারা এই জড়তা পঙ্ক হইতে আপনাকে উদ্ধার করিতে পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হয় ? বেশ সুচিন্তিত ও খুব সুবিচারিত বিষয়েও প্রমাদ আসিয়া উপস্থিত হয়, কে যেন আমাদিগকে বলপূর্ব্বক বিহ্বল করিয়া দুষ্কর্ম্মে আসক্ত করে। তাই অর্জ্জুনের ন্যায় মহাপুরুষের মুখেও এই কাতরোক্তি উত্থিত হইয়াছে"অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ॥" জীবের এই মর্ম্মভেদী কাতর ক্রন্দনে বাস্তবিকই প্রাণকে অবসন্ন করিয়া ফেলে। প্রবৃত্তি যদি বলপূর্ব্বক আমাকে অসৎকর্ম্মে নিয়োগ করে এবং আমারও তাহাকে বাধা দিবার ক্ষমতা না থাকে তবে তো জীবন দুর্ব্বিষহ বোঝার মত কষ্টদায়ক। তবে চেষ্টা চরিত্র সবই ব্যর্থ সবই

পণ্ডশ্রম? শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যাঘ্র যেমন নিষ্কৃতিলাভের বিফল চেষ্টার পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কেবল ফেণ উদ্গীরণ করে মাত্র, আমাদের সকল চেষ্টাও কি সেইরূপ দুরাশার ব্যর্থতায় পরিসমাপ্তি হয়? এত বড় মানব জীবনের কি এই পরিণাম? ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। না তাহা নহে—ইহা কখনই সম্ভব নহে। শাস্ত্রবক্তা ঋষিরা ভ্রান্ত ন'ন। তাঁহারা জীবের অমৃত লাভের কথা পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। "এষোঽস্য পরমঃ সম্পদ্ এষাস্য পরমাগতিঃ"—তিনিই জীবের পরম সম্পদ্ তিনিই জীবের পরমাগতি।' তাঁহাকে লাভ করিয়াই মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করে। খ্রীষ্টিয়ানরা মানবাত্মাকে যেরূপ 'অপূর্ণ' বলে মানবাত্মা সেরূপ ভাবে 'অপূর্ণ' নয়; বীজ নিহিত বৃক্ষের মত অপূর্ণ মধ্যেই পূর্ণ পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন—সুতরাং জীব অপূর্ণ হইবে কি প্রকারে *? আপাত দৃষ্টিতে মানবের যে অপূর্ণতা বোধ হয় তাহা বিচার-বিভ্রম মাত্র। ভ্রমশূন্য হইয়া সংস্কার (আবর্জ্জনা) বর্জ্জিত হইয়া দেখিলে—ইহাকে আর অপূর্ণ বা অপবিত্র বলিয়া মনে হইবে না। জলকে সমল বোধ হয়, লবনাক্ত বোধ হয়, কিন্তু মল ও লবনকে সরাইয়া লইলে ইহা যে বিশুদ্ধ জল সেই বিশুদ্ধ জলই থাকিয়া যায়। এই জন্যই সম্ভব হইয়াছে যে এই শোক-মোহযুক্ত মানবাত্মাই একদিন

---

* এসম্বন্ধে ইংরাজ কবির একটি সুন্দর কবিতা আছে—

"A dim miniature of the Greatness Absolute.

A frail child of dust.

A worm A God."

পরমাত্মার মধ্যে অবসান লাভ করিবে। অমলে সমল, গুণোত্তমে গুণহীন, কখন মিলিতে পারে না। তাঁহারা পরস্পরের কখন সখা হইতে পারেন না। আদিতে দু-ই একবস্তু, তাই এই সুদীর্ঘ জীবন যাত্রার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই পরমবন্ধু, জীবনমরণের সখা, পরমাত্মীয় পরমাত্মার সহবাস লাভ। ইহাই প্রকৃত ব্রহ্মানন্দ—ইহাই অনন্তে আত্মবিসর্জ্জন। ভূমানন্দের মধ্যে এইরূপ নিমজ্জনই, এই সুচির জীবন-যাত্রার একমাত্র অমৃতময় অবসান! সুতরাং নিরাশ হইলে চলিবে না, নিশ্চেষ্ট রহিলে চলিবে না। পৌরুষ প্রভাবে, অভ্যাস সহায়ে আপনাকে আপনার কল্যাণপথে অটলপ্রতিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইবে।

আমরা প্রবৃত্তি কর্তৃক 'বলাদিব নিয়োজিত' হই বটে, কিন্তু সে দোষ কার? প্রবৃত্তির দাসত্ব করিতে আমরা ভালবাসি বলিয়াই আজ সে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, নামিবার নামটি করেনা—এখন হায়! হায়! করিলে কি হইবে? প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় তো আমরাই দিয়া আসিয়াছি। কত জন্ম এইরূপে কাটিয়া গিয়াছে—এখন সে আমাদের নিকট বলপূর্ব্বক দাসত্বের দাবী করে। কিন্তু এরূপ দাবীও সে কতক্ষণ করিতে পারে? যতক্ষণ আমরা আমাদের সখার ভবনে যাইবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প না করি। মস্তকে বহুভার, বহুদূরে বিপথে চলিয়া আসিয়াছি; "কোথা পথ" বলিয়া তবুও ভাবিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেই পথ দেখিতে পাইবে। ব্যাকুল অন্তঃকরণে "কোথা তুমি" বলিয়া ডাকিলেই

তাঁহার পাঞ্চজন্য-শঙ্খনিনাদ শুনিতে পাইবে। এমন বন্ধু ও আর কেহ নাই, এত নিকটেও আর কেহ নাই। যখনি যে ডাকে তখনি সে তাঁহার সাড়া পায়। পাপী বলিয়া ঘৃণা নাই, পূর্ব্বে ডাকি নাই বলিয়া অপরাধ গ্রহণ করা নাই—ডাকিবামাত্রই তখনি আসেন। কিন্তু এই ডাকাই বড় শক্ত। তাঁহাকে পাওয়া কঠিন নয়, তাঁহাকে চাওয়াই বড় শক্ত। জীব কতদিন হইতে কত চেষ্টা করে, তবু তাঁহাকে ডাকিবার মত চাহিবার মত অবসরই করিয়া উঠিতে পারে না। তথাপি ইহা সত্য এই প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই করিতে করিতেই একদিন এমন শুভক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়, যে আমার অজ্ঞাতে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বে, তাঁহার শুভ্রজ্যোতি আমাদের হৃদয় মনকে প্লাবিত করিয়া এক দিব্যধামের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দেয়, তখন মন প্রাণ অনন্তের পানে উধাও হইয়া ছুটিয়া যায়। সেই জন্যই বলিতেছি অভ্যাস ত্যাগ করিলে চলিবে না। অভ্যাসের প্রদীপটিকে প্রতিনিয়ত প্রজ্বলিত রাখিতে হইবে। নিজের চিরন্তন কুঅভ্যাস ও কুসংস্কারের উপরে উঠিতেই হইবে। ভক্ত কবি তাই বলিয়াছেন "হরদম লাগো রহ ভাঈ, তেরা বনত বনত বন যাঈ"। 'সদা সর্ব্বদা লাগিয়া থাক, লাগিতে লাগিতে একদিন ঠিক লাগিয়া যাইবে'!

চিত্ত কেন প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রবৃত্তি পরিচালিত চিত্তকে যেরূপে আবার স্ববশে আনিতে হয়,তাহার উপায় বলিতেছি, ভগবান অর্জ্জুনকে যে উপায় বলিয়াছেন সে কথা পরে বলিব।

প্রধান উপায় বিচার পূর্ব্বক লক্ষ্য স্থির করা। পরে বিচার ও চেষ্টা দ্বারা লক্ষ্যাভিমুখে পঁহুছিতে চেষ্টা করা। প্রথমে বেশ করিয়া আপনার হৃদয় অনুসন্ধান করিয়া দেখ তুমি "তাঁহাকে চাও কি না? যদি তাঁহাকে চাওয়াটা ঠিক হয় তবে তাঁহাকে পাইবার প্রতিবন্ধক গুলিকে ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। সাধু মহাত্মাদের উপদেশ, শাস্ত্র চিন্তা ও আত্ম চিন্তা প্রভাবে যাহা বুঝিতে পারিলাম,তাহা ধারণা করা দরকার—এইরূপ ধারণা বশীকৃত চিত্তদ্বারা লক্ষ্য বিষয়ে স্থিতি লাভ হয় এবং তখন সমস্ত অনর্থের (বিষয়েচ্ছা, ভোগেচ্ছা) উপশান্তি হয়। নচেৎ শুধু বাক্যের পণ্ডিত হইয়া রহিলাম কার্য্যে কিছুই করিলাম না, ইহাতে কিছুতেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে না। এ সম্বন্ধে প্রথম উপদেশই এই—"যে হি সংস্পর্শজাভোগা দুঃখযোনয় এব তে"—ইন্দ্রিয় ও বিষয় জনিত যে সমস্ত ভোগ সুখ—তাহাই অসীম দুঃখের কারণ বলিয়া মনে দৃঢ় ধারণা কর, কারণ বিষয়াদি জনিত যে সুখ—তাহা চিরস্থায়ী নহে, অত্যল্প কালের মধ্যেই উহা হইতে দাউ দাউ করিয়া দুঃখাগ্নি জলিয়া উঠে—ইহার পরিণাম এইরূপ নিশ্চিত জানিয়াই "ন তেষু রমতে বুধঃ"—বিবেকী তাহাতে আসক্ত হ'ন না। এই এক কথা, তারপর ভগবানের আর একটি উপদেশ মনে রাখিতে হইবে—

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌহস্য পরিপন্থিনৌ॥"

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই নিজ নিজ অনুকূল বিষয়ে লোভ এবং

প্রতিকূল বিষয়ে "দ্বেষ" অর্থাৎ বিরাগ অবশ্যম্ভাবী। তবে উপায় কি? তয়োর্নবশমাগচ্ছেৎ"—বিষয় স্মরণ হেতু রাগদ্বেষ উপস্থিত হইলেও, তাহাদের কর্ত্তৃক পরিচালিত হইও না। বিষয়-লোভ না ঘুচিলে মনে শান্তি পাওয়া যায় না, সুতরাং বিষয়ে দোষদৃষ্টি থাকা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত স্থিতপ্রজ্ঞতা লাভ হয় না। অথচ আত্মসাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত বিষয়ের প্রতি আসক্তিও সম্পূর্ণ দূর হয় না, প্রকৃত বিবেক উৎপন্ন হয় না, কিন্তু বিচারশীল ও আত্মধ্যান পরায়ণ হইলেই বুদ্ধি আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ইন্দ্রিয়-বিষয়ে অনাসক্ত হেতু স্থিতপ্রজ্ঞের অবস্থা লাভ হয়। এইরূপে জীবন কৃতার্থ হয়। যেহেতু মোক্ষার্থে যত্নবান বিবেকী পুরুষকেও, ইন্দ্রিয়গণ বলপূর্ব্বক বিষয় ভোগে রত করে, আর ইন্দ্রিয়গণও প্রমাথী লোভী এবং দৃঢ়, অতএব যোগলাভেচ্ছু ব্যক্তি ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়গণকে সংযমন করিয়া মৎপরায়ণ হইতে হইবে। এইরূপ ধীরে ধীরে "স্থিতপ্রজ্ঞ" হওয়া যায়।

তৃতীয় কথা—বিষয়-চিন্তা ত্যাগ। ভগবান বলিতেছেন—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।

সঙ্গাৎসংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥"

বিষয় চিন্তা করিলেই সেই বিষয়ে আসক্তি বা প্রী[illegible] বৃদ্ধি হয়—অর্থাৎ আরও অধিক চিন্তা করিতে ইচ্ছা [illegible]য়। এই আসক্তি হইতে সেই সেই বিষয়ে আরও তৃষ্ণা (কাম) বৃদ্ধি হয়। তাহাতেই জীবের সর্ব্বনাশ হয়। অর্থাৎ পরমাত্মচিন্তন ও তজ্জনিত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার উদয় হয় না, এবং প্রজ্ঞার উদয় না

হইলে মোহ পাশ ছিন্ন হয় না। মোহ পাশ ছিন্ন না হইলে জন্ম মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না। ইহারই নাম মহাবিনাশ। সেই জন্য শুভকামী ব্যক্তির অনর্থ চিন্তা মনে আসিতে দেওয়াই উচিৎ নহে; আসিবামাত্রই মনকে বুঝাইতে হইবে, যদি এ বিষয়ে চিন্তা করি, এখনই এই বস্তুর জন্য চিত্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পাইবে এবং অনর্থক দুঃখ ভোগ করিয়া মরিতে হইবে। বিষয় চিন্তার বেগ আসিলে তাহা বন্যার মত মনকে ভাসাইয়া লইয়া যায়। সুতরাং কাম সঙ্কল্প উৎপন্ন হইবামাত্রই বিচার দ্বারা এবং ধৈর্য্য যুক্ত বুদ্ধি দ্বারা তাহাকে অঙ্কুরেই নষ্ট করিয়া দেওয়া উচিৎ। একটু ধীরতা অবলম্বন করিলেই দেখা যায় যে প্রবৃত্তিটি আমার ঘরে সিঁধ দিবার জন্য উঁকি ঝুঁকি দিয়া অবসর অন্বেষণ করিতেছিল, তাহা আমার গৃহস্থিত বিচার খড়্গের ভীষণ ধার দেখিয়া দূর হইতেই ভয় পাইয়া পলাইয়া যাইবে। দুইবার দশবার প্রবৃত্তিকে এইরূপ নিরস্ত করিতে পারিলেই তাহারা আর মাথা তুলিবার চেষ্টা করিবে না। অবশ্য বিষয়গুলি যে হেয় এবং উহারাই তোমাকে বিপদ সাগরে ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা পুনঃ পুনঃ বিচার সাহায্যে দৃঢ় ধারণা করিয়া রাখিতে হইবে। এখন ভগবান অর্জ্জুনকে যাহা বলিতেছেন তাহা বুঝিয়া দেখা যাক।

> "কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।
> মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্॥
> ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শোমলেন চ।
> তথোল্বেনাবৃতোগর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিনা।
কামরূপেন কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥"

ইচ্ছা না থাকিলেও চিত্ত যে পাপ কলুষিত হইয়া নিরন্তর দগ্ধ হইতেছে, ইহার মূলই কাম ও কামের বিকার ক্রোধ। এই কামই মোক্ষমার্গের প্রধান বৈরী, ইহা দুষ্পূর ; অত্যুগ্র এবং জ্ঞানীর চিরশত্রু। ইহারাই জ্ঞানকে আচ্ছন্ন করিয়া মোক্ষ-মার্গকে রুদ্ধ করিয়া রাখে। কাম ও ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন, রজোগুণ যতক্ষণ প্রবল থাকিবে ততক্ষণ আমাদের চিত্ত বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ক্ষিপ্ত কুক্কুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইবে! অতএব এই রজোগুণের কবল হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে সংহৃত করিয়া সংযত করিতে হইবে। রজোগুণকে ক্ষীণ করিতে হইলে সত্ত্বগুণকে বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইবে। সত্ত্বগুণ যত বাড়িবে, কাম ক্রোধের উত্তেজনা সেই পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকিবে। বিষয়ের দ্বারা পরিপূরিত হইলেও কিছুতেই ইহার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় না। ভোগেচ্ছাই সমস্ত দুঃখের হেতু, ইহা ভোগী ও ত্যাগী সকলেরই মহাশত্রু। বিশেষতঃ ত্যাগীর। কেননা কাম ত্যাগ না হইলে সন্ন্যাসী হওয়া বিড়ম্বনা। এই কাম জ্ঞান ও বিজ্ঞান নাশক—অর্থাৎ শাস্ত্র শ্রবণ জনিত বিবেকজ ও সাধনলব্ধ জ্ঞান সমস্তই কাম দ্বারা বিনষ্টপ্রায় হয়। বহুশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতাগ্রগণ্যরও বুদ্ধি কাম দ্বারা বিমোহিত হয়।

এই কামের আশ্রয়স্থান তিনটী। (১) ইন্দ্রিয়, (২) মন, (৩) বুদ্ধি। ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের দর্শন-শ্রবণ হইলে, তৎপরে মনের আসক্তি হয়, অতএব ইন্দ্রিয়গুলি কামের যেমন প্রথম করণ, তেমনই দ্বিতীয় করণ হইল মন; মনের সংকল্প বিকল্প দ্বারা প্রবুদ্ধ কাম সংকল্প বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়, অর্থাৎ কামোপ-ভোগের প্রতি দৃঢ় আসক্তি জন্মে। অতএব এই তিনটিকে নিয়মন করিয়া কামকে জয় করিতে হইবে। চিত্ত প্রণিধান ও আত্মদর্শন দ্বারাই মন বুদ্ধি নিয়মিত হয় এবং নিয়মিত মন বুদ্ধিতে কাম সঙ্কল্প স্থায়ী হইতে পারে না অর্থাৎ কামে মুগ্ধ হইবার পুর্ব্বেই নিয়তেন্দ্রিয়রা সতর্ক হইয়া যান। ইহার উপায় ভগবান বলিতেছেন—

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরম্ মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ॥
এবং বুদ্ধেঃ পরম্ বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

ইন্দ্রিয়গণের চেষ্টা ব্যতীত দেহাদি কোন ব্যাপার সাধন করিতে পারে না, ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্ম ও প্রকাশক; এইজন্য দেহাদি হইতে ইন্দ্রিয়েরা শ্রেষ্ঠ হইল। আবার ইন্দ্রিয়গণ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনই ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ মনই ইন্দ্রিয়গুলিকে স্ব স্ব বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করে। আবার মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ মন চঞ্চল এবং সংকল্পের নিশ্চয়তা বুদ্ধি হইতেই জন্মে। আত্মার

সত্তা ও প্রকাশ ভিন্ন বুদ্ধির ও বিকাশ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব আত্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। শ্রুতিও বলিতেছেন "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ"। ক্রমানুসারে আত্মারই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিত হওয়ায়—মনে হইতে পারে আত্মাও ইন্দ্রিয়াদির ন্যায় বুঝি বা বিকারগ্রস্ত। কিন্তু তাহা নহে। আত্মা নির্ব্বিকার সাক্ষী স্বরূপ, কামাদি বিকার বিষয়েন্দ্রিয়াদিজনিত বুদ্ধিরই হইয়া থাকে—তাই বুদ্ধির পর যে আত্মা, অথচ বুদ্ধির বিকারের দাগ যেখানে লাগিতে পারে না, সেই আত্মাকে জানিলে আর কামাদি দ্বারা মোহিত হইবার আশাঙ্কা থাকে না। বিষয় তৃষ্ণা যতদিন থাকে ততদিন মন বিচলিত থাকে। বিচলিত মন ভগবদ্দর্শনে সচেষ্ট হইতে পারে না। তাই আগে দেহ শুদ্ধি মৃৎজলাদির দ্বারা করিতে হয়, পরে ইন্দ্রিয় ও মন শুদ্ধি। অর্থাৎ বিষয় গ্রহণশীল ইন্দ্রিয় মনকে ভগবৎ ভজন ও সেবা দ্বারা তদভিমুখ করিতে হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে অম্বরীষ রাজার এইরূপ সাধন ক্রম উল্লিখিত আছে—

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু
শ্রুতিঞ্চকারোঽচ্যুতসৎকথোদয়ে॥

এইরূপে বুদ্ধি নির্ম্মল ও প্রশান্ত হয়। প্রশান্তচিত্তই ভগবানের কমলাসন। অতএব আত্মসাক্ষাৎকার হইলে, আর কোন রিপুই কিছু করিতে পারিবে না, আমি অভয় পরমপদ লাভ করিব—এই দৃঢ়সংকল্প লইয়া "আত্মনা" প্রশান্ত বুদ্ধি বশীকৃত চিত্তের দ্বারা কাম

ভোগেচ্ছু মনকে ভগবদ প্রাপ্তি বিষয়ে নিশ্চল ও দৃঢ় করিতে পারিলেই এই দুর্জ্জয় কাম অর্থাৎ বিষয় তৃষ্ণাকে জয় করা যায়। বিষয়েন্দ্রিয়াদির উপাসনা না করিয়া আত্মানুসন্ধানই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপাসনা। শরীর হইতে বুদ্ধি পর্য্যন্ত সমস্তই বিকারগ্রস্ত অতএব ভ্রান্তি ও মোহ উৎপাদক। আত্মার বিকার নাই, এই জন্য আত্মোপাসনার দ্বারাই জীব মোহমুক্ত হয়। নির্ম্মল নির্ব্বিকার আত্মার স্বরূপ গুরু ও শাস্ত্র মুখে অবগত হইয়া "তমেব ধীরঃ বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" মনে মনে নিত্য অনুধ্যান করিলেই তৎ সম্বন্ধে প্রজ্ঞা উপস্থিত হয় এবং আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞা দ্বারাই কাম জনিত প্রজ্ঞার বিলয় সাধন ঘটে। এইরূপে আত্মবিষয়ক প্রজ্ঞাতে মনকে নিশ্চল করিতে পারিলেই কামসঙ্কল্প আর মাথা তুলিতেই পারে না—সত্ত্বশুদ্ধি ইহারই নামান্তর।

এইরূপে চিত্তজয়ে সামর্থ্য জন্মে। যাঁহারা অসমর্থ, যাঁহারা উচ্চ বৈরাগ্যবান পুরুষ নহেন, তাঁহারাও পুনঃ পুনঃ অভ্যাস ও বিচার দ্বারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিবার চেষ্টা করিবেন। তাহা হইলেও একদিন না একদিন কৃতার্থ হইতে পারিবেন।

"যখন বুদ্ধি আত্মার সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করিয়া ঘটাদি বিষয় উদ্ভাবন করে, তখন উহাকে মন বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়। (শান্তি, মোক্ষ)"

"বুদ্ধি নিতান্ত আত্মার অনুগত ও আশ্রিত,ব্যতিক্রমের বিধেয় এবং ইচ্ছার প্রয়োজক। (মহা। বন। অজগর।)

"ইন্দ্রিয়গণ বিষয় সকল গ্রহণ, মন সংশয় উৎপাদন, আর বুদ্ধি বিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয় করে। বিষয়ে ইন্দ্রিয় সংযোগ হইবা মাত্র, উহা মনে প্রকাশিত হইয়া থাকে।" (মহা। শান্তি। মোক্ষ)

"বুদ্ধি শ্রবণ-জ্ঞান যুক্ত হইলেই শ্রোত্র, স্পর্শজ্ঞান যুক্ত হইলেই ত্বক, দর্শন জ্ঞান যুক্ত হইলেই দৃষ্টি, রস জ্ঞান যুক্ত হইলেই রসনা, এবং ঘ্রাণ জ্ঞান যুক্ত হইলেই ঘ্রাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। এইরূপ নানাপ্রকার বুদ্ধির বিকার উপস্থিত হয়, এই সমুদায় বিকারকে ইন্দ্রিয় বলিয়া কীর্ত্তন করা যায়।" (শান্তি। মোক্ষ।)

"বুদ্ধি দেহ আশ্রয় করিয়া কখন প্রীতিলাভ, কখন অনুতাপ, কখন উভয় বিহীন হইয়া অবস্থান করিতেছে। সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিতে পারে না, তদ্রূপ বুদ্ধি, সুখ দুঃখাদি ভাবত্রয়কে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। বুদ্ধি যখন উভয় ভাব হইতে বিরত, তখন মনোমধ্যে অবস্থিত, কিন্তু রজোগুণ প্রভাবে আবার কর্ম্মের অনুসরণ করে।" (শান্তি। মোক্ষ।)

"সত্ত্বগুণ সম্পন্ন বুদ্ধি যথার্থ জ্ঞান, রজোগুণে ইন্দ্রিয়জ্ঞান, এবং তমোগুণে মোহ উৎপাদিত করিয়া থাকে।" (শান্তি)

"তমঃ প্রভৃতি গুণত্রয় বুদ্ধিকে এবং বুদ্ধি পাঁচ ইন্দ্রিয়, পঞ্চভূত ও মনকে বিষয়াসক্ত করে।" "সারথী যেমন বশীভূত অশ্বকে সঞ্চালন করে, সেইরূপ মন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয়ে নিয়োগ করিতেছে।" (শান্তি। মোক্ষ)

"জীব হৃদয়ে অবস্থান করিয়া সেই মনকে সতত নিযুক্ত

করিতেছে। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়ের এবং জীব মনের সৃষ্টি সংহারের কারণরূপে অভিহিত হয়।"

"লৌহময় কুঠার যেমন লৌহ হইতে উৎপন্ন নিগড়কে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভগ্ন হয়, তদ্রূপ ধ্যান সংস্কৃত বুদ্ধি রজোগুণ সম্ভূত স্বাভাবিক দোষ সমুদায়ের বিনাশ সাধন পূর্ব্বক শান্তি লাভ করিয়া থাকে॥" (শান্তি। মোক্ষ।)

যতক্ষণ বাসনার প্রবল বাত্যা বহিতে থাকে, যতক্ষণ হৃদয়ে ভোগ লালসা বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষনই অজ্ঞান—ততক্ষণই চিত্ত চঞ্চল হইয়া জ্ঞানের সুনির্ম্মল জ্যোৎস্নাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে—সুতরাং ততক্ষণই ভেদজ্ঞান, পুনর্জন্ম, ততক্ষণই এই শরীর এবং এই শরীরে রোগ, শোক, দুঃখ ভোগ হইতে থাকে। রজোগুণ এবং তমোগুণের প্রাবল্যেই চিত্তের বিক্ষেপ সাধিত হয় এবং চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়াই বিবিধ বিকারে বদ্ধ হয়—আবার যখন গুরুবাক্য বিচার ও সাধনাভ্যাসের ফলে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদয় হয় তখনই তত্ত্বজ্ঞান মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় ভক্তের হৃদয়ে প্রতিভাসিত হয়। সে চিত্তে আর বাসনার ছাপ লাগে না। অভ্যাস করিতে করিতে চিত্তস্পন্দনরহিত হয়, ভববন্ধন ক্ষয় পায়। শ্রদ্ধা ভক্তি হইতেই প্রকৃত বিচার ও সাধনাভ্যাসে প্রযত্ন আসে। যাঁহার প্রতি ভক্তি নাই, যাঁহাকে ভালবাসিনা তাঁহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা কেন আসিবে? আর সেই আমার ভক্তির পাত্র, সেই আমার নিজজন, যিনি আমার সুখ দুঃখের নিত্যসঙ্গী, জন্ম মরণের সাথী, আমার প্রাণের আরাম, হৃদয়ানন্দ ও প্রাণপ্রিয়।

এই পরম দয়িত বস্তুটি কোথায় কিরূপে পাওয়া যাইবে? বিচার দ্বারা সাধুসঙ্গ দ্বারা ও সৎশাস্ত্র শ্রবণদ্বারা আগে এই নিজজনটিকে চিনিয়া লইতে হইবে। তাঁহাকে একবার চিনিতে পারিলে, আর তাঁহার জন্য প্রাণের একান্ত আগ্রহ না জন্মিয়া থাকিতে পারে না। আপন মাতাকে মাতা বলিয়া জানিলে শিশুহৃদয় আপনিই আগ্রহান্বিত হইয়া পুলকিত অন্তরে জননীর অঙ্কে ঝাঁপাইয়া পড়ে। তাহা কাহারও উপদেশের অপেক্ষা করে না। কিন্তু শিশু যতক্ষণ নিদ্রিত থাকে বা ক্রীড়ায় মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার মাকে মনে পড়ে না। কিন্তু এ খেলা লইয়া তো আর কেহ চিরকাল মগ্ন থাকিতে পারে না। খেলা ভাঙ্গিতেই হয়—কারণ খেলা চিরকাল ভাল লাগিবে কেন? হস্তপদাদি অবয়ব ক্রমশঃ অবসন্ন হয়, মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন ঘর মনে পড়ে,মাকে মনে পড়ে। একবার এই ক্রীড়ার প্রতি অবজ্ঞা আসিলেই মার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে—শিশু মা, মা করিয়া অস্থির হয়। মা ও সব কাজ ফেলিয়া তখন শিশুর প্রতি মনোযোগী হ'ন, এবং আপনার প্রেমামৃত স্তন্য-ধারায় শিশুর সমস্ত সন্তাপকে হরণ করেন। ইহাই মাতা পুত্রের মধ্যে স্বাভাবিক ধর্ম্ম। শিশু রোদন করিলে মা তাহাকে সান্ত্বনা না দিয়া থাকিতে পারেন না। পরমাত্মার সঙ্গে জীবের সম্বন্ধও সেইরূপ প্রেমের ও ভালবাসার সম্বন্ধ। তাঁহাকে প্রিয় বোধ না করিয়া কেহই থাকিতে পারে না। গোপিনীরা ঠিকই বলেছিলেন "প্রেষ্ঠো ভবান্ তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা" —আপনিই সমস্ত দেহধারীদিগের প্রিয় বন্ধু আত্মা। সুতরাং

"কুর্ব্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্
নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিম্॥"

হে আত্মন্! শাস্ত্রনিপুণ ব্যক্তিরা নিত্য প্রিয় আত্মা, তোমাতেই রতি করিয়া থাকেন। দুঃখদায়ী পতিসুতাদিতে কি হইবে? দেহ বোধ যতক্ষণ, ততক্ষণ সুখ দুঃখ আমাদিগকে ছাড়ে না—দেহাতীত পরমাত্মাকে যেই দেখিল আর তখনই তাহার এই সংসার, এই দেহ, এই স্বজন বন্ধু সমস্তকেই উপেক্ষা আসিল। কারণ এ সমস্ত সম্বন্ধই দেহ সম্বন্ধ হেতু। তিনিই আমাদের প্রকৃত আত্মীয় ও বন্ধু এবং আমাদের সর্ব্বস্ব; ইহা জানিলে আর তাঁহাকে ভাল না বাসিয়া কি থাকা যায়? কেবল যতক্ষণ ঠিক এই সম্বন্ধটি বুঝিতে পারি না, ততক্ষণ তাঁহাকে ভুলিয়া সংসার খেলায় মগ্ন থাকা সম্ভব। একবার বুঝিবার একবার চিনিবার যা অপেক্ষা। চিনিলেই তখন "কোথা তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব, কোথা তুমি আমার প্রাণের প্রাণ" বলিয়া কাঁদিতেই হইবে। তাঁহাকে না পাইলে তখন আর যে কিছু ভাল লাগিবে না, তখন অন্য সমস্ত কথা যে বিষের মত বোধ হইবে। প্রিয় ব্যতীত জীবন ধারণ করাও তখন ভক্তের পক্ষে অসহ্য হয়। ভক্ত প্রাণে তখন মহাপ্রভু চৈতন্যচন্দ্রের কৃষ্ণ-বিয়োগ-ব্যথার মত একটি নিদারুণ ব্যথা নিরন্তর স্ফুরিত হইতে থাকে। তখন আকুল প্রাণ দিন রাত হাহাকার করিয়া বলিতে থাকে :—

হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কাঁহা যাও কাঁহা পাও মুরলী-বদন॥

সুতরাং হৃদয়ের চিরদয়িত বস্তু সেই পরমতত্ত্বকে জানিবার জন্য শরাহত মৃগের মত ব্যাকুল অন্তঃকরণে আপনার অন্বেষমান দৃষ্টিকে সতত জাগ্রত রাখিতে হইবে।

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি॥"

ধীর বিবেকী পুরুষেরা সেই আনন্দময় অমৃত স্বরূপকে "বিজ্ঞান" দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন। সেই জন্যই মোহান্ধ জীবকে শ্রুতি সচেতন করিয়া বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" হে জীব উঠ, জাগ, শ্রেষ্ঠতত্ত্ব বিদিত হইবার জন্য সাধু মহাজনের শরণ গ্রহণ কর। শ্রেষ্ঠতত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের নিকট আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিলে তবেই মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা। তাঁহাদের মুখ হইতে আত্ম-তত্ত্ব শ্রবণ করিলে স্বতঃই সে সকল বাক্যের প্রতি শ্রদ্ধা-বুদ্ধির উদয় হয়। তাঁহাদের সমুজ্জল সাধু দৃষ্টান্ত, তাঁহাদের ব্রহ্ম-জ্ঞান দীপ্ত বদন মণ্ডলের অপূর্ব্ব জ্যোতি চক্ষের সামনে দেখিয়া—সেই পরম তত্ত্বকে জানিবার জন্য হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তাঁহাদের আশ্বাস বাণীতে হৃদয় আশান্বিত হইয়া উঠে। তখন আপনা হইতে ভোগ্য বিষয় সকল যেন নীরস বলিয়া মনে হইতে থাকে, আত্মবিষয়ের অবধারণ ও তাহা মনন করিবার জন্য চিত্তে প্রবল আগ্রহ জন্মিতে থাকে, এবং তাহার ফলে বুদ্ধি নির্ম্মল ও একাগ্র হইয়া ধ্যানাবস্থা লাভ করে, এবং সেই ধ্যান-লব্ধ সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রভাবে—

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিদ্
যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কিঞ্চিৎ"

যাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ বা অশ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই, যাঁহা হইতে ক্ষুদ্র বা মহৎ আর কিছু নাই—সেই চরমতত্ত্ব হৃদয়দেবতা পরম পুরুষকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হয়।

তাই শাস্ত্র বলিতেছেন অন্য বৃথা বাক্যের আলোচনা ছাড়িয়া দিয়া অন্য বিষয় লোভ বিসর্জ্জন দিয়া, অবহিত হইয়া সেই সত্যস্বরূপকে অন্বেষণ কর। তিনি আমার সব—

তদ্বিষ্ণোঃ পরমংপদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।
তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংস সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥

বিস্ফারিত চক্ষু যেমন অনন্ত বিস্তৃত মহাশূন্যকে অবলোকন করে, তদ্রূপ শ্রেষ্ঠ মনীষিরা সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মের পরম-পদ দর্শন করিয়া থাকেন।

এই পরমপদকে লাভ করিতেই হইবে, এই জীবনেই জানিয়া যাইতে হইবে—মনে এই দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হওয়া চাই। তাহা হইলেই তাঁহাকে পাইবার পথ খুঁজিয়া পাইব।

যাঁহারা তাঁহাকে সত্যভাবে আকাঙ্ক্ষা করেন, যাঁহারা সেই পরম পদলাভের একান্ত অভিলাষী—তাঁহারা সেই নিত্য সত্য পদার্থের জন্য অবিরাম জাগিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্বেষণ করিবেন, এবং সেই ধীর বিবেকী পুরুষেরা ব্রহ্মের পরমপদ লাভে নিশ্চয়ই সমর্থ হইবেন।

অতএব "শ্রদ্ধাভক্তি ধ্যানযোগাদবৈহি
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ॥

সেই পরম তত্ত্বকে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা বিদিত হও। ত্যাগের দ্বারা, ভোগবাসনা ও বিষয় লাভের দুরাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়াই সেই চিরবাঞ্ছিত অমৃতত্বকে লাভ করা যায়। এই রূপে যে যত তাঁহার জন্য ব্যাকুল হইবে, যে যেরূপ তীব্র আগ্রহের সহিত তাঁহাকে অন্বেষণ করিবে—সে তাঁহার অবিরাম স্মৃতিকে মন মধ্যে জাগ্রত রাখিবার জন্য নিত্য প্রেমভক্তি, ধ্যান ও বিচার দ্বারা তাঁহাকে অবশ্যই এক দিন লাভ করিতে পারিবে—এ বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহের কারণ নাই।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপাসনা ও চিত্তশুদ্ধি।

ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করা, চিত্তকে বশীভূত করা অবশ্য খুব সহজ সাধন নহে। মনের প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা না থাকিলে ইহা হয় না। এরূপ সাধনে মন যে খুব উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে এরূপ সম্ভবনাও কম। কারণ চিত্ত স্বভাবতঃই বিষয়লোলুপ এবং অত্যন্ত দৃঢ় ও চঞ্চল। ইহাকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া আত্মাভিমুখ করিবার চেষ্টাও ততোধিক শ্রম ও যত্ন সাধ্য। কিন্তু তবুও উপায় আছে। সেই উপায়ই হইতেছে—"অভ্যাস"।

সমগ্র দুঃখের হেতু চিত্ত বিক্ষেপ।

যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চদুষ্করং
সর্ব্বন্তু তপসাসাধ্যং তপোহিদুরতিক্রমম্॥

যাহা কিছু দুস্তর, যাহা কিছু দুষ্প্রাপ্য, যাহা কিছু দুর্গম এবং যাহা কিছু দুষ্কর—সমুদায়ই তপস্যাসাধ্য। তপস্যা বা প্রযত্ন দ্বারা, কোন কিছু অপ্রাপ্ত থাকিতে পারে না, কারণ তপস্যার ফল অমোঘ।

তপোবিদ্যা চ বিপ্রস্য নিঃশ্রেয়সকরং পরম্।
তপসা কিল্বিষং হন্তি বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥

তপস্যা এবং আত্মজ্ঞান ব্রাহ্মণের প্রধান মোক্ষসাধন। তপস্যা দ্বারা পাপ নষ্ট হয় এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা অমৃত লাভ করা যায়।

আমরা সাধ করিয়া যে শৃঙ্খল পায়ে জড়াইয়াছি, আজ তাহা হইতে মুক্তিলাভের ইচ্ছা করিলেই যে সহজে মুক্তিলাভ করিতে পারি—তাহা নহে। একমাত্র ভরসা সদভ্যাস। বীজে যেরূপ বৃক্ষ জন্মে, তদ্রূপ এই চিত্তে জগৎ জন্মগ্রহণ করিতেছে। সৃষ্টির যাবতীয় বস্তু, এবং মন যে সেই সকল বস্তুকে নিরন্তর মনন করিতেছে—তাহা সমস্তই চিত্তের কার্য্য। সুতরাং চিত্তক্ষয়, না হইলে উপায়ান্তর নাই, সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে চিত্তের উপর জয়ী হইতে হইবে। এ সকল কথা পূর্ব্বেও আলোচনা করিয়াছি। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন "এই দৃশ্যজগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা। অজ্ঞানগর্ভে গাঢ় সন্নিবিষ্ট চিত্তই এই মিথ্যাজগতের সত্যত্ব কল্পনা করে। যাবৎ পরম বস্তু দেখিতে পাওয়া না যায় তাবৎ জগতের অস্তিত্ব। পরমবস্তু অবলোকিত হইলেই ইহার বিনাশ হইয়া থাকে।"

এই চিত্ত যতদিন মর্কটের মত চঞ্চল হইয়া বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে অবিরত ঘুরিয়া বেড়াইবে, ততদিন ইন্দ্রিয় সকলও সংযত হইবে না, অজ্ঞানান্ধকারও বিদূরিত হইবে না, এবং যিনি পরম সত্য ও জ্ঞানস্বরূপ, এবং ঐ সুদীর্ঘ জীবন যাত্রার ধ্রুব নক্ষত্র স্বরূপ তাঁহাকেও কিছুতেই বুঝা যাইবে না। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে ও সর্ব্বপ্রযত্নে চিত্তশুদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন "মার্জ্জনার দ্বারা মণির প্রভা যেমন প্রস্ফুরিত হয়, সৎশাস্ত্রও উপাসনাদি উপায় সহায়ে চিত্তশুদ্ধ হইলে, তাহাতে তেমনি সত্যের

প্রভা সঞ্চারিত হইয়া থাকে। এই সত্যই পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান ও সাক্ষাৎ পরমপদ।" বাসনা ক্ষয়ই একমাত্র চিত্তশুদ্ধির কারণ। আমাদের যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে তাহারা প্রতিনিয়ত বিষয় সকলকে (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ) স্পর্শ করে, এই স্পর্শ হইতে বিষয় জ্ঞান হয়। তাহা হইতে পুনঃ পুনঃ সেই বিষয় লাভে তৃষ্ণার উদয় হয়, এবং এই তৃষ্ণার জ্বালায় মানুষ দিবারাত্রি জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। সুতরাং যতক্ষণ বিষয় বাসনা ক্ষয় না হয় ততক্ষণ চিত্তশুদ্ধ হয় না। এই অশুদ্ধ চিত্তই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির আস্পদ। কিন্তু এই সকলের মূলই হইল অবিদ্যা বা অজ্ঞান। এই অজ্ঞানে বিষয় সংস্কার বদ্ধমূল হয়। সুতরাং অবিদ্যা বা অজ্ঞান যদি নষ্ট হয় তবে সংস্কার ও নিরুদ্ধ হয়, এবং সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে সমস্ত দুঃখের নিলয় স্বরূপ চিত্তের বিলয় হয়। চিত্তশুদ্ধ হইলে তাহাতে যে প্রবোধ সঞ্চার হয়, তৎপ্রভাবে অবিলম্বেই বিশুদ্ধ পরমাত্ম জ্ঞানের উদয় হয়।

চিত্তবিক্ষেপ নষ্ট হয় কিসে?

বিচার দ্বারা একদিকে বিষয়কে হেয় বোধ এবং সাধনাভ্যাস দ্বারা চিত্তকে স্থির করিবার প্রয়াস এই দুইটি চিত্তবিক্ষেপ নাশ করিবার প্রধান সাধনা। দৃঢ় ভাবনা ও একাগ্রতা অভ্যাস দ্বারা, এই চিত্তকে রোধ করিতে পারা যায়। চিত্তে যে বিষয়াসক্তি জন্মিয়াছে, তাহাও অভ্যাসেরই ফল। আবার সেই অভ্যাস হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলেও অভ্যাসেরই আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে।

অভ্যাস বলিতে যাহা তাহা অভ্যাসই চিত্তরোধের অনুকূল

নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সাধন বড় একটা অভ্যাস করিতে কাহাকেও হয় না, তাহা প্রায় আপনা-পনিই হয়। কারণ ইন্দ্রিয় সকলের বহির্মুখ হইবার ও বিষয়াদির সহিত সংযুক্ত হইবার একটি স্বাভাবিক গতি বা প্রবণতা আছে। আবার বিষয় সকলেরও ইন্দ্রিয় নিচয়কে আকর্ষণ করিবার একটি বিশেষ সামর্থ আছে। সুতরাং দুর্গ রক্ষা করিতে হইলে দুর্গের সমস্ত ছিদ্র ও দুর্ব্বলস্থান সমূহকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেমন দুর্গকে অছিদ্র ও শক্ত সম্পন্ন করিয়া রাখিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেনাগুলিকেও সুশিক্ষিত করিয়া রাখিতে হয়, নচেৎ কিছুতেই দুর্গকে শত্রুকবল হইতে রক্ষা করা যায় না—তদ্রূপ বিষয়গুলির যে স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে এবং ইন্দ্রিয় সকলেরও বিষয়ের প্রতি যে আত্যন্তিক লোলুপতা আছে—এই উভয়কেই বিমুখ করিয়া রাখিবার যে পন্থা তাহাই আমাদিগকে অবলম্বন করিতে হইবে। প্রথমটির জন্য যোগাভ্যাস, উপাসনা, দ্বিতীয়টির জন্য বিচার ও সৎসঙ্গ অবলম্বন করিতে হইবে। নচেৎ বহিঃশত্রু ও যাহারা আমাদিগকে বিপথে চালিত করিবার জন্য পথের মাঝে থানা পাতিয়া বসিয়া আছে, তাহাদিগকে ঠেকাইয়া রাখা সহজ কথা হইবে না। যে শত্রুগুলির সঙ্গে আমাদের বিরোধ করিতে হইবে, তাহাদের বলাবল, শক্তি সামর্থ্য এবং ছিদ্রগুলির সম্বন্ধে বেশ অপ্রমত্ত ভাবে, সন্ধান করা আবশ্যক। পূজ্যপাদ বশিষ্ঠদেব এতৎ সম্বন্ধে যাহা উপদেশ করিয়াছেন তাহা এখানে বলিতেছি।

কি কি অভ্যাস চিত্ত রোধের অনুকূল?

"বশিষ্ঠ কহিলেন, মন যে যে বিষয়ে ধাবমান হয়, সেই সেই বিষয়ের চিন্তা ত্যাগ করিলেই মনের ক্ষয় হইয়া থাকে। কল্পনাই মনের প্রাণ। সেই কল্পনা রোধ হইলে, মনের রোধ হইবে সন্দেহ নাই। বিদ্যা বলে বিবেক জন্মে, বিবেক বলে বৈরাগ্য জন্মে, এবং বৈরাগ্য বলে চিত্তের স্বচ্ছতা সম্পন্ন হইয়া থাকে। তখন সংসার হেয়, ও মোক্ষই উপাদেয়, এই প্রকার বিচার প্রাদুর্ভূত হইলে, চিত্ত-বিকাশিনী সপ্তবিধ যোগভূমি আবির্ভূত হইয়া পরম পুরুষার্থ সাধন করে।"

কল্পনাই মনের অধিষ্ঠান।

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমাসমুদাহৃতা।
বিচারণা দ্বিতীয়াস্যাতৃতীয়া তনুমানসা॥
সত্তাপত্তি চতুর্থীস্ততোহসং সক্তিনামিক।
পদার্থভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্যাগাগতিঃ॥

সপ্তবিধ যোগভূমি যোগবাশিষ্ঠ।

প্রথম ভূমি হইল "শুভেচ্ছা" বা শুভ বাসনা, দ্বিতীয় ভূমি হইল: "বিচার" তদ্দ্বারা কি হেয় কি উপাদেয় বুঝিয়া লওয়া। তৃতীয়-ভূমি হইল "তনুমনসা"—মনের ক্ষীণতা অর্থাৎ সঙ্কল্প বিকল্প হ্রাস হইতে থাকা। চতুর্থ ভূমি হইল "সত্তাপত্তি" অর্থাৎ প্রলোভনের বিষয়ে বিরক্তি বশতঃ যে সময় ব্রহ্মেতে মনঃ স্থির হয়। পঞ্চমভূমি "সংসক্তি" অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত অন্য কিছু চিন্তা করিতে না পারা। ষষ্ঠভূমি হইল "পদার্থভাবনী" ব্রহ্মতে নিবৃত্তি লাভ (মোক্ষ শান্তি সুখ) তখন ভিতরের ও বাহিরের পদার্থের চিন্তা দূর হইয়া যায়। এই সমস্ত চিন্তা দূর হইয়া গেলে যত্নপূর্ব্বক যে

প্রকৃত আত্মতত্ত্বের চিন্তা হয় তাহাই পদার্থ ভাবনী। সপ্তমভূমি —তূরীয় অথাৎ মুক্তি।

ইহার কারণ কি?

সংকল্প সংশয়বশাদ্‌গলিতেতু চিত্তে।
সংসাব মোহমিহিকা গলিতা ভবন্তি॥
দৃষ্টাং বিভাতি শরদীব খমাগতায়ং।
চিন্মাত্রমেক মজমস্তমনন্ত মণ্ডঃ॥ যোঃ বাঃ।

জ্ঞানযোগের কথা বলিবার সময় এ বিষয় আরও বিস্তৃত করিয়া বলিব।

ভগবাদুপাসনা।

"আলোচ্য সর্ব্বশাস্ত্রানি বিচার্য্যৈবং পুনঃ পুনঃ।
ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা॥"

সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা ও পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া সাধুরা ইহাই স্থির করিয়াছেন যে নারায়ণকেই সর্ব্বদা ধ্যান করিতে হইবে। তাঁহারই পাদপদ্মে মনকে নিবিড় ভাবে লাগাইয়া রাখিতে হইবে। যেমন তাঁহাকে স্মরণ করিতে করিতে, মন নিষ্পন্দিত হইয়া যাইতে পারে। বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর, কামিনীর প্রতি কামুকের যেমন টান বা আকর্ষণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আকর্ষণ তাঁহাতে হওয়া চাই। 'যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী'। ঠিক এই রকমটি হওয়া চাই। কিন্তু এতো "হউক" বলিলেই আর হইবে না—সেই জন্যই তপস্যা বা উপসনা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। প্রথমে দেখা যাক্ কেন ভগবানের প্রতি

আমাদের আকর্ষণ হয় না? তাঁহার প্রতি আকর্ষণ আসে না, এইজন্য যে চিত্ত অন্যের প্রতি আকৃষ্ট বলিয়া। সেই যে অন্যের প্রতি আকর্ষণ—পরের প্রতি প্রেম—ইহাতেই মনের পাতিব্রত্য ধর্ম্ম ক্ষুন্ন করিয়াছে। পুনশ্চ ইহাকে শোধন করিয়া লইতে হইবে; দুঃখ দাবাগ্নির মধ্যে দগ্ধ করিয়া বিশুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। যে স্ত্রীর পরপুরুষের প্রতি আকর্ষণ আছে তাহার নিজ পতির প্রতি আকর্ষণ অধিক থাকে না—স্তরাং যিনি আমার যথার্থ হৃদয়রাজ্যের রাজা—তাঁহার প্রতি আর আমার স্বাভাবিক টান থাকিতে পারে না—কারণ বিষয়রূপ পতিকেই এখন আমার মন বরণ করিয়াছে।

সাধনার প্রথম সোপান।

বিষয় হইতে বিমুখ করিতে হইলে বিষয়ের প্রতি যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তাহা হইতে মনকে সরাইয়া আমার চেষ্টাই হইবে সাধনার প্রথম সোপান। প্রথমে মৃদুভাবে, তারপর খুব সজোরে তাহাকে টানিতে হইবে। ইহারই জন্য একাগ্রতা অভ্যাসের প্রয়োজন। এজন্য কি করা কর্ত্তব্য তাহাই এখানে একটু বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করিব। শাস্ত্রালোচনা, সাধুসঙ্গ ও বিবেক বিচারই মানুষের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করে। যতদিন জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হয়, যতদিন বুদ্ধির জড়তা না ঘোচে, ততদিন শুভ-লাভেচ্ছুব্যক্তিগণ, শুভকর্ম্ম দ্বারা সুকৃতি সঞ্চয়ে চেষ্টিত থাকিবেন। প্রতিদিন ভগবদ্‌পূজোপাসনা, তন্নামকীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন ও আত্মনিবেদনাদি নিয়মনিচয় অনুসরণ করিতে করিতে চিত্তে অনুরাগের সঞ্চার হয়; প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সন্ধ্যা

উপাসনার প্রয়োজনীয়তা।

পূজাদি মনঃসংযোগ করিয়া করিলেই, বুদ্ধির জড়তা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসে এবং চিত্ত নির্ম্মল হয়। বিষয়-বাসনা বর্জ্জিত নির্ম্মল-চিত্তেই ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারে। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত, চঞ্চল চিত্তে, ভগবানের সচ্চিদানন্দস্বরূপ ফুটিয়া উঠিতে পারে না—সেই জন্য স্থিরচিত্ত হইবার বিশেষ অনুকূল সাধনাদি অভ্যাস করা প্রয়োজন।

উপাসনার ফল।

উপাসনার ফলে চিত্তে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব হয়। সেই সত্ত্বগুণের উজ্জ্বল নির্ম্মলালোকে অবিদ্যায় অনুজ্জ্বল যবনিকা অপসারিত হইয়া যায়—আত্মার স্বরূপ প্রকটিত হয়। যদিও ভগবান জীব মাত্রেরই অন্তরের অন্তর-তম হইয়া রহিয়াছেন, স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপে এই লোক চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, তথাপি এমনি অচিন্তনীয় মায়ার প্রভাব—যিনি আমাদের অতি নিকটে, যিনি আমাদের সকলের চেয়ে আপনার—তাঁহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা আমরা অধিক বিস্মৃত হইয়া আছি। শুধু তাঁহাকে বিস্মৃত হই নাই, পরমশত্রুকে পরম মিত্র বলিয়া বুঝিয়া রাখিয়াছি। এই কপট মিত্রের কুহক জালে আমরা এতটাই আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, যে যখন সেই চির সুহৃদ, আমাদিগকে তাঁহার দিকে আহ্বান করেন, তখন আমরা তাঁহার কথা গ্রাহ্য ও করি না। তখন আমাদের এতটাই বুদ্ধিবিভ্রম উপস্থিত হয়, যে আমরা যথার্থ মায়াজালে আবদ্ধ হইয়াছি কি না সে বিষয়েও সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুতরাং তখন আমাদের প্রকৃত অবস্থা যে কি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হয়।

পরীক্ষা করিয়া দেখিতে গিয়াই কিন্তু কপট মিত্রের কপটতা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু তাহাদের হাব ভাবে তখন এতই বিবশ বিমুগ্ধ যে পুরোভাগে ব্যাধের বিস্তৃত বাগুড়ার পানে আমাদের লক্ষ্যই পড়ে না, সুতরাং তখনি তখনি তাহাদের সঙ্গত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিবার আবশ্যকতাও অনুভব করিতে পারি না। নিজের এই অবস্থাটি বুঝিয়া তাহার প্রতিকারের জন্যই উপাসনার প্রয়োজন হয়। যেমন নেশার ঘোর কাটাইতে হইলে তৎপ্রতিষেধক কোন পদার্থ সেবন করিতে হয়, নচেৎ ঘোর কাটে না, তদ্রূপ এই কাম মোহাদির চপলপ্রণয়-বিভ্রান্ত চিত্তকে উপাসনা ব্যতীত প্রকৃতিস্থ করিয়া আনা সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা যাঁহারা স্বীকার করেন না, তাঁহাদের জন্য দুঃখিত হওয়া ভিন্ন আর কি উপায় আছে? তাঁহাদের যুক্তি এই যে যদি ভগবান নিকটেই আছেন, তবে আমাদের বিপদই বা কেন হয় এবং তাঁহাকে উপাসনা করিয়া আহ্বান করিবারই বা কি প্রয়োজন? কেহ কেহ এরূপ তর্কও করেন যে শাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম, নিত্য-সাধন-প্রণালী, পূজা, জপ, হোমাদিতে সময় নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন। তাহা না করিয়া দু এক মিনিট চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিলেই সাধন সম্পূর্ণ হইতে পারে, তজ্জন্য কোন কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, কোন গুরু কাড়িবারও দরকার নাই। কিন্তু যাঁহারা ভগবানকে হৃদয়ের সহিত চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে পাইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছেন :—"কবীর হাঁসি খেলে যব্ পিয়া মিলে তো কোন্ দুহাগিনী হোয়।" আমাদের শাস্ত্র বলেন :—

গবাং সর্পি শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গ পোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥"
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিবৎপরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃপ॥"

"ঘৃত দুগ্ধের মধ্যে থাকিয়া গাভীর দেহেই বর্ত্তমান থাকে, তথাপি তাহাতে তাহাদের শরীর পুষ্ট হয় না; কিন্তু ঐ দুগ্ধই যখন তাহাদের শরীর হইতে নিঃসৃত হইয়া পরে উপায় বিশেষ দ্বারা ঘৃতাকারে পরিণত হয়, তখন তাহাই আবার গাভীর ঔষধরূপেও উপকার করিয়া থাকে, তদ্রূপ পরমেশ্বর সমস্ত দেহীর দেহে বিদ্যমান থাকিলেও উপাসনারূপ উপায় ব্যতিরেকে মনুষ্যের হিতসাধন করেন না"—ইহা হইতেই উপাসনার প্রয়োজনীয়তা কত অধিক তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

এই উপাসনার প্রণালী অধিকারী ভেদে বিভিন্ন তাহা যথাকালে শ্রদ্ধালু শিষ্য গুরু প্রমুখাৎ অবগত হইবেন। আমরা যথাসাধ্য এখানে এবং পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে এ বিষয় বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

সাধনায় নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা

যিনি সাধক হইবেন, সাধনার প্রতি তাঁহার যথেষ্ট শ্রদ্ধা থাকা কর্ত্তব্য এবং তাঁহার বিশ্বাস থাকা উচিৎ যে সাধনায় সফলতা লাভ হইবেই হইবে। এ বিশ্বাস যাঁহার না থাকে তাঁহার সাধনায় দৃঢ়তা আসিতে পারে না এবং তিনি অগ্রসর হইতেও পারেন না; পদে পদে কারণে ও অকারণে তাঁহার পদস্খলন ঘটে। অবিশ্বাসীর

চিত্ত প্রত্যেক ঘটনাতেই বিচলিত হইয়া উঠে, সামান্য বিপদপাতেই সে দিশাহারা হইয়া যায়। তাহার সাধনা করিয়া শান্তিলাভ হয় না। কৃপণ সঞ্চয় করিতে পারে, কিন্তু দান দান করার যে সুমহৎ আত্মপ্রসাদ—যাহা সঞ্চয় অপেক্ষা বড়—তাহা সে উপলব্ধি করিতে পারে না। দানশীল সদাশয় পুরুষ সর্ব্বস্বদান করিয়া রিক্তহস্তে যে আত্মপ্রসাদ ভোগ করেন, সে আত্ম-প্রসাদের মূল্য কত তাহা কৃপণ যেমন বুঝিতে পারে না, তদ্রূপ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ সাধনার জন্য বিরাট ত্যাগে যে কি মহৎ লাভ, তাহা ধারণা করিতেই পারে না। কাজে কাজেই সে যখন তখন সুখ দুঃখের হিসাব করিয়া বেড়ায় এবং সাধনার সফলতাকে একটা পার্থিব বস্তু প্রাপ্তির মত মনে করিয়া আধ্যাত্মিকতাকে বৈষয়িকতায় দাঁড় করাইয়া বসে! এই জন্য বলিতেছি যিনি সাধক হইবেন তাঁহাকে 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা' হইয়া সাধন করিতে হইবে। সহস্র জনমের জড়তা অন্ধতা, অধৈর্য্য অতৃপ্তি ও অশান্তির নিবিড় পঙ্ক হইতে আত্মাকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহের বিপুল উত্তেজনা ও নিরন্তর সংক্ষোভের মধ্যে আত্মসম্বরণ করিতে হইবে, অত্যন্ত ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে, এখনই কিছু হইল না বলিয়া হতাশে হাল ছাড়িয়া রণে ভঙ্গ দিলে চলিবে না। বালককে ঘুম পাড়াইয়া মাতা যেমন সংসারের কাজ সারিয়া লন তদ্রূপ অবোধ অশান্ত চিত্তবৃত্তি গুলিকে ঘুম পাড়াইয়া

সাধনার লাভ বিষয় লাভের মত লাভ নহে। উহা ত্যাগ দ্বারাই লভ্য।

পরম সত্য পদার্থের অন্বেষণ করিতে হইবে। এমন দুই এক দিন নয়, কত দিন ধরিয়া অবিচলিত ভাবে ঈশ্বরার্পিত-চিত্ত হইয়া এ পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন, যাহারা তৎপর, সংযতেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবান তাহারাই জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়। ইহা কখনই লঘু বিষয় হইতে পারে না। এই সাধনার পন্থা বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। ইচ্ছা করিলেই যে নির্ব্বিবাদে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিতে পারিব—সে ভরসা নাই। কারণ জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার পথ আগুলিয়া বসিয়া আছে। যে এই পথে চলিবে—তাহাকে কতবার উঠিতে পড়িতে হইবে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। কোন গিরি বা পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিবার সময় বড়ই ক্লেশ বোধ হয়, কিন্তু নামিয়া আসিবার সময় কোন ক্লেশ বোধ হয় না—তদ্রূপ জীবনে আমরা যেটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি করিয়া থাকি তাহার জন্য যে বিপুল আয়াসের প্রয়োজন হয়, তাহার তুলনায় প্রবৃত্তির স্রোতে গা ভাসান দেওয়া অনেক সোজা। এ পথ সহজ বলিয়াই এ পথে যাত্রীর সংখ্যা এত অগণ্য।

সত্যকে যাহারা সত্যরূপে পাইতে চায় এবং সত্যকে লাভ করাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় লাভ বলিয়া মনে করে, তাহারা সত্যের জন্য কোন কষ্টকেই কষ্ট বলিয়া মনে করে না, কোন পথকেই দুর্গম বা কোন লক্ষ্যকেই দুরধিগম্য বলিয়া মনে করেনা—তাই সেই সকল সত্যনিষ্ঠ প্রেমিক ব্যক্তিগণ দিনের পর দিন, রাত্রির পর

অটল নিষ্ঠা দ্বারাই সত্যলাভ হয়।

রাত্রি, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর—বিপুল সাধনায় ব্যাপৃত থাকেন অথচ লক্ষ্যলাভ লইল না বলিয়া হতাশায় বসিয়া পড়েন না। সাধনার কোন কঠোরতাই তাঁহাদের চিত্তকে ক্লান্ত করিয়া তুলিতে পারে না। সাধন পথে চিত্তের এই অবস্থা সাধকের প্রধান সহায়। ইহা না থাকিলে অগ্রসর হওয়া সুদুষ্কর। তার পর ধ্যাননিষ্ঠা। প্রতিদিন এই অশান্ত চিত্তকে শান্ত করিয়া আনিতে হইবে। ধীরে ধীরে ইহার চপলতার বেগকে হ্রাস করিয়া আনিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে বহুদিকে, বহুবিষয়ে ছড়ানো মনকে গুটাইয়া আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এজন্য বহুদিন, বহু সময় লাগিবে, বহু ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইবে। বহুধা বিক্ষিপ্ত-চিত্তকে একস্থানে ও একত্রে আনয়ন করা এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার—অথচ তা না করিলেও উপায় নাই! ইন্দ্রিয় এবং ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি মন স্বভাবতঃই ধাবিত হয়, মনের চঞ্চলতার জন্যই ইন্দ্রিয় নিচয় চঞ্চল ও বিষয় লোলুপ হইয়া উঠে! মনকে থামাইলে ইন্দ্রিয়রা বিষয় গ্রহণে ক্ষান্ত হয়, আবার ইন্দ্রিয়রা বিষয় গ্রহণে ক্ষান্ত হইলে মন চাঞ্চল্য পরিহার করে। শরীরের পীড়ায় মন পীড়িত হয়, মনের পীড়ায় শরীর ক্লিষ্ট ও অবসন্ন হয়। এইরূপে মনে, প্রাণে, শরীরে, অঙ্গাঙ্গী ভাবে মিলিয়া আছে। সেই জন্য মন প্রাণ ও শরীর এই তিনের ক্ষোভ একসঙ্গে নাশ করিবার সাধনাই হইব প্রকৃত সাধনা। ইহার জন্য চিত্ত শাসন চাই। বিখ্যাত বাগ্মী ৺আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন বলিয়াছেন উপাসনায় "একইরূপ মন

ধ্যান নিষ্ঠা বা চিত্তশাসন।

থাকিবে, শরীর একাবস্থায় থাকিবে এরূপ সাধনা চাই। সমাহিত মন, সমচিত্ত, পরম সম্পত্তি, উহা উপার্জ্জন করা সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সমচিত্ত না হইলে না উপাসনা হয়, না সংসার হয়।" সুতরাং একাগ্রতা অভ্যাস করিতে হইলে বা চিত্তকে ধ্যাননিষ্ঠ করিতে গেলেই আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের সোপান শ্রেণী বাহিয়া চলিতেই হইবে। এই জন্য যাজ্ঞবল্ক্য, পতঞ্জলি প্রমুখ ঋষিগণ ইহার এত সমাদর করিয়াছেন। যথাস্থানে এ সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। মনকে একাগ্র করিবার উপায়, ইতস্ততঃ প্রধাবিত চিত্তকে একটি লক্ষ্যে স্থির করিয়া রাখা। অল্পে অল্পে নিরন্তর অভ্যাসের ফলে, সেই লক্ষ্যেই মন বসিয়া যাইবে। তখন আর তাহার অধিক ঘুরিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি থাকিবে না। সেই লক্ষ্যমুখে চলা বা লক্ষ্য স্থির করার নামই **উপাসনা**। অনেকে মনকে ঠিক বাঁধিতে পারেন না, এইজন্য ইহাকে বাঁধিয়া ফেলিবার উপায় প্রথমেই অন্বেষণ করিতে হইবে। আমাদের প্রাণ যাহাকে চায়, তাহার জন্য প্রাণ সেখানে পড়ে থাকে। এইজন্য একটি প্রাণ বাঁধার সামগ্রী চাই, তাহা গুরু, দেবতা, আত্মা যে কোন একটিতে লাগাইতে পারিলেই কৃতার্থ হওয়া যায়। জনসাধারণের হিতের জন্যই ঋষিরা মূর্ত্তিপূজা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অনেকে ইহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, কিন্তু যাঁহারা বাক্যের পণ্ডিত নহেন, পরন্তু কাজের লোক তাঁহারা ইহার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করিয়াছেন। আসলে

মূর্ত্তিপূজা

একটা কাঠের বা পাথরের বা ধাতুর স্থূলমূর্ত্তি

বিশেষকে পূজা করাই উদ্দেশ্য নয়, ইহা সকলেই চিন্তা করিলে বুঝিতে পারেন। ইহাতেও সেই পরম পরাৎপর হৃদয়নাথকে দেখিবার চেষ্টাই লক্ষিত হয়। তবে সাধারণ মানুষ যা সম্মুখে বেশী দেখে, তাহার অতিরিক্ত কিছু ধ্যান করিতে তাহার অসুবিধা হয়। এমন কি নিরাকার উপাসনা করিতে গিয়াও কল্পনায় ঠাকুর আঁকিয়া লইতে হয়। আমাদের স্থূলেতে চিত্ত এত মগ্ন,—যে তাহার অতিরিক্ত কিছু ভাবিতে গেলে চিত্ত হাঁপাইয়া উঠে।

স্থূল ইন্দ্রিয়গুলিই তো আমাদের যাবতীয় জ্ঞানের দ্বার। কিন্তু এই দ্বারগুলি হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহা সূক্ষ্ম জ্ঞান নহে তাহা অনেকটা স্থূল ভাবাপন্ন। মনে কর চক্ষুতে রূপ জ্ঞান হয়, কিন্তু রূপ তো স্বয়ং ফুটিয়া উঠেনা, কিছুকে অবলম্বন করিয়াই ফুটে, আমাদের স্থূল দৃষ্টির নিকট রূপ যাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইতেছে, সেই স্থূল আশ্রয়টিকেও রূপের সহিত এক করিয়া দেখার অভ্যাস গভীর ভাবে হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে। সুতরাং রূপ দেখিব বলিলেই একটি আধারকে আগে লইতেই হয়। অবলম্বন শূন্য বিশিষ্ট জ্ঞান ফুটিতেই পারে না। যখন চক্ষুর ও মনের রূপ দেখিবার লালসা আছে—অথচ বাহ্য রূপে মুগ্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মন আরও বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়ে—তাই তাহাকে শাস্ত্র বলিয়া দিলেন যদি অরূপকে ধারণা করিতে না পার, বা এরূপ অবস্থায় তাঁহাকে ভালবাসিতে না পার, তবে অরূপের রূপ কল্পনা করিয়া লও। সেই কল্পিত রূপেও যদি ঈশ্বরবুদ্ধি থাকে,তবে তাহাও বিমুক্তির কারণ হইবে। আর দৃষ্টি ইচ্ছা হইতেই রূপের উৎপত্তি,

এবং এ ইচ্ছা অনাদিকাল হইতেই আছে। তাই দেবতাদিগের বিশিষ্ট রূপগুলিও চিরকাল ব্যক্ত অব্যক্তের মাঝামাঝি থাকিয়া সাধকদিগের আনন্দ ও উৎসাহের সহায়তা করিতেছে। রূপকে একবারে অস্বীকার করিতে পারি না বলিয়াই অরূপের মধ্যে রূপ খুঁজিয়া বেড়াই। ইহাই আমাদের চিত্তের চিরন্তন স্বভাব। প্রতিমাতে আমাদের রূপ লালসা চরিতার্থ হয়, সেই জন্যই আমরা দেবতা প্রতিমা গড়ি ও দেবমূর্ত্তিতে আমাদের মত ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কল্পনা করিয়া থাকি। প্রিয়জনকে বা ভক্তির পাত্রকে স্পর্শ করিতে ও তাঁহার চরণ দুটিতে মস্তক ঠেকাইতে ইচ্ছা করে। তাঁহার চরণ রজঃ দ্বারা নিজ শরীরকে পবিত্র করিতে ইচ্ছা হয়, কখন কখন তাঁর পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু যদি তাঁর পা ই না থাকে তবে মানুষের এ অন্তরের আশা মিটিবে কিরূপে? তাই তাঁর পাদপদ্ম কল্পনা করিতে হয়, এবং তিনি যখন সর্ব্বব্যাপী ও ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু, তখন ভক্তের কল্পিত মূর্ত্তিতে তাঁহার প্রকাশ কিছুমাত্র অসম্ভবও নয়, অযৌক্তিকও নয়। সামনে মানুষের মত কিছু না দেখিলে যে তাঁহাকে কোন কথা বলিয়া সুখ হয় না। আমি কথা বলিব তিনি শুনিবেন ও উত্তর দিবেন এ যে আমাদের প্রাণের গভীর আকাঙ্ক্ষা। তাহা মিটাইতে হইলে যে তাঁহাকে রূপ গ্রহণ করিতেই হইবে। এইজন্য সব্বদেশে ও সর্ব্বকালে দেবতাদিগকে মানুষের মত চক্ষু কর্ণ পদাদি দ্বারা যুক্ত করিয়া দেখাইবার রীতি সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ আছে। সমাধি সাগরে একবার ডুবিয়া যাইতে

না পারিলে বুঝি এ রূপ-তৃষা কিছুতেই মিটে না। তাই নির্ব্বিকল্প অবস্থা লাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সকলেই এই অরূপের রূপকে কল্পনা করেন। অনেক উচ্চ শ্রেণীর ভক্ত জ্ঞানীও তাঁহাকে নিষ্কল, নির্ম্মল, মন বাক্যের অগোচর জানিয়াও তাঁহার কমনীয় রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাতে মন প্রাণ অর্পণ করিয়া অপার আনন্দ সাগরে মগ্ন হন। প্রেমিক কবি বলিয়াছেন

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

সমস্ত বিশ্ব ভুবন এত যে সুন্দর, সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে এত যে রূপরাশি ফুটিয়া উঠিতেছে, আর এই সমস্ত রূপের যিনি প্রকাশক বা স্রষ্টা তাঁহার রূপ নাই, এইকি কখন সম্ভব হয়? তাই ভক্ত প্রেমিক—ভক্তি তুলিকায় প্রেমময়ের কত রূপ, কত অঙ্গসৌষ্ঠব, কত ভঙ্গিমাই কল্পনার চক্ষে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন! বর্ত্তমান যুগের জগৎ প্রসিদ্ধ কবিও গাহিয়াছেন "মম হৃদয় রক্ত রঞ্জনে, তব চরণ দিয়াছি রাঙিয়া"—এই যে চরণ কল্পনা মানুষ না করিয়া থাকিতে পারে না। মাথা যে তার চরণ-পদ্মে ঠেকাইতে চাই, সুতরাং চরণ কল্পনা না করিলে তাহা স্পর্শ করিব কিরূপে? এইরূপ যাহাকে ভালবাসি, তাঁহাকে আদর করিয়া কত কি খাওয়াইতে ইচ্ছা হয়, যদি তাঁর মুখ-না থাকে তবে এ বাসনা চরিতার্থ হইবার উপায় কোথায়? ইহাকে বাল-চেষ্টা বলিতে হয় বলুন কিন্তু এ বালভাবেও কত যে নিরুপম আনন্দ আছে, তাহা ধারণা করা আমাদের পক্ষে কঠিন। অবশ্য

শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরা এসব কল্পিত মূর্ত্তির অপেক্ষা রাখেন না, তাঁহাদের ধ্যান নিমগ্ন চিত্ত অসীমের ধ্যানে বিভোর, তাঁহাদের কোন জাগতিক বস্তু দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবার প্রয়াস থাকে না, তাঁহারা দেহ, মন, প্রাণ, সব তাঁহাতে অর্পণ করিয়া পরমনিশ্চিন্ত হইয়া যান। তাঁহারা বিশ্বমানবের মধ্যে এক অখণ্ড ভাবকে উপলব্ধি করিয়া প্রতি জীবের আহার, বিহার ও তৃপ্তিতে তাঁহারই তৃপ্তি দেখিয়া পরম পুলকিত হ'ন।

তাঁহার স্থূল মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াও যে তাঁহার পূজা চলে এবং তাহাতে যে কোন দোষ স্পর্শে না ইহা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা ভক্তের হৃদয় মন্দিরের বাহিরেও সুরম্য দেউলের মধ্যে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে কোন সঙ্কোচ অনুভব করেন নাই। কারণ "যে তিনি অন্তরে, সেই তিনি বাহিরে"। তাঁহার তো অন্তর বাহির নাই, আমরাই অজ্ঞান হেতু ভিতর বাহির কল্পনা করি। ভগবান ভক্তের চিরদিনের হৃদয়ের আশা গুলিকে এইরূপেই পূর্ণ করেন। এ বিশ্বরূপ তো তাঁহারই, তবে আর তাঁর রূপের কমীই বা কি? যখন তাঁর পাদপদ্ম মনে মনে কল্পনা করিতেই হয়, তখন, স্থূল-ধীদের জন্য তাঁর স্থূলরূপ গড়িয়া তাদের চোখের তৃষ্ণা মিটাইলে ক্ষতি কি? পুত্রকে কেবল পুত্র বোধ হইলে সে স্নেহেতে মোহ আসে, কিন্তু পরমাত্মাকে পুত্র রূপে কল্পনা করিতে গিয়া— বাৎসল্য রসের কমী হয় না, কিন্তু তাহাতে মোহ থাকে না। কারণ এ পুত্র যে আমার অজর অমর অবিনাশী। অথচ এই

ভাবের দ্বারে মিলন বিয়োগ সব রসেরই অজস্র ক্রীড়া চলিতে থাকে, তাহাতে মন পরমানন্দে মগ্ন হয় অথচ মোহ বদ্ধ হয় না।

প্রতিদিন প্রিয় গুরুজনের চরণ বন্দন করিতে গিয়াও আমরা যে প্রভূত আনন্দ পাই তাহাও প্রকৃত সেই স্থূলমূর্ত্তী হইতে নহে। তাঁহাদের চক্ষু, কর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির ভিতর দিয়া যিনি প্রকাশ পাইতেছেন, প্রকৃতপক্ষে আমরা তাঁহাকে দেখিয়াই সুখী হই। কিন্তু এই রূপ যাঁহার, সেই রূপবানকে তাঁহার রূপ হইতে পৃথক করিয়া ভাবিবার অভ্যাস নাই বলিয়া, স্থূল দেহের সহিত মিলিত করিয়া প্রিয়জনকে দেখিয়া থাকি। অবশ্য দেহের মধ্যে চেতনা আছে বলিয়াই প্রকৃত আনন্দ সমুদ্ভূত হয়। এই খানেই বিচারের অভাবে দেহীর সহিত দেহকে গুলাইয়া ফেলি। পূর্ব্বে বলিয়াছি আমরা স্থূল রূপ দেখায় এত অভ্যস্ত হইয়া আছি, যে মূর্ত্তীকে ত্যাগ করিয়া অমূর্ত্তকে চিন্তা করিতে গিয়া হতাশ হইয়া পড়ি। মনে হয় ইহাকে আত্ম নিবেদন করিলে বুঝি উনি জানিতে পারিবেন না, মনে হয় বাক্যদ্বারা কথা না কহিলে আমি শুনিতে পাইব না। এই গুলিই বুদ্ধির উপর সংস্কারের লেপ। ইহাই মূঢ়তা। যিনি আছেন বলিয়া কর্ণ শুনিতে পায়, চক্ষু দেখিতে পায়, মন মনন করিতে পারে, তিনি কেন আমার কথা শুনিতে পাইবেন না, এবং তিনি যাহা বলিবেন তাহাই বা আমি কেন না জানিতে পারিব? যাই হ'ক সেই পরম পদার্থের ইহাও রূপ, এরূপ ধারণা অবিচল থাকিলে স্থূল মূর্ত্তি ধ্যানেও দোষ হয় না— ইহাই আমার বলিবার উদ্দেশ্য। ধ্যেয় বস্তু যাহাই হউক,

চিত্তের তাহাতে ঈশ্বর বুদ্ধি থাকিলে এবং লক্ষ্যৈক বস্তুর প্রতি চিত্তের একতানতা ভাব বর্ত্তমান থাকিলে কিছুই দোষের হইবেনা। বরং এরূপ একটি মূর্ত্তি বিশেষে শ্রদ্ধা স্থাপিত হইলে তাহাতে প্রেম ও আসক্তি বশতঃ ধ্যান নিষ্ঠার উদয় হয়। তাহাতেও মন স্থির হয়। কারণ একটি বস্তুতে চিত্তের সমাধান হইলে চিত্তের অস্তিত্ব আর তখন থাকে না। এবং চিত্ত না থাকিলে চিদ্‌বস্তু ব্যতীত তখন আর কোন চিদবর্জ্জিত স্বতন্ত্র পদার্থের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? সুতরাং চিত্তই তখন নির্ম্মল ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া ব্রহ্মই হইয়া যায়। সেই জন্য মনুষ্য, মনুষ্যের শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থান, বৃক্ষ, প্রস্তর যে কোন একটি চিহ্ন লইয়া ধ্যান করিলেও দোষের হয় না। শাস্ত্রেও গুরুমূর্ত্তি প্রভৃতিতে ধ্যান করিবার সেই জন্যই বিধান আছে। যোগ-দর্শনেও সমুচিত ভাবে ইহার প্রয়োজনীয়তা সমীক্ষিত হইয়াছে।

এই মূর্ত্তি ধ্যানের কথা আমাদের শাস্ত্রে অনেক স্থলে বিশদ ভাবে উল্লিখিত আছে। আমাদের দেশের গুরুরাও শিষ্যের নিকট দীক্ষার সময় এইরূপ কোন একটি মূর্ত্তির ধ্যান, পূজা, জপের ব্যবস্থা করেন; উদ্দেশ্য—এই স্থূল ভাব হইতেই জিজ্ঞাসু ভক্তিমান শিষ্য সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারিবেন। ইহা যেরূপ ভাবে করা উচিত তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান কপিল তাঁহার মাতা দেবহূতিকে উপদেশ দিয়াছেন, এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহাত্মা উদ্ধবকে যাহা বুঝাইয়াছিলেন, তাহাই

মূর্ত্তিধ্যান কিরূপে করিতে হয়।

পাঠক দিগকে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিতে অনুরোধ করি, আমি এখানে অতি সঙ্ক্ষেপে সেই সকল উপদেশের দুই একটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া শ্রদ্ধালু পাঠকবর্গকে উপহার দিলাম। মহর্ষি কপিল বলিতেছেন—স্বীয় শক্তি অনুসারে স্বধর্ম্মাচরণ, দৈবলব্ধ বস্তুতে সন্তুষ্ট হওয়া, আত্মজ্ঞ পুরুষের চরণসেবা, ধর্ম্ম অর্থ ও কাম হইতে নিবৃত্তি, মোক্ষধর্ম্মে অনুরাগ, পরিমিত পবিত্র ভোজন, নির্জ্জন ও নিরুপদ্রব স্থানে অবস্থান, অহিংসা, সত্য অচৌর্য্য, নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তুর অভিলাষ, ব্রহ্মচর্য্য, তপস্যা, শৌচ, পরম পুরুষের পূজা, প্রাণ বায়ুর বশীকরণ, মন দ্বারা ইন্দ্রিয় গণকে বিষয় হইতে আকর্ষণ, প্রাণের সহিত মনের স্থিরীকরণ, ভগবানের বিচিত্র লীলা কথন, এইসকল এবং অন্যান্য উপায় দ্বারা কুপথগামী দুর্দ্দম মনকে অল্পে অল্পে যোগাভ্যাসে নিযুক্ত রাখিবে। পরে আসনাভ্যাস দ্বারা আসন জয় করিয়া, প্রাণ বায়ুর শোধন করিবে। যেন প্রাণ বায়ু স্থিরভাবে অবস্থিতি করে, চঞ্চল না হয়। স্বর্ণ যেমন অগ্নি সহযোগে নির্ম্মল হয়, সেই রূপে শ্বাস জয় করিতে পারিলে শীঘ্রই মন নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইরূপে মন যখন উক্তরূপ নির্ম্মল এবং অতিশয় সুস্থির হইবে, তখন ভগবানের মূর্ত্তিধ্যান করিবে। প্রথমে একবার সমগ্রমূর্ত্তিটি মনে করিয়া, তার পর তাঁর বিশেষ বিশেষ অঙ্গে চিত্তকে নিযুক্ত করিবে। প্রথমতঃ পাদপদ্ম হইতে সমগ্র জঙ্ঘা, উরু, বসন, নিতম্ব, নাভি, উদর, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠদেশ, তদনন্তর বাহু, বাহুতে শোভিত বিবিধ ভূষণ ও অস্ত্র, পরে মুখকমল চিন্তা করিবে।

তাঁহার সহাস্য আস্যে যে তাপত্রয় নির্ম্মূল হইতেছে, তাহা ভাবনা করিবে, এবং সকরুণ দৃষ্টিপূর্ণ সুন্দর নয়ন চিন্তা করিবে। তখন কেবলমাত্র মুখ, নয়ন বা হৃদয় চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাতে ভক্তির সহিত মন সমর্পণ করিবে, অন্য কোন বস্তু দর্শন বা মনন করিবে না। এইরূপ ধ্যানে ধ্যেয়-বস্তুর প্রতি প্রেমের সঞ্চার হয়। চিত্তকে এইরূপে বিষয় শূন্য ও নিরাশ্রয় করিবার চেষ্টা হইতেই বিষয়ে বিরক্তি ঘটে, এই অবস্থায় দেহাদি বিস্মরণ হওয়ায় ধ্যানকর্ত্তা অখণ্ড পরমাত্ম স্বরূপকে দর্শন করেন। এইরূপে ভক্তসাধক সর্ব্বভূতে আত্মাকে, এবং আত্মাতে সমস্ত ভূত অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। ভগবান নারদ বাসুদেবকে শুনাইয়াছিলেন :—"হরি যাঁহার হৃদয়ে প্রেম রজ্জু দ্বারা বদ্ধ থাকেন তিনিই ভাগবতপ্রধান। মঙ্গলেচ্ছুগণ শব্দব্রহ্মের পারগত ও পরব্রহ্মে বিলীন যে শান্তিময় গুরু তাঁহাকে আশ্রয় করিবেন। গুরুকেই আত্মা ও সর্ব্বদেবতা জ্ঞান করিয়া অকাপট্য ও সেবা দ্বারা তাঁহার নিকটে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা করিবেন। প্রথমতঃ যাহা শিক্ষা করিতে হইবে তাহা এই :—সকল বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করা, যথোচিতরূপে প্রাণিগণে দয়া, মিত্রতা, বিনয়, বাহ্য ও আভ্যন্তরিক শৌচ, নিজধর্ম্মাচার, ক্ষমা, বৃথাবাক্য পরিহার, স্বাধ্যায়, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, সুখদুঃখ শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্বে সমতা, সকল পদার্থে আত্মা ও ঈশ্বর জ্ঞান, একরূপ চরিত্রতা, গৃহাদিতে নিরভিমানতা, সর্ব্বাবস্থাতে সন্তোষ, হরিগুণ গান ও শ্রবণ,

কীর্ত্তন ও ধ্যান, হরির উদ্দেশে সকল কর্ম্ম করা, দান, তপস্যা, জপ, আত্মপ্রিয় গৃহ ও প্রাণ পরমেশ্বরকে সমর্পণ ভগবদ্ভক্তগণের পূজা, পরস্পরের নিকট ভগবদ্ যশ কথন, আত্মার সুখ দুঃখ নিবৃত্তি করা এবং পরস্পরে দুরিতাপহ হরিকে স্মরণ করিয়া ও স্মরণ করাইয়া ভক্তিসাধন করিতে হইবে।

ভগবান উদ্ধবকে কহিলেন, 'শ্রদ্ধাই' ভক্তি, ভক্তিতেই আমাকে পাওয়া যায়। মদ্বিষয়াভক্তি চণ্ডালকেও পবিত্র করে। সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্ম্ম বা তপস্যাযুক্ত বিদ্যা ঈশ্বরভক্তিহীন আত্মাকে পরিশোধিত করিতে পারে না। ভক্তি ভিন্ন চিত্ত শুদ্ধ হয় না। মদীয় ভক্তিযোগে আত্মা কর্ম্মবাসনা সকল পরিত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা লাভ করে। মদীয় পুণ্যময় কথা শ্রবন ও কীর্ত্তন করিয়া আত্মা পবিত্র হয় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বস্তু সকল দর্শন করে। যিনি বিষয় সকল চিন্তা করেন, তাঁহার আত্মা বিষয়ে নিবিষ্ট হয়, যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাঁহার আত্মা আমাতেই নিবিষ্ট হয়। সুতরাং স্বপ্নতুল্য অসৎ চিন্তা সকল পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিপূর্ণ মনকে আমাতেই সমর্পণ করিবে। ধীরগণ কামিনীগণের ও কামিনী সঙ্গীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জন ও ভয়শূন্য প্রদেশে উপবেশন করতঃ নিরলস হইয়া আমাকে চিন্তা করিবেন। ধীরগণ কামিনীর সঙ্গহেতু যেরূপ কষ্ট ভোগ করেন অন্য আর কিছুতেই সেরূপ কষ্টভোগ করেন না।

মুমুক্ষুরা কিরূপে তোমার ধ্যান করে, উদ্ধবের এই প্রশ্নের

উত্তরে ভগবান কহিলেন "না উচ্চ, না নিম্ন আসনে, ঋজু শরীরে সুখে উপবেশন পূর্ব্বক হস্তদ্বয় ক্রোড়ে রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণ বায়ুর পথ শুদ্ধ করিবে; এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয় সকল হইতে আকর্ষণ করতঃ ক্রমে ক্রমে বিপর্য্যয় ক্রম অভ্যাস করিবে। পরে যাহার নাল উর্দ্ধে এবং মুখ অধোদিকে, অন্তঃস্থ সেই হৃৎপদ্মকে উর্দ্ধমুখ, প্রস্ফুটিত, অষ্টপত্র বিশিষ্ট এবং কর্ণিকা সহিত এইরূপ ভাবনা করিয়া কর্ণিকাতে পর পর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে চিন্তা করিবে, এবং সেই অগ্নির মধ্যে আমার রূপ, মনোহর অবয়ব সম্পন্ন প্রশান্ত সুন্দর মুখ, সুদীর্ঘ মনোরম চতুর্ভুজ, সুন্দর হাস্য, কর্ণে মকর কুণ্ডল, পীতবস্ত্র পরিধান, মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বনমালা বিভূষিত, শঙ্খচক্র, গদাপদ্মধারী, পদদ্বয়ে নূপুর ও কৌস্তভ, প্রভাশালী উজ্জ্বল কিরীট, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, মনোহর এবং প্রসন্নতা হেতু মুখ ও নয়ন বিকশিত, এইরূপ সর্ব্বাঙ্গে মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহা ধ্যান করিবে। ধীরগণ মনদ্বারা স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে আকর্ষণ করতঃ বুদ্ধির সাহায্যে মনকে সর্ব্বতোভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট করিবে। সর্ব্বব্যাপক চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া একদেশে স্থাপন করিবে, অন্যান্য অঙ্গ চিন্তা করিবে না। কেবলমাত্র সুন্দর হাস্য সমন্বিত মুখই চিন্তা করিবে। চিত্ত তথায় স্থান লাভ করিলে পরে তাহাকে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া সর্ব্বকারণ স্বরূপ আকাশে ধারণ করিবে। পরে তথা হইতে আকর্ষণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম স্বরূপ

আত্মাতে নিবিষ্ট করিয়া ধ্যাতা ও ধ্যেয় এই ভেদ চিন্তা করিবে না। এই প্রকারে চিত্তধারণ করিলে আত্মাতে আমাকে এবং আমাকে আত্মাতে দর্শন করিবে।

সাধন-ক্ষেত্রে নিয়মানুবর্ত্তিতার একান্ত আবশ্যকতা, ইহার ব্যতিক্রমে সফলতা লাভ হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। আহারে, বিহারে, শয়নে, ভোজনে, এমন কি সাধনার সময়, স্থানের ও আসনের পর্য্যন্ত নিয়ম রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। এক কথায় মনকে খেয়াল মত চলিতে দিলে চলিবে না। সারথী যেমন দুষ্টাশ্বকে সংযত করিয়া রাখে, তদ্রূপ মনকে সংযত করিয়া রাখিতে হইবে। অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই এ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন। এ স্থলে বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সাধক শ্রদ্ধাস্পদ ৺কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের উপদেশ উদ্ধৃত করিলাম।

নিয়মানুবর্ত্তিতা।

"সাধকের জন্য যে স্থান স্থির করা হয়, যতদূর সম্ভব সেই স্থানই অবলম্বনীয়। কতকগুলি বিষয় এমন আছে যাহার স্খলনে পবিত্রতার ব্যাঘাত হয় না কিন্তু সাধনের ব্যাঘাত হয়। স্থান সম্বন্ধে এই জন্য বলা যাইতে পারে, * * যে ঘরে উপাসনা করিবে সে ঘর এবং সেই ঘরের যেস্থানে পূজা করিয়া থাক সেই স্থান ও সেই দিক স্থির রাখিয়া প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপাসনা করা বিধেয়। * * * স্থানে ধর্ম্মবদ্ধ নহে ইহা ঠিক কথা, কিন্তু স্থান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। * * * * এরূপ সাধনে মনের

সংযম, মনের উপর কর্তৃত্ব সংস্থাপনরূপ সুফল ফলিবে। পরিবর্তনে আশু উপকার হইতে পারে বটে কিন্তু যত পরিবর্তন করিবে তার সঙ্গে সঙ্গে মনের পরিবর্তন হইবে, কিন্তু স্থির রাখিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনের দৃঢ়তা হয়। আসন সম্বন্ধেও এইরূপ। * * * * উপবেশন সম্বন্ধে শরীরের স্থিরতা আবশ্যক। সাধন আরম্ভে এ নিয়মে বিশেষ আবদ্ধ থাকা উচিত। বারংবার হস্ত চালনাদি, নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী, চক্ষুরুন্মীলন, নিমীলন, দিক্‌ পরিবর্তন অনেকে সামান্য মনে করেন, কিন্তু স্থৈর্য্যসাধনে এ সকল একান্ত পরিহার্য্য। আত্মসংযম শরীর সংযমের সঙ্গে সম্বদ্ধ। শরীর স্থির হইলে মহৎ বিষয়েও মন স্থির হয়।"

সাধনার যে প্রণালী গ্রহণ করা হইয়াছে তাহা সদা সর্ব্বদা পরিবর্তন করা অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতা। তাহা সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

সাধনার প্রণালী একরূপ থাকা আবশ্যক

একই প্রণালী মতে সাধনা করিয়া যাইতে হইবে। বহু দিন নিয়মিত ভাবে সাধন করিয়াও যদি কোন ফল না পাও তবে তাহা ছাড়িয়া দিতে পার, কিন্তু তাহাও খুব বিচার পূর্ব্বক করিবে। এ সাধনা আমার ভাল লাগিল না বলিয়া যে আমার খুসিমত ছাড়িয়া দিতে হইবে তাহা নহে। সমস্ত সাধনাই জ্ঞানলাভের অনুকূল, সুতরাং লোভাতুর চিত্তে পুনঃ পুনঃ সাধন প্রণালী পরিবর্তন করিলে চিত্তের স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা নষ্ট হয়, এবং কোন ফল লাভ হয় না। এরূপ চঞ্চল ব্যক্তি কখনই যোগবল লাভ করিতে পারে না।

সাধনার স্থান খুব বিবিক্ত হওয়া উচিত। যেখানে বিক্ষেপ ঘটিবার সম্ভাবনা অধিক তাদৃশ স্থান সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। যদিগ্র গৃহস্থ যিনি,তাঁহাকে গৃহের মধ্যেই স্থান করিয়া লইতে হইবে। তবে তাঁহার পক্ষেও এই নিয়ম থাকা আবশ্যক যে তিনি বৎসরান্তে ২।১ মাস, অন্ততঃ ১৫ দিন যেন পরিচিত গৃহ, পরিজন হইতে দূরে সরিয়া গিয়া কোন নির্জ্জন বিঘ্ন-শূন্য স্থানে গিয়া সাধনাদি করেন। মধ্যে মধ্যে এরূপ ছুটিয়া বাহির হইয়া না পড়িলে সংসারের আওতায়, চিত্তের কোমলতা ও দৃঢ়তার যে ক্ষতি হয় তাহা আর পূরণ হইতে পায় না। এজন্য নির্জ্জনবাস সাধকজীবনের পক্ষে একান্তই প্রয়োজনীয়। সাধনার জন্য যে স্থানটি নির্ণয় করিবে, তাহা যেন বন্ধুর অর্থাৎ অসমতল না হয়। "চেলাজিনকুশোত্তরম্" অর্থাৎ প্রথমে কুশাসন, তারপর মৃগচর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্র পাতিয়া সাধনাভ্যাস করিবে। নিজের পূজার আসনে যাহাকে তাহাকে বসিতে দিবে না। সাধনার স্থানে বসিয়া কোন অসৎসঙ্কল্প বা বিষয় চিন্তা করিবে না। ইহাতে স্থানের পবিত্রতার হানি হয়। সমর্থ হইলে সাধনার স্থানটি ধূপ চন্দনাদির দ্বারা সুরভিমোদিত করিয়া লইবে। অন্ততঃ সে স্থানটিতে দুর্গন্ধ না থাকে, এবং বেশ সুপরিচ্ছন্ন হয়। কুচিন্তা-উদ্দীপক কোন চিত্র বা দৃশ্যাদি না থাকে এ বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। সাধন গৃহটিতে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে এবং সূর্য্যা-

সাধনার স্থান।

লোকের অবাধ গতির ব্যাঘাত না জন্মে এইরূপ হইলেই ভাল হয়।

সূর্য্যোদয়ের আড়াই দণ্ড বা একঘণ্টা অন্ততঃ আগে উঠিয়া শৌচাদি সমাপনান্তে, রাত্রিবাস ত্যাগ করিয়া, অসুবিধা না হইলে তখনি তখনি স্নান করিয়া সন্ধ্যোপাসনা জন্য সংযতবাক হইয়া আসনোপরি উপবেশন করিবে। সূর্য্যোদয়ের পরও আড়াই দণ্ড কাল পর্য্যন্ত—প্রাণায়াম, জপাদি সাধন করিবে। যিনি অসমর্থ হইবেন তিনি অন্ততঃ সূর্য্যোদয়ের একদণ্ড আগে আসনে বসিবেন ও সূর্য্যোদয়ের পরও একদণ্ড কাল জপাদি সাধনা করিবেন। মধ্যাহ্ন ও সায়াংকালেও এইরূপ। মধ্যাহ্ন কালের বিশেষত্ব এই যে সে সময় সন্ধ্যাদি সমাপনান্তে তর্পণাদি করা আবশ্যক।

সাধনার সময়।

যিনি যত অধিক ইহাতে সময় দিবেন এবং মনঃ সংযোগ পূর্ব্বক শ্রদ্ধালুচিত্তে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন, তিনি তত শীঘ্র সাধনসম্ভূত শান্তি লাভে সমর্থ হইবেন। সাধনায় প্রযত্নের অভাব, শৈথিল্য বা আলস্য সাধনসিদ্ধির সমূহ বিঘ্নকর। সাধনায় তীব্র বেগ থাকিলে তবে সাধকের সিদ্ধিলাভ সুকর হয়। প্রথমশ্রেণীর সাধক দুই হইতে তিন প্রহর পর্য্যন্ত সাধনা করিয়াও ক্লান্ত হ'ন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অভ্যাসী অন্ততঃ পাঁচ, ছয় ঘণ্টাকাল সাধনাভ্যাসে প্রযত্ন করিবেন। তৃতীয় শ্রেণীর অভ্যাসীর সাধনকাল অন্ততঃ তিন চারি ঘণ্টা হওয়া উচিৎ।

সাধক মাত্রেই অন্ততঃ দুই, আড়াই ঘণ্টা কাল সাধনায় দিবেন,

নচেৎ বিশেষ কিছুই অনুভব করিতে পারিবেন না। নামে মাত্র এক আধ ঘণ্টা সাধনে কিছুই হইবার নহে। তবে একবারে না বসার চেয়ে অল্পক্ষণ করিয়াও বসা ভাল। তাহাতেও কিছু উপকার অবশ্যই হইবে। রাত্রির শেষ প্রহরটি সাধনার জন্য রাখিতে পারিলে অত্যুত্তম হয়, অন্ততঃ সূর্য্যোদয়ের আগেই আসনে বসা উচিৎ। ওদিকেও সূর্য্যাস্তকাল হইতে অন্ততঃ অর্দ্ধপ্রহর (দেড় ঘণ্টা) কাল সাধনায় দিতে পারিলে ভাল হয়। এই সময়ের কতকাংশ ধ্যানে, কতকাংশ জপে, কতকাংশ অর্চ্চনা ও অধ্যয়নাদিতে দিতে হইবে। সাধক আপন অবস্থার উন্নতির সহিত এইসকল সময় বিভাগ আপনার সুবিধামত স্থির করিয়া লইতে পারিবেন। প্রয়োজন হইলে গুরুর আদেশ গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী প্রযত্ন করিবেন।

চিত্তের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয় এজন্য যম, নিয়ম, আসন অভ্যাসে মনোযোগী হইতে হইবে। সাধন প্রত্যহ অল্প পরিমাণে হইলেও, প্রত্যহ নিয়ম করিয়া সাধন করিবে।

সাধনায় সংযম ও বিরুদ্ধ চিন্তার পরিহার।

যে সময় চিত্তকে নির্ব্বিষয় করিবার চেষ্টা করিতেছ, সে সময়ে যদি শুভ চিন্তাও চিত্তে উদিত হয় তাহাও পরিত্যাজ্য। সে সময় চিন্তামাত্রকেই শত্রু মনে করিতে হইবে।

কোন দিন অল্পক্ষণ, কোন দিন বহুক্ষণ, কোন দিন হইলই না—এরূপ ভাবে সাধনা করা স্বেচ্ছাচার, তাহাতে কোন উপকার হয় না। বরং প্রতিদিন যথাসময়ে, যথাস্থানে ১০ মিনিট কাল সাধনা করা ভাল, তথাপি মনের খেয়ালমত কোনদিন তিনঘণ্টা, কোনদিন

আধঘণ্টা, কোনদিন পাঁচ মিনিট, কোনদিন কিছুই নয় এরূপ ভাবে সাধনা করা অন্যায়। ইহাতে কোন ফল হয় না। যদি অবসর না থাকে, অত্যল্প কালের জন্য ও ঠিক সময়ে বসা চাই। প্রতিদিন অথবা এক এক সপ্তাহ পরে বা পক্ষান্তর পরে পরে ৫।৬ মিনিট করিয়া সাধনার কাল বৃদ্ধি করা ভাল, কিন্তু যেটুকু বাড়াইবে সেটুকু বরাবর ঠিক রাখিবে। নচেৎ উন্নতি বুঝিতে পারিবে না। চিত্তকে চিন্তাশূন্য করিবার চেষ্টা বা দৃষ্টিকে স্থির করিবার চেষ্টা প্রতিদিন নিয়মিত কাল ধরিয়া অভ্যাস করিলে অগ্রসর হওয়া যাইতেছে কিনা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

প্রতিদিন শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু শুধু শাস্ত্রাধ্যয়ন করিলে কোন ফল লাভ হয় না। শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সাধন করিতে হইবে, নচেৎ কেবল অধ্যয়ন ও শ্রবণ দ্বারা বিশেষ সুফল পাওয়া যায় না। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানুসন্ধানে সচেষ্ট ও ব্যাকুল না হয়, তাঁহার শাস্ত্রপাঠ বৃথা হয়। ভাগবতে আছে "শব্দ ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি। শ্রমঃ তস্য শ্রমফলম্ হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ"। যিনি শব্দ ব্রহ্মে অভিজ্ঞ অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞ, কিন্তু শাস্ত্রের উপদিষ্ট বিষয়ে নিষ্ঠ নহেন, তিনি অধ্যয়নাদি দ্বারা শব্দ ব্রহ্মের পারে যাইয়াও যদি ভগবদ্‌ধ্যানভক্তিবিহীন হ'ন তবে তাঁহার শাস্ত্রপাঠ শ্রম মাত্র সার হয়, যে রূপ বন্ধ্যাগাভী রক্ষকের বৃথা শ্রম হয়—অর্থাৎ দুগ্ধাদিলাভে বঞ্চিত থাকে। এসম্বন্ধেও নিয়ম রক্ষা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু যেটুকু পড়িবে সে সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ অভিনিবেশ

সহকারে চিন্তা করিবে। ভগবদলীলা, তাঁহার করুণা বা তাঁহার মহিমার কথা অথবা কোন জ্ঞানের কথা বা কোন সংযমের কথা যখন যাহা পড়িবে তাহা বেশ চিন্তা করিয়া পড়িবে।

সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন স্তোত্রগীতাদি।

ইহাতেও চিত্ত স্থির হয়। যখন যাহা পড়িতেছ বা চিন্তা করিতেছ তদব্যতীত কোন চিন্তা আসিতে দিবে না। শ্রদ্ধালুচিত্তে শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে, তাহার মর্ম্মকথা আপনাপনি উপলব্ধি হইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্র পড়িতে পড়িতে সংশয় নিরাশ হয়, হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। গীতা হ'ক, ভাগবত হ'ক, উপনিষদ হ'ক,—কোন একটি গ্রন্থের কোন একটি শ্লোককে (যাহাতে চিত্তকে সরস ও সবল করে) পুনঃ পুনঃ স্মরণ চিন্তন ও তাহার ভাবকে নিবিড় ভাবে গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিবে। একটি শ্লোককে আয়ত্ত করিয়া যদি সম্ভব হয় পুনশ্চ আর একটি শ্লোক দেখিবে। রাশি রাশি গ্রন্থ বৃথা পড়িয়া লাভ নাই। একটি গ্রন্থের একটি শ্লোক মত চলিতে পারিলেও জীবন ধন্য ও কৃতার্থ হয়। স্তোত্রগুলি অতি যত্নে, ভক্তির সহিত আবৃত্তি করিবে। ইহাতে মন প্রফুল্ল হয় এবং চিত্ত ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। পূজাদি সমাপনান্তে বা সাধনাদি শেষ করিয়া, তবে এই সকল স্তোত্রাদি পাঠ করা উচিত। ভগবৎ সঙ্গীতও উপাসনার পর বিশেষ ফলপ্রদ।

শাস্ত্রাদি পাঠের ফলই হইল এই যে ভাগবতী কথা শুনিতে শুনিতে চিত্ত ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধালু হয় ও লুব্ধ হয়। এইরূপ শ্রদ্ধালু চিত্তে ভগবৎ ভজন করিতে

শাস্ত্রগ্রন্থ ও ভগবদভজনা

করিতে ভগবদ্ভক্তি লাভে জীব কৃতার্থ হইয়া যায়। ইহাই যথার্থ পরম ধর্ম। ধর্ম্মের পৃথক পৃথক অঙ্গাদি অনুষ্ঠানের ইহাই সাক্ষাৎ ফল।

'স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে॥'

কাম্যফল বা ভোগাদি ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য ধর্ম্ম অনুষ্ঠেয় নহে, ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা জীব তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়, এবং তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় না হইলে ভগবদস্বরূপ অপরিজ্ঞাতই থাকে, এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের মহাক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি লাভের সম্ভাবনা থাকে না। চতুরাশ্রম ও বর্ণাশ্রম বিহিত সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্দেশ্যই হরিতোষণ, অতএব এই ভগবদ্ভজনার দ্বারা ভক্তি ও জ্ঞান লাভ করিয়া মনুষ্যজীবন সফল করা সমস্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

"তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাংপতিঃ
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।
যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্ম্মগ্রন্থি নিবন্ধনম্
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্য্যাৎ কথারতিম॥
শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎ সেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবনাৎ॥
শৃণ্বতাং স্বকথাং কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্ত্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎ সতাম্॥
নষ্টপ্রায়েষভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী॥
তদা রজস্তমোভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি॥

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্ট এবাত্মনীশ্বরে ॥
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্” ॥

অতএব একমন হইয়া ভক্তপালক ভগবানের গুণগাথা শ্রবণ, তন্নাম কীর্ত্তন ও তাঁহারই ধ্যান ও পূজা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যাঁহার ধ্যানরূপ অসি দ্বারা পণ্ডিতগণ কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, সেই ভগবানের গুণ কীর্ত্তন শুনিতে কাহার না ঔৎসুক্য জন্মিয়া থাকে? পুণ্যতীর্থ সেবা ও মহৎব্যক্তির সেবা দ্বারা শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং শ্রদ্ধা হইতে ভগবৎ কথায় মনের রুচি হয়। এই হরি কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন দ্বারাই অমঙ্গল অর্থাৎ বিষয় বাসনা তাহাদের অন্তঃকরণ হইতে ভগবান দূর করিয়া দেন। এইরূপে নিত্য ভাগবত সেবা দ্বারা সমস্ত অমঙ্গল নষ্ট প্রায় হইলে উত্তমশ্লোক ভগবানে ভক্তির উদয় হয়। এইরূপে ভক্তি সহযোগে কাম ক্রোধ লোভাদি দ্বারা হৃদয় অনাবিদ্ধ হইয়া মন পরম প্রসন্নতা লাভ করে। এইরূপ প্রসন্ন মানস ও ভগবদ্ভক্তি সহকারে ভগবত্তত্ত্ব অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ হয়। জ্ঞানোৎপত্তির সহিত আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, এইরূপে হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া সর্ব্বসংশয় বিদূরিত হয়। এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ পরম আনন্দে বাসুদেবে নিত্য ভক্তি করিয়া থাকেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে মহর্ষি কপিলদেব স্বীয় মাতা দেবহুতিকে পরমার্থ তত্ত্ব বিষয়ক এই সুমনোহর উপদেশগুলি প্রদান করিয়াছিলেন :— "জননি! নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মন, আমার গুণকথন দ্বারা বর্দ্ধিত মদ্বিষয়ক দৃঢ় ভক্তিযোগ, তত্ত্বজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপস্যার সহিত অতি কঠিন আত্মসমাধি, এই সকলের দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি বার বার দগ্ধ হইতে থাকে, সুতরাং অগ্নির উৎপত্তির কারণ কাষ্ঠের ন্যায় ক্রমে বিলুপ্ত হয়। প্রকৃতি বিলুপ্ত হইলে স্বীয় পরমানন্দ প্রাপ্ত পুরুষের আর অমঙ্গল সাধনে সমর্থ হয় না। পুরুষ বহু জন্ম জন্মান্তর এইরূপ আত্মানুরক্ত হইয়া যখন ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্ত সকল স্থানেই বৈরাগ্য অবলম্বন করতঃ এবং আমার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান হইয়া আমার প্রসাদে যথার্থ পরমার্থ তত্ত্ব জানিতে পারেন, তখন কৈবল্য নামক দেহাতিরিক্ত স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়ায় নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হন"।

ইহারই নাম **চিত্তশুদ্ধি**—ইহাই ভগবদুপাসনার সাক্ষাৎ ফল।

উপরোক্ত নিয়মাদি যথাযথ প্রতিপালিত হইলে আত্ম-সাক্ষাৎকার সুকর হয়।

আত্ম-সাক্ষাৎকার করিবার বিধি

"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে॥
অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপিচাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুংশ্রুতিপরায়ণাঃ॥"

কেহ কেহ ধ্যানযোগ দ্বারা দেহের মধ্যেই আত্মাকে দর্শন

করেন, অপর কেহ কেহ সাংখ্যযোগ অর্থাৎ তত্ত্ববিচার দ্বারা এবং কেহবা কর্ম্মযোগ অর্থাৎ পাতঞ্জলোক্ত সাধন প্রণালী দ্বারা এই আত্মাকে দর্শন করেন। অপর কেহ কেহ এই সকল জ্ঞান ও সাধন প্রণালী সম্যক অবগত না হইয়া গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া মাত্র স্বয়াধিকার অনুরূপ সাধনাদি দ্বারা তাঁহার উপাসনা করেন। মন্দাধিকারী হইলেও এই সকল সাধকেরা মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। অর্থাৎ ভগবানকে না পাওয়া রূপ যে মহাবিনাশ তাহা হইতে তাঁহারা রক্ষা পান। একবারও যে তাঁর শরণ লইয়াছে তাহার আর কোন চিন্তা নাই।

সপ্তম অধ্যায়।

ব্রহ্মবিদ্যা

জ্ঞানযোগ।

চিত্ত শুদ্ধ হইলেই জ্ঞানের উদয় হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানং তত্ত্ববিচারেণ নিষ্কামেনাপি কর্ম্মনা।
জায়তে ক্ষীণতমসাং বিদুষাং নির্ম্মলাত্মণাম্ ॥"

তত্ত্ববিচার সহ নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা তমঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জ্ঞান আপনিই উদয় হয়। প্রহ্লাদ বলিয়াছেন :—

"স্তুত্যা প্রণত্যা বিজ্ঞপ্ত্যা শমেন নিয়মেন চ।
লব্ধোঽয়ং ভগবানাত্মা দৃষ্টশ্চাধিগতঃ স্ফুটম্ ॥"

স্তুতি, প্রণতি, আত্মনিবেদন, শম ও নিয়ম সাধন (শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান) প্রভাবে ভগবানাত্মা দৃষ্ট ও লব্ধ হইয়া থাকেন। সেই পরমাত্মা বা ভগবান বলিলে কি বুঝিতে হইবে, শাস্ত্র তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দতে ॥"

তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ অদ্বয়জ্ঞানকেই তত্ত্ব বলিয়া বর্ণন করেন। সেই অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্বকে কেহ বা ব্রহ্ম, কেহ বা পরমাত্মা ও কেহ বা ভগবান শব্দে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

এই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়ের নামই ব্রহ্মবিদ্যা বা পরাবিদ্যা। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন "বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি প্রদা যা।"—যাহা ব্রহ্মগতি প্রদান করে তাহাই বিদ্যা। এই ব্রহ্ম বিদ্যা গুরুমুখে অবগত হইতে হয়। ইহা শুধু শাস্ত্র পড়িয়া হয় না। এইজন্য পূর্ব্বকালে মুমুক্ষু সাধকেরা আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্যই সমিৎপানি হইয়া বিদ্বান ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিতেন। উদ্দেশ্য গুরুর নিকট আত্মসাক্ষাৎকারের উপায় জানিয়া লওয়া, কারণ আত্মসাক্ষাৎকার ব্যতীত জীবের পুনঃ পুনঃ সংসার গতি নিবৃত্ত হয় না।

ব্রহ্ম বিদ্যা।

আমাদের দেশের করুণাময় ঋষিগণ মানবের কল্যানার্থ আত্মসাক্ষাৎকারের বহুবিধ উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ মার্গই প্রধান। উপায়গুলি ভিন্ন হইলেও ইহাদের সকলের লক্ষ্য সেই এক—আত্মসাক্ষাৎকার বা সংসার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ। বিভিন্ন পথগুলি আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য বিহিত হইলেও অধিকারানুযায়ী ইহা অবলম্বনীয়। গুরুই এই অধিকার ঠিক করিয়া দেন, স্বেচ্ছামত গ্রহণ করিতে গেলে পদে পদে পথভ্রান্তি হওয়া সম্ভব। এই তিনটি পথ তিন প্রকার প্রকৃতির জীবের জন্য ব্যবস্থিত হইলেও ন্যূনাধিক এই তিনটিকে এক সঙ্গেই অবলম্বন করিয়া মানুষকে চলিতে হয়। একটিকে ত্যাগ করিয়া অন্যটিকে গ্রহণ করা এক রকম অসম্ভব বলিলেও হয়। প্রভেদ এই জ্ঞানমার্গে জ্ঞান প্রধান থাকিয়া অন্য দুটি অপ্রধানভাবে থাকে, ভক্তিমার্গে ভক্তি

পন্থাত্রয়।

মুখ্য ও অন্য দুটি গৌণ এবং কর্ম্মমার্গে কর্ম্ম প্রধানরূপে ও অন্য দুটি গৌণরূপে অবলম্বিত হয়। সাধুসঙ্গ প্রভাবে যাঁহার চিত্তে বিবেক উদয় হয় নাই, সুতরাং যাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণ সমল, এবং যাঁহারা জাগতিক কাম্যপদার্থের কামে মুগ্ধ, তাঁহারা তখন ঈশ্বরাধনা করিয়াও এই সকল বস্তু লাভের লালসায় অত্যন্ত ব্যগ্র। এই সকল ভোগসুখাসক্ত চিত্ত ভোগসুখ ব্যতীত অন্য কিছু যে চাহিবার আছে তাহা কল্পনাই করিতে পারে না। ইহারা সকাম, এইজন্য স্বর্গ-প্রাপক তপস্যা, দান, যজ্ঞাদি ইহাদের জন্য বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মযোগ এই সকল ব্যক্তিরাই অবলম্বন করিবে। কিন্তু যাঁহারা ইহাতে সন্তুষ্ট ন'ন, পৃথিবীতে অসপত্নমৃদ্ধ রাজ্য পাইয়াও যাঁহাদের চিত্ত সুখী নহে, তাঁহারা স্বর্গপ্রাপক যাগযজ্ঞাদি লইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দেখিলেন অনন্ত তরঙ্গ বিক্ষোভিত সাগরের ন্যায় মনুষ্যের ভাগ্য নিয়ত অস্থির ও চঞ্চল। সুখের উজ্জ্বল দিবা দুঃখের অন্ধকার রাত্রিতে ডুবিয়া যায়। জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখের চক্রনেমী প্রতি নিয়ত বিঘূর্ণিত হইয়া মানবকে এই জাগতিক সুখ দুঃখের অচিরস্থায়িত্ব ও দুঃখময়ত্ব অতি নির্ম্মমভাবে বুঝাইয়া দিতেছে। কত আশান্বিত হইয়া, কত প্রিয় মনে করিয়া, যাহাকে অবলম্বন করিয়া তুমি এই সংসারবৃক্ষে নীড় বাঁধিলে—মনে করি[illegible] কত সুখেই দিন কাটাইব, এ আনন্দের দিন আর ফুরাইবে না, এ প্রেম মদিরার নেশা কিছুতেই ছুটিবে না—হায় তোমার সেই প্রিয়বস্তু তোমার চোখের সামনে কালের অমোঘ নিয়মের অধীন হইয়া তোমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। যাহা কিছুদিন আগেও কল্পনা করিতেও

হৃৎকম্প হইত, সেই প্রিয় বস্তু তোমার হৃদয়তন্ত্রী ছিন্নভিন্ন করিয়া তাহার সাধের খেলা সমাপন করিয়া কোন অদৃশ্য দেশে চলিয়া গেল, বহু সাধ্য সাধনায় যাহাকে আর একবার চোখের দেখাও দেখিতে পাইবে না। তবে কিসের জন্য—এত অধ্রুব এত ক্ষণভঙ্গুর বস্তুলাভের জন্য—এত ব্যাকুল হইয়া লাভ কি? তবে প্রাণের যে এত আকাঙ্ক্ষা তাহা কি কেবল অপূর্ণ থাকিবার জন্যই? প্রাণের মধ্যে এত যে আশা, এত যে ব্যাকুলতা তাহা কি কেবল নিরাশায় পরিসমাপ্তি হইবার জন্যই? আমার হৃদয়ভরা এত স্নেহ, এত প্রেম তাহা গ্রহণ করিবার কোন অবিনশ্বর চিরস্থায়ী পদার্থ কি নাই, তবে কি শুধু বসিয়া বসিয়া কাঁদা ও মরণের প্রতীক্ষা করাই মানব জীবনের একমাত্র নিয়তি? ইহাই সমস্ত হৃদয়ের করুণ ক্রন্দন। তাই সেই করুণার্দ্র ঋষিরা জগতের গভীর মর্ম্মবেদনায় ব্যথিত ও পীড়িত হইয়া ইহার উপায় অন্বেষণে সচেষ্ট হইলেন।

"কি কারণং ব্রহ্মকুতঃ স্ম জাতা জীবাব কেন
ক্ব চ সংপ্রতিষ্ঠাঃ।
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে
ব্রহ্মবিদোব্যবস্থাম্॥"

সেই কারণ কি, আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, কি কারণে জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হইয়াছি, আমাদের সেই প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় স্থানটি কি? হে শ্রেষ্ঠকারণবিদগণ! তোমরা কি জান আমরা কোন কারণের বশবর্ত্তী হইয়া এই সুখ দুঃখের ব্যবস্থায় নিয়মিত রহিয়াছি?

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ কেনঃ প্রাণঃ
প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ।
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদন্তি চক্ষুঃ শ্রোত্রং
ক উ দেবো যুনক্তি॥"

কাহার দ্বারা অভিপ্রেত বা প্রেরিত হইয়া এই মন বিষয়ে ধাবিত হয়, কাহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া মুখ্য প্রাণ গমনাগমন করে, কাহার অভিপ্রায়ে প্রেরিত হইয়া লোকে এই সকল বাক্য উচ্চারণ করে, কোন দেবতা চক্ষু কর্ণকে স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত করেন? এই সুগভীর প্রশ্নের উত্তর ঋষিরা ধ্যান নিমগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া তাহাই জগতের হিতার্থ প্রচার করিয়াছিলেন। ঋষিদের এই ধ্যানলব্ধ উপায়গুলি জ্ঞান, যোগ ও ভক্তি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা।

ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলিলেন—

আমি মনুষ্যগণের মঙ্গলকামনায় জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের কথা বলিয়াছি। এই যোগত্রয় ভিন্ন অন্য উপায় নাই।

যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোস্তিকুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্নানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥
তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥

যাঁহারা কর্ম্মফলে বিরক্ত এরূপ ত্যাগী পুরুষদের জন্যই জ্ঞানমার্গ, আর যাঁহারা কর্ম্মফল ভোগসুখাদিতে আসক্ত তাঁহাদের জন্যই কর্ম্মমার্গ। আর কোন ক্রমে ভাগ্যোদয় হেতু মদীয় কথাদিতে যাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, যাঁহারা কর্ম্মফলে বিরক্তও নহেন, আসক্তও নহেন, তাঁহাদিগের জন্যই ভক্তিযোগ। হে উদ্ধব! পুরুষ যতদিন কর্ম্মফলে বিরক্ত না হইবে, অথবা মদীয় কথা শ্রবণে শ্রদ্ধাবান্ না হইবে, ততদিন কর্ম্মসমূহ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু –

"জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।
ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালু র্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ॥

যাঁহারা আমার কথায় শ্রদ্ধান্বিত এবং কাম সকল দুঃখদায়ক জানিয়া কর্ম্মফলে বিরক্ত কিন্তু তথাপি সম্পূর্ণ পরিত্যাগে অসমর্থ এরূপ ব্যক্তিরা শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবেন।

এইরূপ ভজনাকারীর ক্রমশঃ কর্ম্মাসক্তি কাটিয়া যায়, এবং তিনি নির্ব্বিণ্ণ হইয়া জ্ঞান লাভের যোগ্যতা প্রাপ্ত হ'ন। ইহাই ভক্তিসাধনার লক্ষ্য। আর যাঁহাদের কর্ম্মেতে মোটেই আসক্তি নাই, ফলেও যথেষ্ট বিরক্ত এরূপ ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মা-ভ্যাসে মন যেরূপে অটল হয়, সেইরূপে মনকে ধারণা করিবেন।

"যদারম্ভেষু নির্ব্বিণ্ণো বিরক্তঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
অভ্যাসেনাত্মনো যোগী ধারয়েদচলং মনঃ॥"

কর্ম্মফলে স্বভাবতঃ বিরক্ত হইলেও এবং সংসারসুখে স্পৃহাশূন্য হইলেও প্রাণমনের ব্যাপারাদি হেতু যে চাঞ্চল্য তাহা হইতে নিষ্কৃতি লাভ সহজ নহে। দেহাদির সংস্কার বড়ই কঠিন, বুঝিলেও এক মুহূর্ত্তে ইহা সমস্ত বুঝা উল্টাইয়া দেয়। "অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ"—ইহাই মুমুক্ষু হৃদয়ের ঐকান্তিক ব্যথা। কাম রজোগুণ হইতে উদ্ভূত, সত্ত্বগুণ যথেষ্ট বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইলে আর এ বাসনার অত্যাচার হইতে মুক্তি নাই, সুতরাং এই কামকে শাসন করিতে কত সুচিরকালব্যাপী সাধন করিতে হইবে তাহা কে বলিতে পারে?

যাঁহারা কপিল, শুকদেব, জড়ভরতাদির ন্যায় আজন্মজ্ঞানী, যাঁহারা স্বভাবতই সংসারবিরক্ত, বহুজন্ম সঞ্চিত তপস্যার ফলে যাঁহারা জ্ঞানে আরূঢ় হইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে তমোমল নিঃসংশয়ে অপনোদিত হইয়াছে, যাঁহারা আত্মাতিরিক্ত আর কিছুই অনুভব করিতে পারেন না—তাঁহাদের পক্ষে মুক্তিলাভ সহজ বটে; তাঁহারা গুরুমুখে একবার মাত্র বেদান্ত শ্রবণ করিয়া অথবা গুরু নিরপেক্ষ হইয়াও আত্ম-প্রত্যয়ের দ্বারাই আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, জ্ঞানযোগ তাঁহাদের জন্যই। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানপথে গমনেচ্ছু, এমন কি জ্ঞানে আকৃষ্ট, বিষয় স্বাদু বোধ হয় না অথচ ব্যাপার-শূন্য হইতে পারিতেছেন না, বিক্ষেপ হেতু অসঙ্গ হইতে অসমর্থ তাঁহাদের জন্যই যোগমার্গ। সুপ্রসিদ্ধ যোগী ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিতেন 'যাহাদের পালে হাওয়া নাই, তাহাদের নৌকাই

গুণ দিয়া টানিয়া লইতে হয়।' যোগমার্গ জ্ঞানমার্গেরই একটি সাধন মাত্র। বুঝিয়াছে অথচ বিক্ষেপাদি হেতু মনকে নিশ্চল করিতে পারিতেছে না, সুখী নহে অথচ ব্যবহারিক জগতে কর্ম্ম চেষ্টা ছাড়িতে পারিতেছে না, আত্মসাক্ষাৎকারে লোলুপ অথচ দেহাদির ভান ছুটিতেছে না, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় অভিরুচিকর নহে অথচ তাহা ছাড়িতেও পারিতেছে না, এতাদৃশ পুরুষের জন্যই পাতঞ্জলোক্ত যোগমার্গ বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানলাভেচ্ছু অধিকাংশ ব্যক্তির পক্ষে যোগপথই মুক্তি লাভের সুগম উপায়। এমন কি ভক্তি পথাবলম্বী ও কর্ম্মীদের পক্ষেও এই যোগপথ অবলম্বনীয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

জ্ঞান মার্গ। সর্ব্বোচ্চ অধিকারীদের জন্যই জ্ঞানমার্গ, খুব কম লোকেরই এ পথের অধিকার হয়। একমাত্র প্রকাশাত্মা পরমাত্মাই আছেন—এই প্রকার অবধারণের নামই সম্যক জ্ঞান। এই দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই আত্মা, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই এই প্রকার নিশ্চয়ের নাম সম্যক জ্ঞান।

"ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে তদা॥

বিক্ষেপাদি রহিত, সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বময় ব্রহ্মই আমি, মেদমাংসমজ্জাদিময় শরীব আমি নহি—এইরূপ বোধকেই জ্ঞান বলিয়া থাকে। যতক্ষণ এই সংসার এবং সংসারের সমুদয় বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান হয়, ততক্ষণ তাহা অসম্যক্ জ্ঞান। সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা অসম্যক্ জ্ঞানকে নিরস্ত করিতে হয়।

অসম্যগ্‌জ্ঞান হেতু এই জগৎপ্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া ভ্রম হয় এবং এই দেহে আত্ম-বুদ্ধির উদয় হয়।

"দেহোঽহমিতি যা বুদ্ধিরবিদ্যা সা প্রকীর্ত্তিতা।
নাহং দেহশ্চিদাত্মেতি বুদ্ধির্বিদ্যেতি ভণ্যতে॥"

আমি দেহ এই যে ধারণা ইহারই নাম অবিদ্যা বা অজ্ঞান। আমি দেহ নহি, আমি চিদাত্মা এইরূপ যে অটল ভাব তাহারই নাম বিদ্যা বা জ্ঞান। এই জ্ঞানের অভাবই সংসারপ্রবাহের হেতু এবং এই জ্ঞানের উদয়েই সংসার নিবৃত্ত হয়।

"অবিদ্যা সংসৃতের্হেতুর্বিদ্যা তস্যা নিবর্ত্তিকা।
তস্মাদ্‌ যত্নঃ সদা কার্য্যো বিদ্যাভ্যাসে মুমুক্ষুভিঃ॥"

কঠোপনিষদে আছে—

"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদনুশাসনম্‌॥"

এই মনুষ্যদেহেই যখন হৃদয়গত সমস্ত অবিদ্যাগ্রন্থি (শরীর, পুত্র, কলত্র, বিত্তাদিতে যে অত্যন্ত স্নেহ) বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন সেই মরণশীল মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করে।

অজ্ঞানহেতু কামনাদ্বারা ভ্রান্ত জীব সংসারে বদ্ধ হইয়াছে। বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন 'কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথা কামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে।" এই যে পুরুষ ইনি কামময়—ইঁহার যেরূপ ভাবনা তদনুরূপ কর্ম্ম বা চেষ্টা হয়, এবং যেরূপ কর্ম্ম করে তদনুরূপ ফল উৎপন্ন হয়।

এই সংসারের মূল কারণই হইল কামনা। এই কামনা ও তাহার ফল কত যে অকিঞ্চিৎকর এবং কত যে দুঃখের হেতু তাহা জানিলে আর কে এই দুঃখদায়ক সংসারকে অভিলাষ করিবে? বিষয়ভোগজনিত সুখসমূহের অসারতা চিন্তা করিয়া দেখিলে ভোগসুখাদি সম্পাদনের জন্য কে দীর্ঘ জীবন কামনা করিবে? সেইজন্য—

"অথ ধীরা অমৃতত্বং বিদিত্বা
ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥"

ধীর বিবেকী পুরুষেরা এই অনন্ত মৃত্যুপ্রবাহের মধ্যে ধ্রুব অমৃতকে বিদিত হইয়া অদম্য ভোগ স্পৃহাকে দমন করিয়া এই সংসারের ক্ষণভঙ্গুর পদার্থের প্রতি আসক্তি প্রকাশ করিবেন না।

"তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্‌মনঃ।
তদেতৎ সত্যং তদমৃতং তদ্বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি॥"

সেই সূক্ষ্ম বস্তুই আবকারী ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণের প্রাণ, তিনি বাক্যের শক্তি ও চেতনের চেতনা, তিনিই সত্য, তিনিই অমৃত। হে সৌম্য, এই অমৃতস্বরূপ আত্মাই তোমার বেধনীয় বা লক্ষ্য বলিয়া জানিও।

তাই নচিকেতা সংসারের মধ্যে যে ঘোর দুঃখ-সঙ্কট রহিয়াছে, তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আর কামোপভোগপূর্ণ সংসারকে কামনা করিতে পারিলেন না, তিনি যমরাজকে বলিলেন—

"শ্বোভাবা মর্ত্তস্য যদন্তকৈতৎ
সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্ব্বং জীবিত স্বল্পমেব,
তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে ॥"

হে অন্তক! আপনার উল্লিখিত ভোগ্য বস্তুসমূহ কল্য পর্য্যন্ত থাকিবে কিনা সন্দেহ, আর এই সমস্ত অনিত্য বস্তুর ভোগদ্বারা জীবের ইন্দ্রিয়শক্তিও নষ্ট হইয়া যায়। ভোগাসক্ত চিত্তে আয়ুষ্কাল দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল ও তাহার পক্ষে স্বল্পই বোধ হয়। অতএব যানবাহন ও অপ্সরা নৃত্যগীতাদি আপনি রাখিয়া দিন, আমার প্রয়োজন নাই।

"ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ"

বহুবিত্ত পাইয়াও মনুষ্য কখন তৃপ্ত হয় না, আবার চাহিয়া বসে, অতএব—

"অভিধ্যায়ন্ বর্ণরতিপ্রমোদান্,
অতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।"

যাঁহাকে পাইলে এই সমস্ত মোহকুহেলিকা বিদূরিত হইবে তাঁহাকে কোথায় অন্বেষণ করিতে হইবে?

"তং দুর্দ্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং
গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্।
অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং
মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি ॥"

সেই দুর্দ্দর্শ, গূঢ়, প্রচ্ছন্ন হৃদয়ে লুকায়িত বুদ্ধির অন্তরে অবস্থিত

পুরাণ পুরুষকে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা হর্ষ ও শোককে অতিক্রম করেন।

"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা
নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।
জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
স্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ॥" মুণ্ডক

সেই শান্তিময় আত্মা বাহ্যচক্ষুর গ্রাহ্য নহেন, বাক্য বা অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও গ্রাহ্য নহেন। অন্যান্য কর্ম্ম দ্বারাও তিনি লভ্য নহেন। জ্ঞানালোচনা দ্বারা যখন বুদ্ধি নির্ম্মল হয় অর্থাৎ বিকল্পরহিত হয়, তখন সেই পবিত্র ধ্যানযুক্ত চিত্তেই তিনি দৃষ্ট হন। এই আত্মাকে জানিলেই তবে সব জানা হয়—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ, শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি, আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্।"—বৃহদারণ্যক। হে মৈত্রেয়ি! সেই আত্মা—যিনি অখিল শান্তির একমাত্র নিলয় তাঁহাকে দর্শন করিতে হইবে, সেই আত্মতত্ত্বই পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিতে হইবে এবং তদ্বিষয় চিন্তন করিতে হইবে এবং তৎপরে সেই গভীর ধ্যানে ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে, তাহা হইলেই সেই আত্মা বিজ্ঞাত হইবেন এবং আত্মা বিদিত হইলে অন্য যাহা কিছু শুনিবার, যাহা কিছু বুঝিবার তাহা সমস্তই আর বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

জ্ঞান প্রাপ্তির লক্ষণ।

"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্।" কঠ

সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ পরমা গতির লক্ষণ এই যে তখন পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থিরভাব অবলম্বন করে—অর্থাৎ ইন্দ্রিয় মন বহির্জ্জগতের ব্যাপার ত্যাগ করিয়া প্রশান্তভাব ধারণ করে, বুদ্ধি তখন স্বচেষ্টা ত্যাগ করিয়া স্থিরভাবে অবস্থিত হয়, অর্থাৎ চিত্ত বৃত্তিশূন্য হইয়া পরম শান্তভাব ধারণ করে।

"মনসৈবানুদ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"

মনেরই দ্বারা সেই পরমসত্য সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে দেখিতে হইবে। নানাত্ব সেখানে নাই। জগদাদি অসংখ্য জীবরূপে যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা অসম্যক দর্শন হেতু। এই নানাত্ব দর্শন যতদিন হইবে ততদিন মৃত্যু হইতে মৃত্যুতে গমন করিতে হয় অর্থাৎ যাওয়া আসার নিবৃত্তি হইবে না।

"লয়বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা সুনিশ্চলম্।
যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥"

মনের লয় বিক্ষেপ বর্জিত হইলে অর্থাৎ জড়তা ও চঞ্চলতা বিদূরিত করিয়া মনকে স্থির ও নিশ্চল করিলে মন তখন অমনী-ভাব ধারণ করে, সেই অবস্থাকেই পরম পদ বলিয়া জানিবে।

"যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি নান্যদ্ বিজানাতি স ভূমা।" ছান্দোগ্য।

যে অবস্থায় আর কিছুই দেখে না, কিছুই শোনে না, কিছুই জানে না—তাহাই ভূমা বা ব্রহ্মপদ। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা কিছু জানা যায়, তাহাই ভ্রমোৎপাদক। সুতরাং ইন্দ্রিয় হইতে

মন প্রত্যাহৃত হইয়া যে প্রশান্ত নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয় তাহাই পরম পদ। যতদিন দেহেন্দ্রিয় সমন্বিত 'আমি' 'অমুক' এই রূপ বোধ বা প্রত্যয় থাকে ততদিন জীবাবস্থা বা বদ্ধাবস্থা।)

"কৃশোঽতিদুঃখী বদ্ধোঽহং হস্তপদাদিমানহং।"
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ বধ্যতে।"

আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি বদ্ধ, হস্তপদাদি সমন্বিত আমি—এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার দ্বারাই জীব বদ্ধ হয়।

"নাহং দুঃখী ন মে দেহো বন্ধং কর্ম্ম ন মে স্থিতং।
ইতি ভাবানুরূপেণ ব্যবহারেণ মুচ্যতে॥"

আমি দুঃখী নই, আমার দেহ নাই, সুতরাং কর্ম্ম আমাতে কিরূপে বদ্ধ থাকিতে পারে?—এই ভাবের অনুরূপ ব্যবহার দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়।

"মানসে চ বিলীনে তু যৎ সুখং চাত্মসাক্ষিকম্
তদ্ব্রহ্ম চামৃতং শুক্রং সা গতির্লোক এব সঃ॥

মন বিলীন হইলে যে সুখস্বরূপ আত্মা বা সাক্ষী প্রকাশিত হন তিনিই ব্রহ্ম তিনিই অমৃতস্বরূপ, তিনি সকলের গতি ও পরম লোক।

"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥"

সেই পরম লোকে সূর্য্যের প্রকাশ নাই, চন্দ্রেরও কিরণ

নাই, বিদ্যুৎ তারকারও প্রকাশ নাই, অগ্নিরও শক্তি নাই যে তাহাকে প্রকাশ করে। তাঁহারই প্রভাবে এই সকল উজ্জল জ্যোতিষ্কমণ্ডল প্রভান্বিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে।

"নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানা-
মেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥"

অনিত্য পদার্থ সমূহের মধ্যে যিনি নিত্য অবিনাশী কারণ স্বরূপ, যিনি ব্রহ্মা হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত চেতনাযুক্ত জীবের চৈতন্যপ্রদ পরমাত্ম, যিনি এক অদ্বিতীয় হইয়াও বহু জীবের কর্ম্মানুযায়ী ভোগ্য বিষয়সমূহ প্রদান করেন, তাঁহাকে যে ধীর বিবেকী পুরুষগণ আপনাপন বুদ্ধিতে প্রকাশমানরূপে দর্শন করেন, তাহাদিগেরই চিরশান্তি লাভ হয়, অন্যের হয় না।

"একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
একং রূপং বহুধা যঃ করোতি।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-
স্তেষাং সুখং শাশ্বত মেতরেষাম্॥"

সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা পরমাত্মা এক হইয়াও, তাঁহার অদ্বিতীয় নিজ স্বরূপকে বহু প্রকার দেব, তির্য্যগ-মনুষ্যাদি অসংখ্য জীবরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই

বুদ্ধিতে প্রকাশিত চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মাকে যে বিবেকী পুরুষগণ সাক্ষাৎ অনুভব করেন তাঁহাদিগেরই নিত্য সুখলাভ হয়, অন্য বিষয়াসক্ত অবিবেকী পুরুষের সে সুখ হয় না।

"ততো যদুত্তরং তদরূপমনাময়ং
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি।"

বিশ্ব জগতের অতীত সেই যে পরম বস্তু তিনি অরূপ ও সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ব্যাধিশূন্য, এই পরম শ্রেয় বস্তুকে যাঁহারা জানেন তাঁহারাই অমৃত লাভ করেন।

"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং. সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ,
দিবীব চক্ষুরাততম্॥"

"তদ্বিপ্রাসো বিপন্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে,
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদং॥"

(উন্মীলিত চক্ষু যেমন অসীম আকাশকে দর্শন করে, তদ্রূপ জ্ঞানীরা সেই সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বদা নিরীক্ষণ করেন। যাঁহারা সেই চরম সত্য চিরকল্যাণ লাভের জন্য একান্ত অভিলাষী, যাঁহারা জাগ্রত ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই শ্রেয়ঃ পদার্থের অন্বেষণে ব্রত রহিয়াছেন, সেই জ্ঞানী, মেধাবী ধীরগণই ব্রহ্মের পরম পদ লাভে সমর্থ হন।)

"মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥"

এই ব্রহ্মচৈতন্যে কিছুমাত্রও নানাভাব বা পৃথক পৃথক ভেদ-ভাব নাই। এই একত্বজ্ঞান বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত ধ্যানসমাহিত

মন দ্বারাই প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে এই ব্রহ্ম সত্তায় অসংখ্য জীব, জগৎ ঈশ্বরাদি পৃথক পৃথক ভাব দর্শন করে সে পুনঃ পুনঃ জন্মমরণাদির বশীভূত হয়। অর্থাৎ আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইলে আর পৃথক বোধ থাকে না, জন্ম মৃত্যু অসংখ্য ভেদজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তাহারই নাম মুক্তি।

ইহা জানিলেই

"তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশ্যন্তি ধীরা
আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি ॥"

ধীর ব্যক্তিগণ সেই আনন্দময় অমৃতস্বরূপকে গুরূপদেশজাত ও সাধনবুদ্ধিপ্রসূত নির্ম্মল ধ্যানৈকাগ্র-চিত্তে দর্শন করেন।

"যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে-
ঽস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥"

যেমন বেগবতী নদী সমুদ্রে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া আপনার পৃথক নাম-রূপকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জ্ঞানী পুরুষ নাম, রূপাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পরম দিব্য পুরুষের মধ্যে বিলীন হন। অর্থাৎ নামরূপাদি উপাধি বর্জ্জিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া যান। কি উপায়ে জানিতে হইবে?

"শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহি
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।"

সেই পরমতত্ত্বকে শ্রদ্ধা ভক্তি ও ধ্যানযোগ দ্বারা বিদিত হও।

ত্যাগেরই দ্বারা সেই অমৃতত্ব লাভ হয়। প্রথমে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মবিষয়ক উপদেশ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া বিচার করা, পরে সর্ব্বদা ব্রহ্মবিষয়ক বিচার হইতে মনন হইবে, এবং মনন হইতে ধ্যাননিষ্ঠা আসিবে। (প্রগাঢ় ধ্যান হইতে এই জাগতিক বস্তুর আকর্ষণ ছিন্ন হইয়া যাইবে।) এইরূপে সর্ব্বভাবের পরিত্যাগ দ্বারা সর্ব্বপূর্ণকে লাভ করা যায়।

সদ্‌গুরুর আশ্রয় লইতে হইবে—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥"

যিনি ব্রহ্মসাধনায় কুশলী, এবং ব্রহ্মজ্ঞানে নিপুণ, এইরূপ গুরুর নিকট সেই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য সমিৎপাণি হইয়া গমন করিবে।

"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ
সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।
অনন্যপ্রোক্তে গতিরত্র নাস্তি
অনীয়ান্‌হ্যতর্ক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥"

বিবেকহীন সাধারণ মনুষ্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে এই আত্মা সম্যকরূপে বোধগম্য হন না। কারণ আত্মা সম্বন্ধে বহু প্রকার ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে অতএব যিনি ব্রহ্মকে অভিন্নভাবে জ্ঞাত হইয়াছেন, এরূপ আচার্য্য কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে আত্মবিষয়ে বিবিধ তর্ক বা সন্দেহের সম্ভাবনা থাকে না, অথবা শ্রোতার

সংসারে আসক্তি আসে না। যে হেতু আত্মতত্ত্ব অতীব সূক্ষ্ম, ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের অতীত, এবং তর্ক বা অনুমানের দ্বারা অগম্য।

এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য গুরুভক্তি চাই :—

"যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"

যাঁহারা গুরু ও দেবতায় পরমভক্তি আছে তাঁহার নিকটই এই ব্রহ্মতত্ত্ববিষয়ক গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়। জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য ব্যতীত গতি নাই। অতএব

"উত্তিষ্ঠত জাগৃত প্রাপ্য বরান্নিবোধত
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া।
দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি॥"

হে জীবগণ! উত্থিত হও অর্থাৎ বিষয়চিন্তা পরিহার করিয়া জ্ঞানলাভে উদ্যোগী হও। জাগিয়া উঠ, আর মোহঘোরে অচেতন থাকিও না, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌ বরিষ্ঠ আচার্য্যের নিকট গমন করিয়া জ্ঞানলাভ কর। বিবেকিগণ বলেন এই আত্ম-জ্ঞানের পথ বড়ই দুর্গম, জানিও ক্ষুরধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ, অতি সতর্কতার সহিত এই পথে চলিতে হয়, সামান্য অসুবিধা, সামান্য অসাবধানতায় সমস্ত পণ্ড হইয়া যায়। এইজন্য ভক্তি ও বৈরাগ্যযুক্ত হইয়া এই অতীন্দ্রিয় মনবুদ্ধির অতীত জ্ঞানস্বরূপ আত্মাকে জানিতে হয়।

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো ন সমাহিতঃ॥
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"

যে ব্যক্তি অসদাচারী, শাস্ত্রনিষিদ্ধ পাপাদি হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে নাই, সে কেবল প্রজ্ঞান দ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক বিচার দ্বারা এই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। অসমাহিত অর্থাৎ অস্থিরচিত্ত ব্যক্তিও লাভ করিতে পারে না। অথবা অশান্তমানস—যাহার মনে সন্তোষ নাই, যে অনবরত বিষয় প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল, সেও এই আত্মস্বরূপকে বুঝিতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতেও এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ব্রহ্মসম্বন্ধে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ব্রহ্মবস্তু তত্ত্বতঃ কি তাহাই সেখানে আলোচিত হইয়াছে। গীতায় আছে—"অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে।" জ্ঞেয় বস্তু যে কি তাহাই উপদেশ করিতেছেন—জ্ঞেয় বস্তুই ব্রহ্ম, তিনি—অনাদিমৎপরং—অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই, তিনি দেশ কালাদি পরিচ্ছেদশূন্য, নিরতিশয়, তিনি অস্তি বা নাস্তির বিষয় নহেন। কোন বস্তু আছে কি নাই, ইহা ইন্দ্রিয়গণ ও বুদ্ধি মিলিয়া স্থির করে, যদি তিনি কোন বস্তু হইতেন, তাহা হইলে ইন্দ্রিয়বর্গের গ্রাহ্য হইতেন, তবে তাঁহাকে অস্তির বিষয় বলা যাইতে পারিত, কিন্তু তিনি কোন বস্তু নহেন। তাই বলিয়া তিনি শূন্য বা নাই তাহাও নহে, এইজন্য নাস্তিরও অবিষয়। সুতরাং তিনি আছেন কি নাই ইহা ইন্দ্রিয়দের বুঝিবার সাধ্য নাই। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংস্পর্শ হওয়াতে তদ্বিষয়ক বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। কিন্তু

তিনি অতীন্দ্রিয় বিদিত, অবিদিত বা অস্তি নাস্তি উভয় প্রকার বুদ্ধিরই অতীত। তিনি—

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥"

তিনি শব্দশূন্য এবং শব্দেরও অগ্রাহ্য, তিনি রূপশূন্য ও অস্পর্শ, তিনি রস ও গন্ধশূন্য। ইন্দ্রিয়রা যে স্বরূপকে গ্রহণ করে ও বুঝিতে পারে, তাহার মধ্যে কোনটিই তিনি ন'ন, অথচ তিনি আছেন, এত ধ্রুব আর কিছু নহে, তিনি অনাদি, অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী হিরণ্যগর্ভ অথবা প্রকৃতি হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয়গম্য বিষয়ের ন্যায় তিনি চঞ্চল নহেন। তিনি নিত্য একরূপ। সেই ব্রহ্মকে 'নিচায্য' নিশ্চয় করিয়া, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, ইহাই আমার পরম আশ্রয় এইরূপ যিনি স্থির করিয়াছেন তিনিই সংসার হইতে মুক্তিলাভ করেন। এই আত্মা—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াম্
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ॥"

তিনি অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইতেও সূক্ষ্মতর অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অতীত এবং আকাশাদি মহান পদার্থ হইতেও বৃহত্তর অর্থাৎ দেশ কালাদির অতীত। এই যে চিন্মাত্র আত্মা ইনি জীবের

"গুহায়াং" বুদ্ধির অভ্যন্তরে অবস্থিত, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। তবে তাঁহাকে দেখিতে পায় কে? যিনি অক্রতু, অর্থাৎ কামনা-রহিত, বীতশোক—অর্থাৎ দুঃখাদি রহিত এরূপ ব্যক্তি "ধাতু-প্রসাদাৎ"—অর্থাৎ শরীরধারক ইন্দ্রিয়াদি নির্ম্মল বা প্রসন্নভাব হইলে (স্থির হইলে), সেই নির্ব্বিকার বিশুদ্ধ চৈতন্য আত্মাকে সাক্ষাৎ করেন। অর্থাৎ গভীর ধ্যানে যখন চিত্ত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় স্থির হইয়া যায়, সেই সুখময় সময়ে আত্মা স্বতঃ প্রকাশিত বলিয়া অনুমিত হ'ন।

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥

এই আত্মা কেবল শাস্ত্রাধ্যয়ন দ্বারা লভ্য নহেন, বা কেবল তীক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারাও প্রাপ্ত হইবার নহেন, অথবা বহু বার বহু জ্ঞান কথা শ্রবণের দ্বারাও তাঁহাকে কেহ পায় না। কারণ আমাদের তো দৌড় এই ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধিগুলি লইয়া। ইহারা থাকিতে অভিমান যায় না, অভিমান না গেলে তিনি ধরা দেন না। এই আত্মা যাঁহাকে প্রসন্ন হইয়া বরণ করেন অর্থাৎ যে উপাসকের তাঁহাকে লাভ করাই জীবনের একমাত্র অভীপ্সিত, আর কিছু সে চাহে না, সেই মুমুক্ষু সাধকের হৃদয়ের একান্ত আকাঙ্ক্ষার ও ভক্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি

তাহার দ্বারা লভ্য হয়েন, এই আত্মা তখন স্বকীয় তনু অর্থাৎ নিত্য শুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ সেই মুমুক্ষু উপাসকের শুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রকাশিত করেন। এইজন্য একান্ত শরণাগতি ও ভগবৎ-কৃপাই আত্মসাক্ষাৎকারের উপায়।

এই আত্মার নামরূপগুণের দ্বারা স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না, তিনি নির্ব্বিশেষ ও স্বপ্রকাশ। কিন্তু তিনি সর্ব্বাত্মক বিভু।

> "সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বোতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
> সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
> অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ॥

তিনি সর্ব্বব্যাপক, এক, অদ্বিতীয় অর্থাৎ যাহা কিছু সবই ব্রহ্ম। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", তিনি স্বরূপতঃ এক হইয়াও বহুরূপে আপনাকে প্রকাশ করিতে পারেন—ইহাই তাঁহার অদ্ভুত ও অচিন্ত্য শক্তি। তিনি জীবমাত্রেরই করণবর্গের *শক্তিরূপে, এবং সমস্ত অচেতন পদার্থের অধিষ্ঠানরূপে থাকেন। তাঁহারই সত্তায় এই জড় চেতনাদি ভূতবর্গ অবস্থিতি করিতেছে। ইনি সর্ব্বব্যাপী মনবুদ্ধির অগোচর শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, ইনিই মুমুক্ষুবর্গের জ্ঞেয় পরব্রহ্ম স্বরূপ। তাঁহার নিজের কোন ইন্দ্রিয়াদি নাই, কিন্তু তাঁর শক্তি ভিন্ন কোন ইন্দ্রিয়ই কিছু করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির ক্রিয়া তাঁহারই শক্তিতে পরিচালিত

হইতেছে। তিনি স্বয়ং নিষ্ক্রিয় হইলেও, সমস্ত কার্য্যেরই তিনি মূলস্বরূপ। এইজন্যই শ্রুতি বলিলেন—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা, পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ", ইত্যাদি। তিনি আসক্তি-রহিত, তথাপি তিনি সকলের পালক, তিনি নির্গুণ অর্থাৎ সত্ত্বাদি গুণবর্জ্জিত, তথাপি তিনি গুণভোক্তা অর্থাৎ তিনি না থাকিলে কোন বস্তুরই উপলব্ধি হইত না, তিনি ভোক্তা, জ্ঞাতা। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া চরাচর সমস্তই বিদ্যমান রহিয়াছে। শ্রুতি বলিতেছেন তিনি "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ"—তিনি সকলের সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ অদ্বিতীয় ও গুণবর্জ্জিত।

যাহা না থাকিলে কোন বস্তুরই জ্ঞান* আমাদের হইত না, সেই আশ্রয় বস্তুটি তা'হলে কি? সেই বস্তুটিই হইল সত্তা বা অস্তিত্ব, ইহা বোধময়। এই সত্তাকে আশ্রয় করিয়াই যাবতীয় চরাচর পদার্থের প্রকাশ হইতেছে। তাহা হইলে এই সত্তাময় পদার্থটিই প্রকাশময় বা জ্ঞানময়। এই সত্তা বা প্রকাশের অভাব হইলে অন্য বস্তুর উপলব্ধিই থাকিবে না। অতএব সমস্ত বস্তুর মূলেই এই সত্তাময় বা প্রকাশময় ভাবটি বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সত্তা বা জ্ঞান কোন দ্রব্য নহে, সুতরাং উহা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থবিশেষ হইতে পারে না, তাহা এই দৃশ্যবর্গ না থাকিলেও বর্ত্তমান থাকে। এই দৃশ্যবর্গও সত্তাদ্বারা অস্তিত্ব-সম্পন্ন হইয়াই জ্ঞানের বিষয় হইতেছে। অতএব সমস্ত বস্তুও সত্তাময় বা বোধরূপ মাত্র। বোধাতিরিক্ত কোন পদার্থের অস্তিত্ব

থাকিতে পারে না। এই বোধভাব অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া খণ্ড খণ্ড রূপে ইন্দ্রিয় বোধগম্য হইলেই তখন তাহা অনাত্মক বিষয় বলিয়া উক্ত হয়।

আবার যখন বিবেক-বৈরাগ্যাভ্যাসে এই অবিবেক নষ্ট হয়, তখন বহু-জ্ঞান লুপ্ত হয়, এবং তখনই এক অখণ্ড চৈতন্য সত্তা আপনার মহিমায় আপনি বিরাজ করিতে থাকেন। এই জন্য গীতা তাঁহাকেই "জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং' বলিলেন। তিনি স্বয়ংই বোধস্বরূপ, অবার তিনিই শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা জ্ঞেয়রূপে উপলক্ষিত হ'ন। ভাগবতে নারদ বলিয়াছেন :—

"তস্মিংস্তদালব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্মম।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে॥"

শ্রীধরস্বামী—"প্রিয়ং শ্রবো যস্য তস্মিন্ ভগবতি লব্ধরুচের্মম অস্খলিতা অপ্রতিহতা মতিরভবৎ। যয়া মত্যা পরে প্রপঞ্চাতীতে ব্রহ্মরূপে ময়ি সদসৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ এতচ্ছরীরং স্বমায়য়া স্বাবিদ্যয়া কল্পিতং ন তু বস্তুতোঽস্তীতি তৎক্ষণমেব পশ্যে পশ্যামি। এবং শুদ্ধে ত্বংপদার্থে জ্ঞাতে দেহাদিকৃতবিক্ষেপনিবৃত্তেঃ তৎকারণভূত-রজস্তমো নিবর্ত্তিকা দৃঢ়া ভক্তির্জাতা (শ্রীধরস্বামী) এই 'অহং"ই প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মরূপে জ্ঞেয়, জ্ঞান প্রকাশেই এই শুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন :—

"জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্॥"

'আত্মজ্ঞান দ্বারা যাঁহাদের অজ্ঞান নাশিত হয়, আদিত্য যেমন তমোনাশ করিয়া সমুদয় বস্তু প্রকাশ করেন, সেইরূপ জ্ঞান তাঁহাদের অজ্ঞান বিনাশ করিয়া পরমাত্মাকে প্রকাশিত করে। গীতা বলিয়াছেন এই জ্ঞানের তুল্য পবিত্র আর কিছুই নাই—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।"

সৃষ্টি স্থিতি লয় ইহাও একমাত্র এই বোধ বা আত্মাকে আশ্রয় করিয়াই হয়। এইজন্য তিনি "ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্ জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ"। সুবর্ণ না থাকিলে যেমন সুবর্ণকুণ্ডল হইতে পারিত না সেইরূপ ব্রহ্ম না থাকিলে এ জগদ্রূপ ফুটিতে পারিত না।

এই আত্মা অতি নিরভিমান পুরুষ। সেই জন্যই তিনি বলিয়াছেন—

"ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।"

অতএব এই সকল সৃষ্ট্যাদি কর্ম্ম তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না।

"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোহস্তি ন প্রিয়ঃ।"

তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহার দ্বেষ্য বা প্রিয় কেহ নাই। তবে—

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্॥"

যে তাঁহাকে প্রীতিপূর্ব্বক ভজনা করে, সে তাঁহাকেই জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাতেই সদা সর্ব্বদা মগ্ন হইয়া আছে, এই হেতু তিনিও তাহাতে আছেন। সূর্য্য সকলকে সমান ভাবে কিরণ

যেন, যে আপনার গৃহের দ্বার ও গবাক্ষ খুঁলিয়া রাখে, মনে হয় তাহাকে যেন তিনি তাঁর কর-কিরণ দ্বারা আলিঙ্গন করিতেছেন। যে মূঢ়তা বশতঃ আপনার দ্বার মুক্ত করিয়া রাখে না, সে তাঁহার স্বতঃপ্রবাহিত করুণাকিরণ হইতে চিরবঞ্চিত থাকে। এই মাত্র প্রভেদ। তিনি আবার অধিযজ্ঞ স্বরূপ, অর্থাৎ তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব হেতু জীবের কর্ম্মানুরূপ ফল ভোগাদি হইয়া থাকে—"অধিযজ্ঞো-হহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বরঃ।" তিনি

"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥"

তিনি সকলের গতি অর্থাৎ কর্ম্মফল, তিনি সকলের ভর্ত্তা বা পালনকর্ত্তা, তিনি প্রভু নিয়ন্তা, এবং তিনি আমার সকল কর্ম্মের সাক্ষী দ্রষ্টা, তাঁহার চক্ষু এড়াইবার জো নাই। তিনি আমার নিবাস আশ্রয় স্থান, আমার শরণ রক্ষক, এবং সুহৃৎ। তিনি আমার স্রষ্টা, সংহর্ত্তা এবং তিনি আমার স্থিতি স্থান এবং তিনিই আমার অবিনাশি অব্যয় বীজ।

তাঁহার নিকট যে ব্যক্তি যে ভাবনা লইয়া উপস্থিত হয়, তিনি কল্পতরুর মত তাহার সেই সেই অভীষ্ট পূর্ণ করেন। তিনি অন্নহীনের নিকট মা অন্নপূর্ণা, মোহাদি রিপুত্রাসিত জীবের নিকট তিনি সাক্ষাৎ দৈত্যদর্প বিনাশিনী ভক্তাভয়-দায়িনী মা কালিকা, তিনি রোগাতুর আর্ত্তের রোগাপহারক বাবা তারকনাথ, তিনি স্রষ্টা রূপে ব্রহ্মা, পালকরূপে বিষ্ণু, সংহর্ত্তারূপে মহেশ্বর। তিনিই মোহবিভ্রান্ত পাশবদ্ধ অসংখ্য জীবশ্রেণী, আবার তিনিই ভববন্ধন

খণ্ডনকারী পরমশিবস্বরূপী জগদ্‌গুরু। তিনিই একমাত্র পরমানন্দ রসনিলয়, তিনিই প্রেমিক ভক্তের মনোবিনোদকারী, মদন-মনোহারী, ভুবনমনমোহন শ্রীকৃষ্ণ। তিনিই অন্তর্যামিরূপে সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত—

"তমিহ মহমজং শরীরভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাং।"

তিনিই স্বয়ং জন্মরহিত হইয়াও, শরীরধারী দিগের প্রত্যেক হৃদয়ে অহংরূপে বা অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনিই বোধরূপে চরাচর জগতের অস্তিত্বের মূলে বিদ্যমান। প্রত্যেক বস্তুর যে জ্ঞান হইতেছে সেই বোধরূপের বোদ্ধা, দ্রষ্টা, বা চেতয়িতা তিনিই আত্মা।

তাঁহার সত্তাময় অস্তিত্বের কোন সময়ে হানি ঘটে না। আমাদের এমন কোন জ্ঞান হইতে পারে না, যাহা দ্বারা এই সত্তা বা জ্ঞান প্রকাশিত না হয়। এই সত্তাকে ছাড়িয়া দিলে কোন বিশিষ্ট বস্তুই আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় না। এই সত্তা বা জ্ঞান একই পদার্থ। ইহা স্বয়ংপ্রকাশ, ইহার প্রকাশের জন্য কারণান্তরের অপেক্ষা নাই। যাহা কিছু আমরা দর্শন করি, শ্রবণ করি বা আস্বাদন কবি বা স্পর্শকরি, এ সমস্তই আমাদের জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞানের বিষয় না হইলে উহাদের অস্তিত্বই আমরা টের পাইতাম না। সুতরাং পদার্থসমূহের মধ্যে সাধারণ বা সামান্য পদার্থ হইল জ্ঞান। এই সত্তাসামান্য জ্ঞান পদার্থ হইতে জ্ঞানের বিষয় গুলিও একবারে অভিন্ন। তবে

মনে হইতে পারে, ঘটও জ্ঞানের বিষয় পটও জ্ঞানের বিষয়, তবে ঘট ও পটের পৃথক অস্তিত্ব বা বোধ হয় কেন? এই পৃথক জ্ঞানের কারণই হইল মায়া। এই মায়া যে কিছু একটা অনাসৃষ্টি বস্তু তাহা নহে, ইহা তাঁহারাই স্বকীয় শক্তি। ইহার দ্বারাই জগৎ পুনঃ পুনঃ নির্ম্মিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভগবান্ বলিতেছেন—

"প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥"

অসঙ্গ নির্ব্বিকার আত্মা কিরূপে বিশ্ব সৃজন করেন তাহাই বলিতেছেন—আমার স্বকীয় শক্তিকে বশীভূত করিয়া প্রলয়ে লীন প্রাণিবর্গকে পুনঃ পুনঃ সৃজন করি।

তাঁর এই অলৌকিকা মায়া অত্যন্ত দুস্তরা তাই জীবের পুনঃ পুনঃ জন্ম মরণের এবং এই সংসার গতির শেষ হয় না। তবে উপায়? ভগবান্ বলিয়াছেন—

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

সত্বাদি গুণবিকারময়ী মায়া সুদুস্তরা হইলেও, যে মায়াবীর, ইহা তাঁহার শরণাগত হয়। যে তাঁহাকে ভজনা করে সে এই সর্ব্বভূতচিত্তবিমোহিনী মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে। অর্থাৎ তাহারই সংসারবন্ধ নাশ হয়। সংসারবন্ধ নাশ হইলে সে দেখে কি? সে নানাত্ব দেখে না। নানা ভাব নানা জীব লইয়াই এই জগৎ, যে তাঁহাকে দেখে সে আর এই জগৎকে দেখে না। সে তাঁহাকে কিরূপ দেখে? এক অখণ্ড

সৎ পদার্থ রূপে তাঁহাকে দেখে। আমাদের এই যে নানাত্ব বোধ, এই যে পৃথক্ জ্ঞান, ইহা তাঁহার মায়াশক্তি প্রভাবেই উদয় হয়। যেমন শুক্তিতে রজতভ্রম হইলেও শুক্তি শুক্তিই থাকে, তদ্রূপ মায়া প্রভাবে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হইলেও তাহা ব্রহ্মরূপেই নিরন্তর বর্ত্তমান আছে। জগৎরূপে পরিণত হয় নাই। এই জগদ্রূপ বা নানাত্ব দেখিবার কারণই মায়াশক্তি। নচেৎ যাহা কিছু দৃষ্ট শ্রুত বা স্পৃষ্ট হউক, তাহা পরম সত্তাময় ব্রহ্মপদার্থ হইতে অতিরিক্ত নহে। মায়ার প্রভাবে এইরূপ নানাত্ব দর্শন হয়। মায়ার দুইটি শক্তি, একটি আবরণ ও দ্বিতীয়টি বিক্ষেপ। আবরণ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ আচ্ছাদিত হইলে সে সম্বন্ধে আমাদের কোন বোধের উদয় হয় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিক্ষেপ শক্তি দ্বারা ব্রহ্মে সংসারত্ব বা বহুত্ব আরোপিত হয়। তাহার ফলে সেই এক অখণ্ড আত্মা অসংখ্য রূপে দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের এই যে বহুত্বের জ্ঞান ইহা কোন্ কোন্ অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া উদয় হইতেছে? জাগরণ ও স্বপ্নাবস্থাতেই এই বহুত্বের স্ফূরণ হয়। কিন্তু সুষুপ্তির গাঢ় তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় আত্মসত্তার সমস্ত প্রকাশ যেন বিলুপ্ত হয়। মনে রাখিতে হইবে, এই যে, জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, ইহারা আত্মার অবস্থাত্রয়, কিন্তু ইহারা আত্মা নহে। ইহারাই মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণশক্তি।

কিন্তু এই মায়া ব্রহ্মকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত করিতে পারে না। যেমন মেঘাবৃত সূর্য্যালোক তীক্ষ্ণভাবে প্রকাশিত

হইতে পারে না, তদ্রূপ মায়াচ্ছন্ন আত্মারও প্রকাশ স্পষ্ট হয় না। অখণ্ড বস্তুর উপর স্থানে স্থানে আচ্ছাদন পড়িলে তাহা যেমন বহুরূপ ও খণ্ডীকৃতভাবে দেখা যায়, সেই রূপ আত্মাতে মায়ার আবরণ থাকায়, তাহা অসংখ্য খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশিত হওয়ায় নানাত্বের বোধ হয়। সেই জন্যই এত ধাঁধা লাগে। অগণ্য পাত্রস্থ জলে সূর্য্যের অগণ্য প্রতিবিম্ব পড়ে, কিন্তু সূর্য্য সেই এক। তদ্রূপ এই মায়ার আবরণে দেহাদি ঘটে। ঘটস্থিত জলে সূর্য্যের প্রকাশের ন্যায় দেহস্থিত বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়িয়া সেই এককে বহুরূপে দেখায়। পৃথক্ পৃথক্ ঘটস্থিত আকাশকে পৃথক্ মনে করিলেও আকাশ যেমন ভিন্ন হয় না, তদ্রূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত আত্ম-চৈতন্য পৃথক্ মনে হইলেও প্রকৃতই পৃথক্ নহে।

"ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশে লীয়তে যথা।
দেহাভাবে তথা যোগী স্বরূপে পরমাত্মনি॥"

যখন যোগীর দেহভাবনা বিদূরিত হয়, তখন তিনি পরমাত্ম-স্বরূপে তাঁহার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থিত হন।

কিন্তু এই খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রকাশ কালেও সত্তাময় ভাবের লোপ হয় না, নচেৎ প্রকাশই পাইতে পারিত না। সুষুপ্তির মোহময়ী অবস্থাতেও এই অসংখ্য খণ্ডজ্ঞান আচ্ছন্ন হইলেও সত্তার সাক্ষিত্বভাবের তখনও অভাব হয় না। জাগরণের বিলাস-বেগ ও অসংখ্য চপলতার লোপ হইলেও সুষুপ্তির বিক্ষেপরহিত যে শান্তভাব তাহার জ্ঞাতারূপেও সেই আত্মচৈতন্য জাগ্রত।

সুষুপ্তির সুখময় অবস্থায় যদি জ্ঞাতা কেহ না থাকিত, তবে জাগ্রদাবস্থায় তাহার স্মৃতি থাকিতে পারিত না। কারণ অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি থাকে। যেমন ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল রচিত কত অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দর্শনকারীর চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া রাখে, সকলে সেই সকল বস্তুকে সত্যবৎ দেখে, কিন্তু সত্য বলিয়া কেহ বিশ্বাস করে না, তদ্রূপ বহুভাবে বিকশিত এই জগৎপ্রপঞ্চ, সেই পরম ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালবিস্তার মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ তাহা মিথ্যা। এই জগদাদি প্রপঞ্চ মায়ারচনারূপে অসত্য হইলেও তাহা যে জ্ঞানরূপে প্রকাশ পায়, সেই জ্ঞান অসত্য নহে। জ্ঞান কখনই অসত্য হয় না, যাহা কিছুরই জ্ঞান হউক, জ্ঞানরূপে তাহা নিত্য সত্য। যেমন, ঘটও জ্ঞানের বিষয়, পটও জ্ঞানের বিষয়, এই দুটির মধ্যে তাহাদের যে জ্ঞান তাহা সামান্য পদার্থ, তাহা সত্য, কিন্তু ঘট ও পট মিথ্যা; তদ্রূপ জগতের প্রতি বস্তুকে বস্তুরূপে যে বোধ তাহা সত্য, কিন্তু বস্তু সত্য নহে। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা সত্য, স্বপ্নও সত্য, কিন্তু স্বপ্নের বিষয় অসত্য।

নামরূপাদিময় বস্তু মায়ারচিত, তাহা আত্মার উপাধিমাত্র। মায়ার প্রভাবেই তাহা বস্তুরূপে দৃষ্ট হয় এবং অপৃথক্ হইয়াও আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। সেই নামরূপময় উপাধি মিথ্যা।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকং।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততো দ্বয়ং।"

জগতের প্রত্যেক দৃশ্যের মধ্যে এই পাঁচটি ভাব বিদ্যমান।

তন্মধ্যে, অস্তি, ভাতি ও প্রিয়ভাব ব্রহ্মের জ্ঞাপক ; এবং নাম ও রূপ, যদ্দ্বারা এই চরাচর দৃশ্য জ্ঞাপিত হয়, তাহা মায়ার খেলা। সকল বস্তুরই নামরূপ ছাড়িয়া দিলে, তাহার যে অস্তি ভাতি ও আনন্দদায়কত্ব বর্ত্তমান থাকে তাহা ব্রহ্মরূপ। তাই জ্ঞানীরা বলেন,

"আবিস্তকং শরীরাদি দৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরম্।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলম্॥"

জলে যেমন বুদ্বুদ জল হইতে স্বতন্ত্র নয়, এবং তাহার অস্তিত্ব এতই ক্ষণস্থায়ী যে তাহার থাকা ও যাওয়া একই কথা, সেইরূপ এই শরীরাদি দৃশ্য ক্ষয়ভাবাপন্ন হওয়ায়, তাহা নাই এইরূপই মনে করিয়া লওয়া উচিত। গীতাতেও ভগবান তাই বলিলেন—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো না ভাবো বিদ্যতে সতঃ।"

অসতের অস্তিত্ব নাই, সতের অবিদ্যমানতা নাই। সুতরাং এই মায়ারচিত অনন্ত দৃশ্যপট অত্যন্ত অসত্য। কিন্তু এই দৃশ্যবর্গ অসত্য হইলেও যাহাকে আশ্রয় করিয়া এই অনন্ত দৃশ্য-তরঙ্গ সমুত্থিত বা প্রকাশিত হইতেছে—তাহা নিত্য সত্য অপরিণামী বস্তু। এই সত্য বস্তুটিই আত্মা। ব্রহ্ম, জ্ঞান, আত্মা এগুলি একেরই বিভিন্ন নাম। সমস্ত ঘটনার সাক্ষীরূপে এই জ্ঞান চিরবিদ্যমান। শৈশবে শৈশবের ঘটনাগুলিকে আত্মার সহিত একীভূত ভাবে দেখিয়া আসিয়াছি, যৌবনে যুবজন ভাব ও চিন্তা গুলিকে নিজের অস্তিত্বের সহিত অচ্ছেদ্য জড়িতবৎ দেখিয়া আসিয়াছি ; আবার এই প্রৌঢ়াবস্থা আসিয়াছে, ইহাকেও এখন আমার চৈতন্যের বিশেষ বিকাশের সহিত অভেদ ভাবে

মিলিত রূপেই দেখিতেছি। আজ আর সেই শৈশবের বা যৌবনের অবস্থাগুলি নাই, তাহারা কোন্ অতীতগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে ; কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া এই অবস্থাগুলি বিদ্যমান ছিল সেই আশ্রয়, সেই সত্তা, সেই আমি এখনও বর্ত্তমান, এখনও সেই শত শত অতীত ঘটনার ও তাহাদের স্মৃতির সাক্ষীরূপে অহং বিদ্যমান। তখন সেই অবস্থাগুলির সঙ্গে আপনাকে অবিভাজ্যরূপে যেন মিলিত দেখিয়াছিল, এখন সেই অবস্থাগুলি শুষ্ক পত্রের ন্যায় তাহা হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। আবার এখন এই প্রৌঢ়াবস্থা সেই "আমি" কে আলিঙ্গন করিয়া এক হইয়া আছে, তাহাও আবার কোন দিন ঝটিকাতাড়িত পত্রের ন্যায় কোথায় অদৃশ্য হইয়া যাইবে। এই কতশত বিবিধ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু সেই অবস্থাগুলির জ্ঞাতা বা সাক্ষী যে "আমি" তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কত অবস্থার পরিবর্ত্তন, কত বিপর্য্যয়, কত কত অবস্থাকে ভুলিয়া পর্য্যন্ত গিয়াছি, কিন্তু সেই সকল অতীত শত অবস্থার এবং এখনকার বর্ত্তমান অবস্থার সাক্ষী বা জ্ঞাতা সেই এক অখণ্ড জ্ঞানস্বরূপ আত্মা বা আমি রহিয়াছি। এই আত্মার কখনও অভাব বোধ হইল না ; কেন না আমি নাই এ বোধ কখনও কাহারও হয় না। আমি বা দেহীর যেমন জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা হয়, তেমনই দেহের বাল্য যৌবন জরা হয়। জন্ম-মৃত্যুও এইরূপ এক একটি দেহেরই অবস্থা মাত্র। সুতরাং আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি ইহাতে মুগ্ধ হ'ন না। ভগবান বলিয়াছেন—

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

এই দেহাভিমানী জীবের বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্য প্রভৃতি তিনটি অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়, উহা স্থূল দেহেরই অবস্থাত্রয়, দেহ-নিবন্ধন ইহা ঘটিয়া থাকে। কিন্তু কৌমার কাল অতিক্রম হইলে বা যৌবন অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যে সমুপস্থিত হইলে—আমিই ছিলাম, এবং আমিই আছি এই প্রত্যয়ের ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না।

স্থূল দেহের একটি অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য অবস্থার উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত 'আত্মা'র বা 'আমির' কোন সম্বন্ধ নাই। সেইরূপ দেহ নাশেও যে দেহান্তর প্রাপ্তি হয়, তাহাও লিঙ্গ-দেহ নিবন্ধন। আত্মার তাহাতে নাশ হয় না। বাল্যের সংস্কার যেমন যৌবনে থাকে, যৌবনের সংস্কার বার্দ্ধক্যে থাকে, তদ্রূপ দেহান্তরের সংস্কার দেহেতে থাকে। বাল্য গিয়া যৌবন আসিলে যেমন আমরা বিহ্বল হই না, তেমনই আত্মার স্থূল উপাধি দেহ নষ্ট হইলে জ্ঞানিগণ অভিভূত হ'ন না। আচার্য্য শঙ্কর বলিয়াছেন ঘটাদির উৎপত্তি-বিনাশে যেরূপ আকাশের উৎপত্তি বিনাশ হয় না, কারণ আকাশ নিত্য বর্ত্তমান, সেইরূপ দেহের উৎপত্তি-বিনাশ হইলেও, আত্মা-স্বরূপ আমরা বর্ত্তমান থাকিব।

এই আত্মা শরীর নহে, ইন্দ্রিয় বা মনও নহে। দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের অসংখ্য পরিণাম লাভ হইতেছে, কিন্তু আত্মা সেই সকল বিভিন্ন পরিণামের জ্ঞাতা, এই এক চিরনির্ব্বিকার পুরাণপুরুষ :—

"নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।"

ইনি নিত্য শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ। দেহেন্দ্রিয়ের জড়তা ইঁহাকে স্পর্শ বা কলুষিত করিতে পারে না :—

"অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ ॥
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্ত্বসিদ্ধং পরং প্রত্যগখণ্ডিতম্।
স্বপ্রকাশং পরাকাশং ব্রহ্মৈবাহং ন সংশয়ঃ ॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ ॥

তাই বিবেকী পুরুষ এই "অহং" বা "আমি" কে অন্বেষণ করিতে গিয়া দেখিলেন—এই মন বুদ্ধি অহঙ্কার, এই শরীর এবং তাহার বিভিন্ন আচারগুলি কিছুই "আমি" নহি। আমাকে অসতে ঘেরিয়া আছে, আমাকে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন করিয়া আছে, জন্ম মৃত্যু জরা শোকে আমাকে বিহ্বল করিয়া আছে। এই অনন্ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারচক্র যে কেন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া নিত্য বিঘূর্ণিত হইতেছে, সেই নিত্যসত্য চিরঅবিনাশী আশ্রয় কেন্দ্রই একমাত্র সদ্ বস্তু, এবং 'আমি' তাহাই। তবে কেন আমি মিথ্যা বস্তুকে আঁকড়িয়া পড়িয়া বিভীষিকা দেখিতেছি? এই অবস্থা সম্যক বুঝিবামাত্রই সে জীবত্ব পরিহার করিয়া ভূমার মধ্যে প্রবেশ করে এবং তখন এই দেহাভিমান, দৃশ্যজগৎ সমস্তই স্বপ্নের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যায়। তখন সেই সম্যক্ জাগরণের ক্ষেত্রে জীব স্থিতি লাভ করিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইয়া মুক্তকণ্ঠ বিহগের ন্যায় ঘোষণা করে :—

"মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানি নাহং
ন চ শ্রোত্রজিহ্বে ন চ ঘ্রাণনেত্রে।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ু-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্।
অপাণিপাদোঽহমবাগচক্ষু-
রপ্রাণ এবাস্ম্যমনা হ্যবুদ্ধিঃ।
ব্যোমেব পূর্ণোঽস্মি বিনির্মলোঽস্মি
সদৈকরূপোঽস্মি চিদেব কেবলঃ।
ন মেঽস্তি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধিযোগো
ন পুণ্যলেশোঽপি ন পাপলেশঃ।
ক্ষুধাপিপাসাদিষড়ূর্মিদূরঃ
সদা বিমুক্তোঽস্মি চিদেব কেবলঃ।
বাচঃ সাক্ষী প্রাণবৃত্তেশ্চ সাক্ষী
বুদ্ধেঃ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তেশ্চ সাক্ষী।
চক্ষুঃ শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াণাঞ্চ সাক্ষী
সাক্ষী নিত্য প্রত্যগেবাহমস্মি॥
দেহাভাবাৎ ন মে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ॥
অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণোহ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥
অহো চিন্মাত্রমেবাহমিন্দ্রজালসমং জগৎ।
ততো মম কথং কুত্র হেয়োপাদেয়কল্পনা॥

"যো বৈ সর্ব্বাত্মকো দেবো নিষ্কলো গগনোপমঃ।
স্বভাবনির্ম্মলঃ শুদ্ধঃ স এবাহং ন সংশয়ঃ॥"
"আত্মৈব কেবলং সর্ব্বং ভেদাভেদো ন বিদ্যতে।
অস্তি নাস্তি কথং ব্রূয়াদ্ বিস্ময়ঃ প্রতিভাতি মে॥"
"মায়াপ্রপঞ্চরচনা ন চ মে বিকারো
কৌটিল্যদম্ভরচনা ন চ মে বিকারঃ।
সত্যানৃতেতি রচনা ন চ মে বিকারো
জ্ঞানামৃতং সমরসং গগনোপমোঽহং॥"
"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥"
"যস্য সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্ত্তন্তে প্রেরিতা ইব॥"

আত্মার এই প্রকাশময় বা সত্তাময় ভাব ছাড়া আর কোন স্বরূপে তাঁহাকে বুঝিবার উপায় নাই।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥"

বাক্য দ্বারা, মন দ্বারা বা চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা এই পরমাত্মা প্রাপ্তির যোগ্য নহেন। অতএব এই আত্মা 'অস্তি' আছেন, এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত বলিতে সমর্থ—আত্মজ্ঞ আচার্য্য ব্যতীত অন্য কোথায় সেই আত্মস্বরূপকে কিরূপে লাভ করা যাইতে পারে?

"অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যস্তত্ত্বভাবেন চোভয়োঃ।
অস্তিত্যেবোপলব্ধস্য তত্ত্বভাবঃ প্রসীদতি॥"

অতএব প্রকৃতই আত্মা আছেন এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয়ের সহিত তাঁহাকে উপলব্ধি করা কর্ত্তব্য। আত্মা আছেন এইরূপ উপলব্ধিকারীর বুদ্ধিতে আত্মার প্রকৃত নিত্য চৈতন্যস্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

"যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতোভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥"

যে সমস্ত কামনা মুমুক্ষুর হৃদয় অধিকার করিয়া অবস্থিত, তাহারা বিনষ্ট হইলেই মনুষ্য এই দেহেই জন্মমৃত্যুর অতীত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়েন।

এই সত্তাময় বা প্রকাশময় জ্ঞান বস্তুটিই আমার 'আমি'। যাহা জ্ঞানস্বরূপ তাহাই 'অহং', তাহাই সত্তা এবং তাহাই প্রকাশ-স্বরূপ। যেমন জ্ঞান না থাকিলে কোন বস্তুরই প্রকাশ অসম্ভব হইত না, তেমনই 'অহং' কে বাদ দিলে কোনও জ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এই জ্ঞানই পৃথক পৃথক বস্তুরূপে প্রকাশিত। 'অহং' ও তদ্রূপ জ্ঞানের সহিত অভিন্নরূপে বিরাজিত। এই দৃশ্য বস্তুজাতও জ্ঞান বা 'অহং' হইতে পৃথক নয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে এই দৃশ্যপ্রপঞ্চের অধিষ্ঠান জ্ঞান। যেমন একটি প্রস্তরে অতীত ও অনাগত রূপে সহস্র সহস্র দৃশ্য রচিত হইতে পারে তদ্রূপ এই এক জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া ভূত-ভবিষ্যতের সমস্ত বস্তুই বর্ত্তমান আছে। এমন বস্তু নাই যাহা জ্ঞানের বিষয়

নহে; যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে সেরূপ বস্তু খুঁজিয়া পাওয়া অসম্ভব। অতএব সমস্ত বস্তুরই আশ্রয় জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান হইতে তাহারা একেবারে অভিন্ন। যখন জ্ঞান পূর্ব্বোক্ত অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকে, তখন সেই এক অখণ্ড সত্তা অসংখ্য খণ্ডখণ্ডীকৃত রূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা অসংখ্য নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। এই খণ্ডীকৃত অসংখ্য জ্ঞানের বিলয় হইয়া যখন এক অখণ্ড জ্ঞানের প্রত্যয় হয়, তখনই তাহাকে স্বরূপ-বোধ কহে।

যদি কেহ মনে করে, মায়া যখন আত্মারই স্বকীয় ভাব, তখন ইহা আত্মাকে কখনও ছাড়িয়া থাকে না, অতএব মায়াকল্পিত অনাত্মভাব তো সঙ্গের সঙ্গী, তাহা হইতে মুক্তি লাভ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? মুক্তিলাভ অসম্ভব নহে। আত্মা প্রকাশরূপ কি না, তাই ইহাকে অজ্ঞান আবৃত করিলেও, প্রকাশশীল আত্মাই আত্মার আবরণকে ও সঙ্গে-সঙ্গে আপনাকেও প্রকাশ করে। সূর্য্যকে প্রকাশ করিতে যেমন অন্য প্রকাশের প্রয়োজন নাই, সেইরূপ আত্মাই আত্মার প্রকাশক। এই প্রকাশময় আত্মাই একমাত্র সদ্ বস্তু এবং ইহাই নিখিল জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান। এই জ্ঞানের স্বরূপ বুঝিতে পারিলেই, এই জ্ঞানের আবরণ অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করা যায়। যেমন রজ্জুর স্বরূপ জ্ঞাত হইলে, রজ্জুস্থিত অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ অজ্ঞান লুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মার আবরণকারী অজ্ঞান আত্মাতেই বিলীন হইয়া যায়, এবং অজ্ঞানকল্পিত জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিময়

সংসারেরও সম্পূর্ণ বিলয় প্রাপ্তি ঘটে। যদিও এই ব্রহ্মতে তুমি-আমি অসংখ্য দৃশ্য পদার্থ সকলই ব্রহ্মসমুদ্রে বুদ্বুদের মত ফুটিয়া আছি মাত্র। কিন্তু বুদ্বুদও যেমন সেই সমুদ্র অতিরিক্ত কোন বস্তু বিশেষ নহে, সেইরূপ এই দৃশ্য পদার্থও ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে।—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই সমস্ত দৃশ্য ব্রহ্মময় হইয়া যায়।

যেমন সুবর্ণকুণ্ডলের সুবর্ণকে দেখিলে কুণ্ডলকে দেখা যায় না, তদ্রূপ ব্রহ্মকে দেখিলে আর এই জগদ্রূপকে দেখা যায় না, এবং জগৎকে দেখিলে ব্রহ্মকে দেখা যায় না। কুণ্ডল যেমন স্বর্ণের উপাধি মাত্র, পৃথক কোন বস্তু নহে, তদ্রূপ জগৎ উপাধি মাত্র, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। সেই জন্য ব্রহ্মাভ্যাস করিতে হইবে :—

ব্রহ্মচিন্তা "সর্ব্বাত্মকোঽহং সর্ব্বোঽহং সর্ব্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ

কেবলাখণ্ডবোধোঽহং আনন্দোঽহং নিরন্তরম ॥"

সেই জন্য অজস্র ব্রহ্মচিন্তা করিতে হয়। অজস্র ব্রহ্মচিন্তা দ্বারা জগৎ-জ্ঞান নষ্ট হইলে আত্মাই স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকে। ঔষধের দ্বারা যেমন রোগ নষ্ট হয় তেমনই ব্রহ্মের স্বরূপ চিন্তা দ্বারা অজ্ঞান-রোগ নষ্ট হইয়া যায়—

"এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি ভাবনাম্।

হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্ ॥

জাগ্রদাবস্থায় যেমন স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের লোপ হয়, এবং তাহাদের লোপ হেতু মন ক্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ সমাধি সাধনে

প্রবুদ্ধ ব্যক্তির আর জগদ্ভ্রম থাকে না, এবং জগৎ নাই বলিয়া তাঁহার কোন শোকও হইতে পারে না।

এইরূপ আত্মদর্শন হইতেই জীবের ভববন্ধন কাটিয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদ্ বলিয়াছেন :—

"স বা এষ এবং পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্
আত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দো ভবতি।

এই আত্মা দ্বারাই জগৎ ব্যাপ্ত। শ্রুতি বলিয়াছেন— "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।" সুতরাং সর্ব্বেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি দ্বারা যাহা কিছু অনুভূত হইতেছে তাহা ব্রহ্মই। তিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ এবং আনন্দস্বরূপ— "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।" ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ। তাঁহাতে কোন প্রকার মিথ্যা নাই, কোন প্রকার ভয় নাই, কোন পরিচ্ছেদ নাই, কোন দুঃখ নাই।

এখন প্রশ্ন আসিল যখন ব্রহ্ম ব্যতীত কোন বস্তু নাই এবং যিনি ভূমানন্দ স্বরূপ, তবে এ জগতে নিরানন্দ কেন, এ রোগ, শোক, মৃত্যু কেন? সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ নির্ব্বিকার ব্রহ্মে, এ বিকার লক্ষিত হয় কেন? ইহাই তাঁহার অঘটনঘটনপটীয়সী মায়া শক্তির প্রভাব। যাহা নাই তাহারই অস্তিত্ব দেখানো, ইহাই তো মহা ইন্দ্রজাল ; এই ব্রহ্মই যখন স্বকীয় মায়া শক্তিকে আশ্রয় করিয়া এই ইন্দ্রজালকে বিস্তার করিয়া জগৎ প্রপঞ্চ কল্পনা করেন, তখনই তিনি রসিকশেখর নটচূড়ামণি বলিয়া ভক্তের নিকট অভিহিত হ'ন। এ খেলা যে তাঁ'র কেন, তাহা কেহই

বলিতে পারে না। যেখানে পৌছিয়া এ রহস্য জানা যায়, সেখানে পৌছিলে আর কেহ ফিরিয়া আসে না, যদি বা আসে সেখানকার কথা যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না, তাহা মূকের রসাস্বাদনের ন্যায় মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য হইয়া এক অদ্ভুত রহস্যরূপে চির বর্ত্তমান আছে। তাই জ্ঞানীরা বলিলেন জগৎ কোথায়? জগৎ কেন দেখিতেছ? তোমার দিগ্‌ভ্রম হইয়াছে, রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে, তুমি যে স্বয়ং তাই। যাহাকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছ, সে যে তুমিই "তত্ত্বমসি", তুমি এবং এ জগৎ যে ব্রহ্মময়। স্বর্ণে কুণ্ডল রচিত হইয়াছে, তাই কুণ্ডল বলিয়া কোন পৃথক পদার্থ নাই, উহা স্বর্ণই। তদ্রূপ ব্রহ্মতে জগৎ কল্পিত মাত্র, উহা ভাল করিয়া জ্ঞান চক্ষু মেলিয়া দেখ, উহা ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নহে। তবে যে এই দৃশ্য জগৎ, আর এই শরীরটা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি ইহাকে নেই বলি কি প্রকারে? জ্ঞানীরা বলিলেন, দেখ ভাবনা দ্বারা সব হয়। শূন্যে অট্টালিকা দেখা যায়, আকাশে হস্তী, অশ্ব, বৃক্ষ, পর্ব্বতের চিত্র দেখা যায়, কিন্তু আসলে তারা কি সত্য বস্তু না তোমার কল্পনা? অবশ্যই স্বীকার করিবে উহা তোমার কল্পনা। সেইরূপ এই জগৎকে কল্পনায় দেখিতেছ। তুমি বৃক্ষের শাখায় নিজের হাত নিজে জড়াইয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতেছ এবং ভাবিতেছ যে, বৃক্ষ তোমাকে আটকাইয়া রাখিয়াছে। ভাবিয়া দেখ, বৃক্ষ তোমাকে কি প্রকারে আটকাইয়া রাখিবে? তুমি আপনিই বৃক্ষশাখায় আপনার

হাত জড়াইয়া ভ্রমবশতঃ কাঁদিতেছ যেন সত্যই বৃক্ষ তোমাকে আট্‌কাইয়া রাখিয়াছে।

কেবল তোমার বুদ্ধির দোষে এই অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রম হইতেছে। তুমি একবার নিজেকে নিজে ভাবিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে তুমি যে আত্মা, তুমি যে চৈতন্য, তোমাকে কি এই দৃশ্যজড়াদি আবদ্ধ করিতে পারে? এই দেহ ভ্রম। জগৎভ্রম ছুটিবে কিরূপে? তাই জ্ঞানীরা চক্ষুতে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেন—

"নাহং মাংসং ন চাস্থিনী দেহাদন্যঃ পরোহ্যহম্।
ইতিনিশ্চয়বানন্তঃ ক্ষীণাবিদ্যো বিমুচ্যতে ॥
কল্পিতৈবমবিদ্যেয়মনাত্মন্যাত্মভাবনাৎ।
পুরুষেণাপ্রবুদ্ধেন ন প্রবুদ্ধেন রাঘব ॥

হে রাঘব, অপ্রবুদ্ধ পুরুষ দ্বারাই অনাত্ম-বিষয়ে আত্ম-ভাবনা দ্বারা এই অবিদ্যাকৃত জগৎ কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞানীদের এরূপ কল্পনা নাই, সুতরাং তাঁহাদের নিকট এ জগতের অস্তিত্বও নাই। অতএব ইহাই সর্ব্বদা ভাবিতে থাক যে আমি মাংস, অস্থি বা দেহ নহি, আমি ইহার অতিরিক্ত। এইরূপ নিশ্চয়বানদের অবিদ্যা ক্ষীণ হইয়া আইসে। অবিদ্যা ক্ষীণ হইয়া আসে বটে, কিন্তু মায়াকল্পিত জগৎ-লীলা যেমন চলিতেছিল, তেমনই চলিতে থাকে; কেবল ইহা যে সত্য নহে, ইহা যে মায়া, এই বুদ্ধি দৃঢ় হইয়া যায়।

ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ কেমন ভাবে এই জগৎ ব্যাপারাদি দর্শন করিবেন, জ্ঞানগুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে তাহা উপদেশ দিলেন—

"বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্ত লোকে বিহর রাঘব॥
ত্যাক্ত্বাহংকৃতিরশ্বস্তমতিরাকাশশোভনঃ।
অগৃহীতকলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব॥"

অদ্বৈত বেদান্ত মতে ব্রহ্মে নানাত্ব কল্পিত হইতে পারে না। কারণ ভেদ ও অভেদ এ দুটি পরস্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ। ভেদ তিন প্রকার, যথা স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয়। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষশাখায় স্বগত ভেদ আছে, এবং এক জাতীয় দুইটি বৃক্ষের মধ্যে সজাতীয় ভেদ আছে এবং ভিন্ন জাতীয় দুইটি বৃক্ষের মধ্যে বিজাতীয় ভেদ আছে। ব্রহ্মের মধ্যে সেরূপ কোন ভেদ বর্ত্তমান নাই সুতরাং জগৎ ও জীব যে অন্ততঃ বৃক্ষ-শাখায় মতই কিছু হইবে তাহাও বলিবার উপায় নাই। ব্রহ্মের মধ্যে স্বগত, সজাতীয় বা বিজাতীয় কোন ভেদই নাই, সেই জন্যই তিনি "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিবার জন্য কত মত, কত সম্প্রদায়, কত না পুস্তক রচিত হইয়াছে. কিন্তু সেই অখণ্ড তত্ত্বকে কোন একটি মতবিশেষের মধ্যে আনিতে গিয়া, তাহাকে সঙ্কুচিত করা হইয়াছে, অখণ্ডিত রাখিতে কেহ পারে নাই। যাই হ'ক, লোকে আপন মতের দ্বারা তাঁহার স্বরূপ যাহাই নিরূপণ করিতে চেষ্টা করুক না, তিনি সেই চির নির্ব্বিকার, অখণ্ড সংরূপেই নিত্য কাল বর্ত্তমান আছেন; অচিন্ত্য মায়াশক্তি প্রভাবে তিনি প্রপঞ্চাকারে পরিণতবৎ দৃষ্ট হ'ন মাত্র, কিন্তু স্বরূপতঃ তিনি প্রপঞ্চাতীত। তত্ত্ববিদেরা তাঁহাকে অদ্বয়

জ্ঞানতত্ত্ব রূপে দেখেন, কেহ বা তাঁহাকে পরমাত্মা, ও কেহ বা তাঁহাকে ভগবান বলিয়া থাকেন।

নাম রূপ দ্বারাই ব্রহ্ম জড় ও মলিন বলিয়া প্রতিভাত হন, নাম-রূপকে ভুলিতে পারিলেই ব্রহ্মের স্বচ্ছ নির্ম্মল স্বরূপকে অবগত হওয়া যাইতে পারে। নাম-রূপ তো আর কোন সত্তা বস্তু নয়, সত্তাকে অবলম্বন করিয়াই নাম রূপের প্রকাশ হয়। যখন ব্রহ্ম ব্যতীত আর কোন সত্তা নাই তখন সেই ব্রহ্মাশ্রিত নাম-রূপও ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই বিবেচনা করিতে হইবে। এইরূপে জগৎ, জীব ও ব্রহ্মকে এক করিয়া জানার নামই ব্রহ্মজ্ঞান। ভাগবত বলিয়াছেন—"ইদম্ভূর্বিশ্বং ভগবানিবেতরঃ।" শ্রীধরস্বামী ইহার টীকায় লিখিয়াছেন :—"ইদং বিশ্বং ভগবান্ ইতর ইব যঃ স জীবোঽপি ভগবান্। চেতনাচেতনপ্রপঞ্চস্তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি—স এবৈকস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ।" এই জ্ঞান বিচার ও ধ্যান দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। অজস্র ব্রহ্মচিন্তনের দ্বারা, জগৎ ও জীবের জড়ভাব বিগলিত হইয়া যায় তখন শুদ্ধ চৈতন্য নির্ম্মল ব্রহ্মভাবটিই প্রকাশ পাইতে থাকে, তখন সমস্তই ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। নানাভাব থাকিতে ব্রহ্মভাব আসে না, এই জন্য সমস্ত ভাবকে ডুবাইয়া দিতে পারিলেই নির্ম্মল ব্রহ্মভাব সমুৎপন্ন হয়। বিবেকচূড়ামণিতে আছে—

"অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।
বাহ্যশব্দৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈর্নৃণাম্॥

অর্থাৎ নামরূপময় জড়াদিবর্গ যতক্ষণ ইন্দ্রিয় প্রত্যয়ের বিষয়ী-

ভূত থাকে, ততদিন বাক্য দ্বারা যতই জ্ঞানালোচনা করি না কেন, তাহা মিথ্যাড়ম্বর বই আর কিছু নহে। অনেকে মনে করিবেন, তবে জড়ত্বলাভই কি ব্রহ্মজ্ঞানের শেষ? ইহার জন্য এত সাধ্য-সাধনার কষ্ট সহ্য করিয়া লাভ কি? একটু আফিং, গাঁজা, বা মরফিয়া সেবন করিলেই তো এই অচৈতন্য ভাব আসিতে পারে। যখন শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ কিছুই রহিল না, তবে রহিল কি? কেবল শূন্য? এই শূন্য লাভের জন্যই কি এত প্রয়াস? না, তাহা নহে। সমাধি জড়তা মাত্র নহে, উহা জড়াতীত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ। উহা স্বয়ং কোন ভাব নহে বটে, কিন্তু উহা অনন্ত ভাবের পূর্ণ উৎস। সে সময় এই নামরূপময় জগতের জ্ঞান থাকে না বটে কিন্তু যে জ্ঞানের দ্বারা এই নামরূপময় জগতের জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই স্বয়ং বর্ত্তমান থাকে। কেবল তাহা বিশেষণ-রহিত, শুদ্ধ নির্ম্মল জ্ঞান। পুনঃ পুনঃ তত্ত্ববিচার দ্বারা বৈরাগ্যোদয় হয়, এবং সেই বৈরাগ্য হইতে নির্ম্মল শারদ জ্যোৎস্নার মত জ্ঞানের নির্ম্মল কৌমুদীর বিকাশ হয়। তত্ত্ববিচার ও সম্যক বৈরাগ্যই ব্রহ্মজ্ঞানের হেতু। তত্ত্ববিচার দ্বারা জ্ঞানের উদয় হয় বটে, কিন্তু সেই জ্ঞানের পরিস্থিতি নির্ভর করে, সম্যক্, বৈরাগ্য ও সাধনের উপর। শম দম, তিতিক্ষা, উপরতি, এই সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা ধারণা সম্যক্ দৃঢ় হয়। নচেৎ ছিদ্রযুক্ত পাত্রে যেমন জল থাকিতে পারে না, তদ্রূপ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন না হইলে জ্ঞানের ধারণা দৃঢ়ভূমি লাভ করিতে পারে না। পুনঃ পুনঃ বিষয় আসিয়া বিক্ষেপ জন্মাইতে থাকে। একবার যাহা

ধারণা হইল, তাহা পুনঃ পুনঃ বিচারের দ্বারা ধারণা করিতে হইবে, একবার যে স্থিতিলাভ হইল সাধনার দ্বারা সেই স্থিতিকে সম্যক আয়ত্ত করিয়া লইতে হইবে, নচেৎ এ অত্যন্ত সূক্ষ্মতত্ত্ব ধারণ করা কঠিন :—

> "অতীত সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং
> ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
> সমাধি নাত্যন্ত সুসূক্ষ্ম বৃত্ত্যা
> জ্ঞাতব্যমার্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥'

ভাগবতে আছে :—

> 'সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং
> যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
> সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
> হ্যধোক্ষজো মে মনসা বিধীয়তে ॥"

মহাদেব পার্ব্বতীকে বলিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধসত্ত্বই বসুদেব, এবং সেই বিশুদ্ধ সত্ত্বেই পরম পুরুষ বাসুদেব প্রকাশিত হন। এই জন্য আমি মন দ্বারা ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান বাসুদেবের সর্ব্বদা ধ্যান করিয়া থাকি। অতএব সেই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বই বাসুদেব।

সেই পরম জ্ঞানস্বরূপ যিনি ইন্দ্রিয়াতীত হইয়াও জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা রূপে ইন্দ্রিয় জ্ঞানগম্য হইয়াছেন সেই জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মকে নমস্কার।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রহ্মবিদ্যা

যোগাভ্যাস

"নাস্তি যোগসমং বলং"—যোগবলের তুল্য আর বল নাই। এই বল কিসের জন্য প্রয়োজন এবং তাহা কোথায় প্রয়োগ করিতে হইবে তাহাই দেখিতে হইবে। সুচিকিৎসক যেমন রোগীর রোগনির্ণয় করিয়া তাহার নিবারণের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করেন, এবং রোগ নিবারিত হইলে যে সকল স্বাস্থ্যলক্ষণ রোগমুক্ত শরীরে প্রকটিত হয়, তাহা সম্যক্ বুঝাইয়া দেন, তদ্রূপ ভবব্যাধির চিকিৎসক প্রাচীন ঋষিরা রোগের লক্ষণ ও স্বাস্থ্যের লক্ষণ এবং রোগনিবারণের উপযোগী ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া ভবরোগকাতর জীবের ত্রাণের উপায় করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অসম্যক্ জ্ঞান ও ভ্রান্তদৃষ্টি বশতঃই জীবের বন্ধনদশা প্রাপ্তি হইয়াছে এবং অজ্ঞান হেতু পুনঃ পুনঃ সংসারে যাতায়াত, জন্মমরণ প্রভৃতি বিবিধ ক্লেশ ও তাপ ভোগ— ইহাই দুঃখময় সংসারের চিরন্তন ইতিহাস, ইহাই ভবরোগ। আমরা সকলেই এই রোগাক্রান্ত জীব। ভ্রান্তদৃষ্টি ও অসম্যক্ জ্ঞানই এই রোগের হেতু, সুতরাং সম্যক্ জ্ঞান ও অভ্রান্ত দৃষ্টিই, এই ভবরোগের মহা মহৌষধ। ভ্রান্তি, আসক্তি, ক্লেশ, বিক্ষিপ্ত-

চিত্ততা, অধৈর্য্য, এই গুলি রোগের লক্ষণ। তাই পরম কারুণিক ভিষক্‌প্রবর মহর্ষি পতঞ্জলি বলিলেন—"বিবেকখ্যাতি রবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" অবিপ্লবা বিবিকখ্যাতিই হানের উপায়, অর্থাৎ সেই বিশুদ্ধ জ্ঞান যখন মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা অবিপ্লাবিত হয়, অর্থাৎ ভগ্ন না হয়,—যে পরমজ্ঞান ও বিবেক-বৈরাগ্যের আর চ্যুতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না—যাহার বলে মিথ্যাজ্ঞান দগ্ধবীজবৎ হইয়া যায়—তাহাই প্রকৃত মুক্তির উপায়। ইহা কিরূপে লাভ করিতে হইবে? "যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেক-খ্যাতেঃ।"—বিবেকখ্যাতিই হানোপায় বলিয়া সিদ্ধ হইল, কিন্তু সাধন ব্যতীত তো সিদ্ধি হয় না, তাই বলিতেছেন যোগাঙ্গা-নুষ্ঠান হইতে অশুদ্ধিক্ষয় হইলে বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত জ্ঞান দীপ্তি হইতে থাকে। কর্ম্ম ও সংস্কার অজ্ঞানমূলক। যেমন সাধনসমূহের অনুষ্ঠান করা যায় সেইরূপ অশুদ্ধি ক্ষীণত্ব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহা ক্ষীণ হইয়া থাকে, এবং অশুদ্ধির ক্ষীণতার সহিত জ্ঞানদীপ্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। চিত্তে যে অবিশ্রান্ত বৃত্তির উদয় হইতেছে ইহাই অজ্ঞান সংসার সমুদ্রের দুরিতক্রম্য ভয়াবহ বিক্ষোভিত বীচিমালা। ইহার যেন আর পার নাই। এই আসিতেছে, এই আসিতেছে, নিবৃত্ত হইবার নামটি নাই। দেহে মিথ্যাভিমানকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া মোহের আবর্ত্ত সৃষ্ট হইতেছে—যে তাহাতে পড়িতেছে, সেই তলাইয়া যাইতেছে। ইহাই চিত্তের অসমাহিতাবস্থা। সমাহিতাবস্থা দ্বারাই চিত্তের নির্ম্মলতা ও প্রশান্ত ভাবের উদয় হয়, তখনই দিব্যজ্ঞানের

আবির্ভাব হয়, যাহা মন্দাকিনীর পূতধারার ন্যায় জগৎকে পবিত্র ও নির্ম্মল করে। এইসম্যক্ দৃষ্টি দ্বারা সংসারের অবিশুদ্ধ ও ক্লেশদায়ক অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলে, তাহা হইতে যে চিত্তের বিরতি, তাহাই বৈরাগ্য।)

এই বৈরাগ্যোদয়ে আর সংসারের কাম্য বস্তুর প্রতি লোলুপতা থাকে না, সুতরাং চিত্তে বিবিধ বৃত্তিরও সমুদ্ভব সম্ভব হইতে পারে না। এই জন্যই মহর্ষি বলিলেন– "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ। এই নিরোধের কি ফল তাহা ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—"যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্, কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি, নিরোধাভিমুখং করোতি।"—অর্থাৎ যে সমাধি একাগ্রভূমিক চিত্তে সমুদ্ভূত হইয়া সৎস্বরূপ অর্থকে খ্যাপিত করে, অবিদ্যাদি ক্লেশ সকলকে ক্ষীণ করে, কর্ম্মবন্ধনসমূহকে শিথিল করিয়া দেয় এবং নিরোধাবস্থাকে লইয়া আসে—তাহাই প্রকৃত যোগ। যোগাঙ্গ গুলি কি কি?

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-
ধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি॥"

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই আটটি যোগাঙ্গ। এই সকল যমনিয়মাদির সম্যক্ আচরণে অদ্ভূত শক্তি সকল লাভ হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ এখানে বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। দুই একটি বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করিব। যোগের দ্বিতীয়াঙ্গ নিয়মসমূহের

মধ্যে ঈশ্বরপ্রণিধান অন্যতম। ইহার দ্বারা সুখে সমাধি সিদ্ধ হয়। "সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ।" (সর্ব্বভাব ঈশ্বরে সমর্পিত হইলে সমাধি সিদ্ধি হয়।) ঈশ্বরপ্রণিধান সাক্ষাৎ-ভাবে সমাধির সহায় হয়। অন্য বিষয়ে চিত্ত ধারণা ও ধ্যান দ্বারা নিরুদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিপূর্ব্বক শ্রদ্ধালুচিত্তে ভগবদ্রূপ বা গুণ ধারণা করিতে করিতে চিত্তের আনন্দ ও আগ্রহ এতদূর বর্দ্ধিত হয় যে শীঘ্রই তাদৃশ ভক্তের ঈশ্বরাভিমুখ বৃত্তিপ্রবাহের একতানতা হয় এবং তাঁহার অচিরকাল মধ্যেই সমাধি সিদ্ধ হয়। জগদ্‌গুরু ভগবানে ভক্তিযুক্ত হইলে তিনিও যোগীর প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁহার অভিধ্যান হইতেও যোগীর সমাধি এবং তৎফল বৈরাগ্য লাভ হয়। ভগবান্ গীতাতেও তাই বলিয়াছেন—

"চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।"

যোগাঙ্গ গুলির মধ্যে "প্রাণায়াম" একটি অন্যতম অঙ্গ হইলেও, ইহাই যোগীদের প্রধান সাধনা। যোগশাস্ত্রে আছে "চলে বাতে চলচ্চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ", যতক্ষণ প্রাণবায়ু চঞ্চল থাকিবে ততক্ষণ মনবুদ্ধিকে স্থির করা কঠিন। প্রাণ স্থির হইলে ইহারাও স্থির হয়। চিত্ত প্রসন্ন বা নির্ম্মল হইলে তাহা একাগ্র হইয়া স্থিতিপদ লাভ করে। কিন্তু মন কেন প্রসন্ন হয় না, কেন সে স্থির হইতে পারে না, কেন সে বহুবিধ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া অনন্ত দুঃখের ভাগী হয়? তাহার কারণ

দেহান্তর্ব্বর্ত্তী সহস্র সহস্র বাসনাবেগময়ী নাড়ী ঐ সকল চিত্তস্থিত সংস্কারগুলিকে কম্পিত করে এবং উহাদের অবিচ্ছিন্ন কম্পনে বাসনাবেগ প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহারা প্রত্যেকেই যেন এক একটি বাসনার সাঙ্কেতিক কেন্দ্র। কোন প্রকারে একটু সঙ্কেত পাইলেই, তাহার নিরন্তর গতি হইতে থাকে, এবং নাড়ীমুখী গতি হইতে বাসনা হিল্লোলিত হইতে থাকে। (তাই বাসনারও বিরাম নাই, বুদ্ধির ও অবসর নাই। নাড়ীসমূহ যে বাসনাময়, এবং তাহারা এক-একটি বাসনার প্রবাহিকা তাই চৌরাশি লক্ষ নাড়ী চৌরাশি লক্ষ বাসনার আধার এবং ইহা হইতেই চৌরাশি লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ হইতেছে। এই সকল নাড়ীপ্রবাহের প্রধান উৎস প্রাণশক্তি। এই প্রাণগতিকে যদি বিশুদ্ধ করিতে পারা যায়, তবে লক্ষ লক্ষ নাড়ীপ্রবাহ ও শুদ্ধ হইয়া যাইবে। ইহারই নাম প্রাণ শোধন বা প্রাণায়াম।) মনু বলিয়াছেন—"প্রাণায়ামৈর্দহেদ্দোষান্" প্রাণায়াম দ্বারা শরীরস্থ ধাতুর মল অপগত হইয়া যায়—

"দহ্যন্তে ধ্মায়মানানাং ধাতূনাং হি যথা মলাঃ
তথেন্দ্রিয়াণাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ।"

অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত হইলে ধাতুর মল সকল যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়।

মহর্ষি পতঞ্জলিও তাই যোগদর্শনে বলিলেন—

"প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য"

প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণের দ্বারাও চিত্ত স্থিতি লাভ করে।

এই প্রাণরোধের কি ফল তাই মহর্ষি বলিলেন :—

"ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।" পাদ, সাধন ৫২

প্রাণায়াম-অভ্যাসকারী যোগীর বিবেকজ্ঞানের আবরণভূত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ভাষ্যকার ব্যাসদেব বলিলেন "তদস্য প্রকাশাবরণং কর্ম্ম সংসারনিবন্ধনং প্রাণায়ামাভ্যাসাৎ দুর্ব্বলং ভবতি, প্রতিক্ষণং ক্ষীয়তে। তথা চোক্তং তপো ন পরং প্রাণায়ামাৎ, ততো বিশুদ্ধির্মলানাং, দীপ্তিশ্চ জ্ঞানস্যেতি।" মহামোহময় ইন্দ্রজাল আমাদের প্রকাশশীল সত্ত্বকে আবৃত করিয়া আমাদিগকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে; সংসারের হেতুই এই প্রকাশাবরণ, ইহা প্রাণায়ামাভ্যাসে দুর্ব্বল হয়, আর প্রতিক্ষণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে —'প্রাণায়াম হইতে শ্রেষ্ঠ তপস্যা আর নাই, তাহা হইতে মল সকলের বিশুদ্ধি এবং জ্ঞানের দীপ্তি হয়।' এইরূপেই যোগী রাগদ্বেষ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া প্রসাদ অর্থাৎ শান্তি লাভ করেন, এবং প্রসাদ লাভ করিলে যোগীর সর্ব্বদুঃখ নাশ হয়, আর প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি আশু প্রতিষ্ঠিত হয়।—

"প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশুঃ বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে॥"

"প্রসন্নচেতসঃ স্বস্থান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ

পর্য্যবতিষ্ঠতে আকাশমিব পরি সমন্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপে-
ণৈব নিশ্চলীভবতি।”—শঙ্কর।

(প্রসন্নচিত্তের বুদ্ধি আকাশের ন্যায় চতুর্দ্দিকে অবস্থান করে
ও আত্মস্বরূপে নিশ্চল হয়।)

চিত্ত নির্ম্মল হইলে সকল বস্তুরই প্রকৃত প্রতিবিম্ব তাহাতে
পতিত হয়। যাহা সত্য, যাহা মিথ্যা, যাহা হিতকারী, যাহা
অপকারী, চিত্ত তখন এ সমস্তই উত্তমরূপ বুঝিতে পারে। মলিন-
চিত্ত ব্যক্তি অনেক দুঃখকর বিষয়কে সুখের সামগ্রী বোধে গ্রহণ
করিয়া অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তির
এরূপ ভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এজন্য কোন প্রকার দুঃখ
তাঁহাকে আশ্রয় করে না। নির্ম্মলচেতার ব্রহ্মবোধিনী বুদ্ধি
মায়িক পদার্থমাত্রেই অনভিরুচি বশতঃ আত্মাতে স্থিতি করিতে
থাকে। এই স্থিতিপদকে যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রাণ নিরুদ্ধ
হইলে লাভ করা যায়। “নিষ্কলং তং বিজানীয়াচ্ছ্বাসো যত্র লয়ং
গতঃ।” এই শ্বাস যেখানে লয় হয় তাহাই নিষ্কল অবস্থা।
বিষ্ণুপুরাণে আছে :—

“প্রাণায়ামেন পবনৈঃ প্রত্যাহারেণ চেন্দ্রিয়ৈঃ
বশীকৃতৈস্ততঃ কুর্য্যাৎ স্থিরং চেতঃ শুভাশ্রয়ে।”

প্রাণায়াম দ্বারা পবনকে ও প্রত্যাহার দ্বারা ইন্দ্রিয় সকলকে
বশীভূত করিয়া অনন্তর শুভাশ্রয় ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা
সম্পাদন করিবে। এই প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা কুম্ভক অর্থাৎ শ্বাস
স্থির হয়। গীতাতে যজ্ঞ সমূহের মধ্যে ইহাকে অন্যতম যজ্ঞ বলিয়া

ভগবান ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী গীতার টীকায় বলিয়াছেন—"কুম্ভকে হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি, তত্রৈব লীয়মানেষ্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভবেয়ন্তীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ কুম্ভকের সময় সমস্ত প্রাণ এক হইয়া যায়—অর্থাৎ তাহাদের বিবিধ গতি একমুখী হয়—তাহারই মানে প্রাণ স্থির হওয়া। প্রাণ স্থির হইলে—ইন্দ্রিয়রাও স্থির হইতে বাধ্য। সুতরাং প্রাণায়াম দ্বারা কুম্ভকাগ্নিতে—ইন্দ্রিয় সমূহের যে হোম হইল, তাহাও এক অপূর্ব্ব যজ্ঞ। যোগশাস্ত্রে আছে

যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ।
বায়ু বাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা॥

"কিরূপে মনের শান্তি লাভ হয়"—শ্রীরাম চন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিতেছেন—"দ্বিবিধ উপায়ে মনের শান্তি সম্পন্ন হয়। প্রথম জ্ঞান, দ্বিতীয় যোগ। তন্মধ্যে তত্ত্বদর্শনকে জ্ঞান ও প্রাণাদিবৃত্তি রোধকে যোগ বলে।"

বশিষ্ঠ কহিলেন—"যে বায়ু দেহান্তর্ব্বর্ত্তী সহস্র নাড়ীতে সঞ্চরিত হয়, তাহার নাম প্রাণ। এই প্রাণ, ক্রিয়া ভেদে অপানাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত এবং ইহা স্পন্দিত হইলে, অন্তরে যে কল্পনোন্মুখী সম্বিৎ সমুদ্ভূত হয়, তাহার নাম চিত্ত। * * সুতরাং প্রাণস্পন্দ রোধ করিলেই চিত্তের শান্তি হয় এবং চিত্ত শান্ত হইলে জগতের লয় হইয়া থাকে।

যোগ সাধনের উপায়।

বশিষ্ঠ কহিলেন শাস্ত্র, সৎসঙ্গ ও বৈরাগ্যরূপ যোগদ্বারা সংসারে অনিচ্ছা জন্মিলে, মন একমাত্র ব্রহ্মধ্যানে ব্যাপৃত হয়, ঐরূপ

প্রাণায়ামাদি যোগভ্যাসের ফল। প্রাণরুদ্ধ করা যায় কিনা?

ধ্যানযোগের গাঢ়তা অভ্যাস হইলে, প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। * * প্রাণায়াম অভ্যস্ত হইলে, যে ঘনতর ধ্যানযোগ উৎপন্ন হয়, তৎপ্রভাবেও প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারেনা। ওঙ্কারোচ্চারণ সমুত্থিত শব্দদ্বারা সম্বিদ সুষুপ্ত হইলেও প্রাণ আর স্পন্দিত হইতে পারে না। অভ্যাস সহায়ে প্রাণকে তালু হইতে দ্বাদশাঙ্গুল ঊর্দ্ধে ব্রহ্মরন্ধ্রে আনয়ন করিয়া সম্বিদ রোধ করিলে প্রাণ আর স্পন্দিত হয় না। যিনি কুম্ভকাদি অভ্যাস করেন, বাহ্যবিষয়ে কথন তাঁহার মনকে আকর্ষণ করিতে পারে না। কুম্ভকাদি সহায়ে মনকে বাহ্যবিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিতে সমর্থ হইলে স্বল্প সময়ের মধ্যেই পরমপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়।”

অন্যান্য শাস্ত্র ও পুরাণাদির মন্তব্যঃ—

অগ্নি পুরাণে ঃ—“আকেশাদানখাগ্রাচ্চ তপস্তপ্যন্ সুদারুণং।

আত্মানং শোধয়েদ্ যস্তু প্রাণায়ামৈঃ পুনঃ পুনঃ॥

সর্ব্বদোষহরঃ প্রোক্তঃ প্রাণায়ামোদ্বিজন্মনাং।

ততস্তভ্যাধিকোনাস্তি তপঃ পরম সাধনং॥”

মহর্ষি বোধায়ন ঃ—“এতদাদ্যং তপঃশ্রেষ্ঠমেতদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণং।

সর্ব্বদেবোপকারার্থমেতদেব বিশিষ্যতে॥”

এই প্রাণায়ামই আদি এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তপস্যা ও ধর্ম্ম, দেবতাগণও প্রাণায়াম দ্বারাই উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহর্ষি অত্রি ঃ—“কর্ম্মনা মনসা বাচা যদহ্না কুরুতে স্বয়ং।

আসীনঃ পশ্চিমাং সন্ধ্যাং প্রাণায়ামৈস্তু শুধ্যতি॥”

বৃহদ্বিষ্ণু :— "প্রাণায়ামাণ্ দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বপাপাপনুত্তয়ে।
দহ্যন্তে সর্ব্বপাপানি প্রাণায়ামৈ দ্বিজস্বতু ॥"

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য :—"যদহ্না কুরুতে পাপং কর্ম্মনা মনসা গিরা।
ত্রৈকাল্যসন্ধ্যাকরণাৎ প্রাণায়ামৈর্ব্যপোহতি ॥"

ভগবদ্গীতা, :—"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপান গতীরুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারা প্রাণান প্রাণেষু জুহ্বতি ॥"

(কামনা স্বয়ং বলিয়াছেন যে নির্ম্মমতা ও যোগাভ্যাস ভিন্ন কেহই আমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না।) মহাভারত অশ্বমেধ।

রজঃ ও তমোগুণ নাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানই যোগ।

"যোগবলই মুক্তি লাভের অদ্বিতীয় উপায়।" যোগ-ধর্ম্ম ব্রহ্ম স্বরূপ ও সমুদয় ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এই ধর্ম্ম দ্বারাই মোক্ষ লাভ হইয়া থাকে।" পণ্ডিতেরা দ্রব্যাদি ত্যাগের নিমিত্ত যজ্ঞাদি কার্য্য, ভোগ-ত্যাগের নিমিত্ত ব্রত; সুখ ত্যাগের নিমিত্ত তপস্যা; ও সমুদয় ত্যাগের নিমিত্ত যোগসাধন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। সর্ব্বত্যাগই ত্যাগের পরাকাষ্ঠা। মহাত্মারা দুঃখ নিবারণের নিমিত্ত সর্ব্বত্যাগের পথ স্বরূপ যোগ বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া গিয়াছেন।

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে :—

'যতো বিশ্বং সমুদ্ভুতং যেন জাতঞ্চ তিষ্ঠতি।
যস্মিন সর্ব্বানি লীয়ন্তে জ্ঞেয়ং তদ্ব্রহ্মলক্ষণৈঃ,
সমাধিযোগৈস্তদ্বেদ্যং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিভিঃ।'

মাকড়শার জালের ন্যায় এই প্রাণধারা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত নাড়ী প্রবাহের মধ্যে এই প্রাণ প্রতি নিয়ত স্পন্দিত হইতেছে. এবং সহস্র বাসনা তাহা হইতে সমুত্থিত হইতেছে। যত দিন এই প্রাণ প্রবাহ নির্ম্মল না হয়, ততদিন বাসনা শুদ্ধি হইতে পারে না। প্রাণায়ামের দ্বারা এই প্রাণ প্রবাহ নির্ম্মল ও স্থির হইলে জীব নিষ্পাপ হইয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করে। (প্রয়াণ সময়ে এই নাড়ী প্রবাহ যাহার যত নির্ম্মল থাক, তাহার তদনুযায়ী উচ্চগতি লাভ হয়।) এই নাড়ী সমূহের সহিত লোক লোকান্তরের সম্বন্ধ ও যোগ আছে, যিনি যত বেশী প্রাণকে স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন, হৃদয়স্থ ব্রহ্মনাড়ী তাঁহার সেই পরিমাণে পরিস্ফুট হয়। মৃত্যুকালে এই ব্রহ্মনাড়ীর মুখ খুলিয়া গেলেই ব্রহ্মলোকে গতি হয়।

কঠোপনিষৎ বলিতেছেন

"শতঞ্চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্য
স্তাসাং মূর্দ্ধানমভি নিঃসৃতৈকা।
তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি
বিষ্বঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি ॥"

হৃদয় হইতে উদ্ভূত একশত এক নাড়ী আছে, তাহাদিগের একটী অর্থাৎ সুষুম্না নাড়ী মূর্দ্ধদেশে অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্রের অভিমুখে নির্গত হইয়াছে। মৃত্যুকালে মনুষ্য তদ্দ্বারা উর্দ্ধে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। নানাবিধ গতিদায়িনী অন্য একশত নাড়ী আছে, দেহত্যাগ কালে সেই সকল পথ দ্বারা দেহ হইতে বহির্গত হইলে

বিভিন্ন লোকে গমন পূর্ব্বক সুখদুঃখাদি ভোগ করে এবং জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া থাকে।

বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা, বক্তা ও সনাতন ধর্ম্মপ্রচারক পরমহংস ৺শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় তাঁহার গীতার্থ সন্দীপনীর অবতরনিকায় লিখিয়াছেন—"অবিদ্যা বিনষ্ট হইলেই সাধকের ভ্রম, সংশয় ও জন্মান্তর প্রাপ্তির হেতু সঞ্চিত কর্ম্মরাশি অপগত ও আত্মসাক্ষাৎকার সিদ্ধ হইবে। কিন্তু প্রারব্ধ বাসনা সহজে ক্ষয় হয় না, এজন্য আত্মসংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান, ও সমাধির নিতান্ত প্রয়োজন এবং যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ও প্রত্যাহার এই পাঁচটিই এতৎ মহাসংযম সাধনের প্রধান অঙ্গ। বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ যোগাচার্য্য ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বৈশেষিক দর্শনের প্রথমসূত্রের ব্যাখ্যাকালে বলিয়াছেন—"ক্রিয়া (প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গানুষ্ঠান) দ্বারা চিত্ত সংযত হয়; চিত্ত ও মন এক হ'লে বুদ্ধি স্থির হয়, বুদ্ধি স্থির হ'লে মন পরাবুদ্ধিতে যায়, তখন সুখেতে ব্রহ্মকে সর্ব্বপ্রকারে স্পর্শ করায় অভ্যুদয় হয়। অর্থাৎ যাহা জীবনের চিরন্তন লক্ষ্য সেই পরম সুখের প্রাপ্তি দ্বারা পরমৈশ্বর্য্য লাভ হয়, এবং যাহা পাইলে এই সংসারের যাবতীয় ঐশ্বর্য্যকে তুচ্ছ বোধ হয়। ৺প্রসিদ্ধ আচার্য্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় বলিয়াছেন "শ্বাস প্রশ্বাসে নাম করিতে পারিলে অহঙ্কারাদি সমস্ত নাশ হইয়া যায়। এমন কোন কল কৌশল নাই যে হাতে হাতে মুক্তি পাইবে। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করাই সাধন, তাহাতে কামাদি সমস্ত রিপুর বিনাশ হইবে। প্রেম,

বর্ত্তমান যুগের প্রসিদ্ধ সাধকদিগের মন্তব্য।

ভক্তি, পবিত্রতা আসিবে। শ্বাস-প্রশ্বাসে জপদ্বারা বর্ত্তমান পাপরাশি চলিয়া গেলেই তাঁহার দর্শন লাভ হয়।

যোগাঙ্গের প্রত্যাহার সম্বন্ধে কিছু বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব।

'স্ববিষয়াসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ।' যোগদর্শন সাধন পাদ।

স্ব স্ব বিষয়ে অসংযুক্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণেরও চিত্তস্বরূপানুকারের ন্যায় অর্থাৎ চিত্তনিরোধে চিত্তের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও নিরুদ্ধ হইয়া যাওয়াই প্রত্যাহার। পূজ্যপাদ ভাষ্যকার ইহার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন "যথা মধুকররাজং মক্ষিকা উৎপতন্তমনুৎপতন্তি, নিবিশমানমনুনিবিশন্তে, তথেন্দ্রিয়াণি চিত্তনিরোধে নিরুদ্ধানি, ইত্যেষ প্রত্যাহারঃ"—অর্থাৎ যেমন উড্ডীয়মান মধুকররাজের পশ্চাতে অন্যান্য মক্ষিকারা উড্ডীন হয়, এবং সেই মক্ষিকা যথায় বসে, অন্যান্য মক্ষিকারাও তথায় বসে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণ চিত্ত নিরোধে নিরুদ্ধ হয়। ইহাই প্রত্যাহার।

এই প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা সাধকের পক্ষে অত্যন্ত বেশী। ইন্দ্রিয়রা স্ব স্ব বিষয় গ্রহণশীল। তাহারা যতক্ষণ বিষয় গ্রহণে নিযুক্ত থাকিবে, ততক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ করা অসাধ্য। এইজন্য বিচার দ্বারা বিষয় গ্রহণ যে হেয় ও প্রকৃত আনন্দের প্রতিবন্ধক তাহা স্থির করা কর্ত্তব্য। পরে কোন একটী লক্ষ্যে চিত্তকে বাঁধিবার প্রযত্ন করিতে হয়, অথবা ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে দূরে থাকিতে হয় বা তাহাকে কোন আধ্যাত্মিক দেশে নিরুদ্ধ করিতে হয় অথবা

ভগবানের কোন একটী বিশেষরূপ বা ভাবে মগ্ন থাকিবার অভ্যাস করিতে হয়।

সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করিলে বা বহু বিষয়ে চিত্তকে ব্যাপৃত রাখিলে প্রত্যাহার হয় না। প্রত্যাহার করিতে না পারিলে ইন্দ্রিয়ের বশ্যতা অবশ্যম্ভাবী। (মহামুনি জৈগীষব্য বলিয়াছেন একাগ্র চিত্ত হইলে যে ইন্দ্রিয়গণের বিষয় গ্রহণে অপ্রবৃত্তি হয় তাহাই ইন্দ্রিয় জয়।) বিচার দ্বারা হেয় উপাদেয় স্থিরীকৃত করিতে পারিলে দৃষ্টাদৃষ্ট সকল প্রকার বিষয় গ্রহণেই চিত্তের অনাস্থা জন্মে। এইরূপে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই চিত্ত এক অবিনাশী চিরসত্য পদার্থে পূর্ণ স্থিতি লাভ করে। সেই জন্য মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনে দেখাইয়াছেন।

"স তু দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্যসৎকার সেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।"

অর্থাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তর তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্যও তত্ত্বজ্ঞান শ্রদ্ধা সহকারে সম্পাদিত হইলে অভ্যাস দৃঢ়ভূমি হয়, অর্থাৎ বুথান সংস্কারের দ্বারা ঐরূপ দৃঢ়াভ্যস্ত অভ্যাস শীঘ্র অভিভূত হয় না। এইজন্যই পুনঃ পুনঃ চিত্তকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া তাহাকে লক্ষ্যাভিমুখে পরিচালিত করিতে হইবে। এইরূপ চেষ্টার ফলেই প্রত্যাহার সহজ হইয়া আইসে। (মনকে ইচ্ছামত আকাশবৎ স্বচ্ছ করিতে পারিলে তবে প্রত্যাহার পূর্ণতা লাভ করে।)

যোগাভ্যাসীকে যম নিয়ম সাধন করিতেই হইবে, নচেৎ যোগফল লাভ একেবারেই অসম্ভব। ইন্দ্রিয় গুলি দুই প্রকারের, অন্তর ও বাহ্য। বিচার ও বৈরাগ্যভ্যাস দ্বারা অন্তরেন্দ্রিয় (মন, বুদ্ধিকে) সংযত করিতে হইবে।

যম, নিয়ম।

ভক্তি ও ইহার প্রধান সহায়। মনন হইতে ধ্যান হয়। ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা মন বুদ্ধি সংযত হয়। কিন্তু বিষয় চিন্তা থাকিলে ধ্যান যে জমিতেই দিবে না, এইজন্যই বিচারের আশ্রয় সর্ব্বদা লইতে হইবে। বহিরিন্দ্রিয় গুলি দুই শ্রেণীর কর্ণ (শব্দ) ত্বক (স্পর্শ) চক্ষু (রূপ), জিহ্বা (রস) এবং নাসিকা (গন্ধ) ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পানি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়। কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজেই শান্ত করা যায়। কিন্তু মন বুদ্ধি শান্ত না হইলে, ইহারা প্রকৃত প্রশান্ত ভাব ধারণ করিতে পারে না। এইজন্য অন্তরেন্দ্রিয়কেই প্রথম সংযত করিবার চেষ্টাই প্রধান সাধনা।

যোগনিষ্ঠের আচরণ, আহার ও নিদ্রার সংযম গীতা।

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতোনৈবচার্জ্জুন ॥
যুক্তাহার বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্যকর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥

যিনি অধিক ভোজী বা নিতান্ত অনাহারী অতি নিদ্রাশীল বা অতি অনিদ্র ব্যক্তির, হে অর্জ্জুন যোগ সমাধি লাভ হয় না। আহার নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি বিষয়ে যিনি নিয়ত, অর্থাৎ যথেচ্ছাচারী নহেন, সেই ব্যক্তিরই যোগ দুঃখ নিবর্ত্তক হয়, অর্থাৎ সমাধিসিদ্ধির দ্বারা ব্রহ্ম বিদ্যার বিকাশ হয়।

'স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্নচেতসা।'

সেই যোগ অধ্যবসায়ের সহিত (অর্থাৎ হবেই হ'বে, হৃদয়ে এই দৃঢ় নিশ্চয় থাকা চাই) হৃদয়কে অবসাদ শূন্য করিয়া (অর্থাৎ

যোগে সিদ্ধি হইবে কি না হইবে এই সন্দেহ হইলে প্রযত্নের শিথিলতা আসিতে পারে) ইহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

সংকল্প হইতে উৎপন্ন যে সমস্ত যোগের প্রতিকূল কামনা তাহা নিঃশেষে ত্যাগ করিতে হইবে (সংকল্প আসিলেই কামনা জাগিয়া উঠিবে, বিক্ষিপ্ত চিত্তে যোগ লাভ অসম্ভব অতএব সংকল্প করিব না এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া) চতুর্দ্দিকে ধাবমান ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করিয়া (বিষয়ে দোষ দর্শন না করিলে বিষয়-লোলুপ চিত্ত বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবেই, সুতরাং সতর্কতার সহিত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মনকে গুটাইয়া লইয়া আত্মস্থ করিতে হইবে) এবং ধৈর্য্যসম্পন্ন বুদ্ধিদ্বারা (পূর্ব্বাভ্যাস ও সংস্কারবশতঃ মন যদি অধৈর্য্য হইয়া পড়ে,আমারদ্বারা হইবে না বলিয়া হাল ছাড়িয়া না দিয়া) ধীরে ধীরে তাহাকে নিরুদ্ধ অর্থাৎ আত্মস্থ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এবং মনকে আত্মসংস্থ অর্থাৎ আত্মাতে নিশ্চল করিয়া উপরতি অবলম্বন করিবে, আর অন্য কিছু চিন্তা করিবে না। যেমন মনুষ্য জাগ্রদাবস্থায় বিষয়সমূহ দর্শন করে, তন্দ্রা আসিলে, বিষয় সমূহকে অস্পষ্ট দর্শন করে, এবং স্বপ্নাবস্থায় অত্যন্ত অসংলগ্নও ক্ষীণভাবে মনেমনে বিষয়ের অনুশীলন করে কিন্তু দেখে না, আবার সুষুপ্তাবস্থায় বিষয় সমূহকে কিছুই স্মরণ করে না, তদ্রূপ সাধককে প্রথম নিজ মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত

করিয়া আত্মস্থ করিতে গেলেই নিদ্রালু ব্যক্তির বিষয় দর্শনের ন্যায় দৃশ্যাদি তাঁহার মনে অস্ফুট ভাবে খেলিতে থাকিবে, পরে বিষয় দর্শন হইবে না, এক একবার অসংলগ্ন ভাবে বিষয় আসিয়া পড়িবে, পরে মনকে আরও গভীর ভাবে মগ্ন করিবার চেষ্টা করিতে করিতে মন সম্যক বিরতি লাভ করিবে, তখন আমি চিন্তা করিতেছি, এ বোধও থাকিবে না। ইহাই মনের নিবৃত্তি। মনের নিবৃত্তি হইলেই পরমা শান্তি আসিয়া যোগীকে আশ্রয় করে, এবং সেই শান্ত সমাহিত অবস্থায় ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক বিকাশ পাইতে থাকে। ইহাই আত্ম সাক্ষাৎকার। জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা, তখন তিন এক হইয়া যায়, সুতরাং অভিমান অহঙ্কারের লেশ মাত্র থাকে না। তাঁহাদের দ্বারা ভাল মন্দ যে কোন কর্ম্মই কৃত হউক—তদ্দ্বারা তাঁহাদের বন্ধন হয় না। যোগীবর শুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তরে তাই বলিলেন

"কুশলাচরিতে নৈষাম্ হি স্বার্থঃ ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েণ বানর্থো নিরহঙ্কারিণাং প্রভো॥

কুশল কর্ম্মানুষ্ঠানেও তাঁহাদের স্বার্থ নাই, বিপর্য্যয় করিলেও কোন অনর্থ নাই। কারণ তাঁহারা নিরহঙ্কার। অহঙ্কারবশতঃই সদসৎ কর্ম্মের ফলভাগী হইতে হয়।

যোগচর্য্যা।

প্রশান্তাত্মাবিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতেস্থিতঃ।
মনঃসংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসিস্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥

অন্তঃকরণকে ধৈর্য্যের দ্বারা প্রশান্ত করে ভয়শূন্য হয়ে অর্থাৎ যোগ করলে পাছে মরে যাই, বা সাংসারিক সুখভোগ বিসর্জ্জন দিতে হয়, কিম্বা সাধন করে যদি কোন ফল না হয়, তবে এদিক ও দিক দুইদিক যাবে—এই ভয়কে বর্জ্জন করতে হ'বে, নচেৎ দৃঢ়তা আসিবে না। ব্রহ্মচারীব্রতে স্থিত হয়ে, অর্থাৎ গুরুশুশ্রূষা ও শুক্রধারণে সচেষ্ট হইয়া সাধন করিতে হইবে। শুক্রধারণ করিতে না পারিলে যোগাভ্যাস করিয়া কোন সুফল পাওয়া যায় না, বরং হিতে বিপরীত হয়। যিনি এ বিষয়ে সাবধানী তিনি শীঘ্রই যোগফল লাভে সমর্থ হন। এইরূপে বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাহৃত করিয়া মচ্চিত্ত, মৎপর ও সমাহিত হইয়া যোগী অবস্থান করিবে। মনে বিষয়বাঞ্ছা বেশী হলে যোগ হয় না, এইজন্য ভগবানকে প্রিয় বোধ হওয়া চাই, তাঁহাকে প্রিয় বোধ করিতে পারিলে মচ্চিত্ত হওয়া শক্ত নয় এবং মৎপর হইয়া অর্থাৎ পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়, নিজের গায়ের জোরে করিব বলিয়া হোঁৎকামী করিলে কিছু হইবে না। ভক্তি বিগলিত চিত্তে তাঁহার চরণাশ্রয় করিয়া, তাঁহারই উপর যোগী একান্ত নির্ভর করিয়া অবস্থান করিবেন।

কি রকমে প্রথমাভ্যাসীকে মন সমাহিত করিতে হইবে তাহারই উপায় বলিতেছেন। পাকা যোগী সহস্র কোলাহলের মধ্যেও আপনার চিত্তকে তাঁহার সুচারু চরণে যোগযুক্ত করিয়া রাখিতে পারে। তিনি যে অভয় পরমানন্দ অবস্থা লাভ করেছেন,

তাহাতে আর জন কোলাহলে কি করিবে। তিনি সমস্ত নরনারীর মধ্যে তাঁহার অপরূপ রূপরাশি দর্শন করিয়া মুগ্ধ ও বিহ্বল হইয়া যান। মনে করিবামাত্রই মনকে বহির্বিষয় হইতে অন্তর্মুখীন করিয়া লইতে তাঁহাদের একটুও বিলম্ব হয় না। (কিন্তু যাঁহারা কাঁচা, যাঁহারা মাত্র সাধন সুরু করিয়াছেন, তাঁহারা সঙ্গশূন্য হইয়া একাকী একান্ত স্থানে নিরন্তর বাস করিবেন।) চিত্ত ও দেহকে সংযত করিয়া নিরাশী অর্থাৎ আকাঙ্খাশূন্য হইয়া এবং পরিগ্রহ শূন্য হইয়া, মনকে সমাধান করিবেন। লোকসঙ্গ চিত্ত সমাধানের অন্তরায়, লোভাতুর চিত্তে বিষয়ের আকাঙ্খা থাকিলেও মনকে সমাহিত করা কঠিন। দেহের চাঞ্চল্য ও স্থির অবস্থা প্রাপ্তির ঘোর অন্তরায়। উসখুস করা, এদিক ওদিক চাওয়া, বা একস্থানে একভাবে বসিয়া থাকিতে না পারা—এ সমস্ত যোগসিদ্ধির অন্তরায়। এইজন্য আসন, মুদ্রা ও স্থিরদৃষ্টি অভ্যাস যোগীরা প্রারম্ভ মুখে অভ্যাস করিয়া থাকেন। পাতঞ্জল দর্শনে আছে

দুঃখ দৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্ব শ্বাসপ্রশ্বাসা বিক্ষেপসহভুবঃ।

দুঃখ, (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) দৌর্মনস্য, —ইচ্ছার বিরুদ্ধ কিছু হইলে মনের যে ক্ষোভ অঙ্গমেজয়ত্ব,—অঙ্গ সকল যে নড়ে বা অস্থির হয়, এবং শ্বাসপ্রশ্বাস,—ইহারা বিক্ষেপের সহভূ. অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত চিত্তেই ইহারা আসে, সমাহিত চিত্তে আসে না। সুতরাং চিত্তকে সমাহিত করিতে হইলে এই সকল অন্তরায়গুলিকেও নষ্ট করিতে হইবে। বিচার দ্বারা দুঃখ দৌর্মনস্য, প্রাণায়াম দ্বারা

শ্বাসপ্রশ্বাস এবং আসন অভ্যাস দ্বারা শরীরের বিকলতা ও অস্থিরতাকে জয় করিতে হইবে।

"স্থির সুখমাসনম্" যোগদর্শন, সাধনপাদ।

নিশ্চল ও সুখে বসিতে পারাই আসন। গাত্র অবয়ব এদিক ওদিক হেলিবে না, অথচ বসিতে কোন কষ্ট না হয়,পা টন্ টন্ না করে,এজন্য অসমতল স্থানে বা বক্রভাবে বা কুব্জ হইয়া বসিতে নাই। মেরুদণ্ডকে সরল রাখিয়া "ত্রিরুন্নতং সমং স্থাপ্য শরীরং—বক্ষ, গ্রীবা ও শির এই তিনটি স্থানকে উন্নত রাখিয়া পদ্মাসন, স্বস্তিকাসন বা সিদ্ধাসন করিয়া বসিতে হইবে। কিন্তু দেখিতে হইবে আসন করিতে গিয়া সহজাবস্থা হইতে আরও অধিক ক্লেশ উৎপন্ন না হয়। গীতাতেও ভগবান বলিয়াছেন

শুচৌদেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিবমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্ ॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥
সমংকায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥

পবিত্র স্থানে নিজ আসন নিশ্চল রাখিতে হয়। এই আসন যেন অতি উচ্চ বা অতি নিম্ন না হয়। প্রথমে কুশাসন, তদুপরি মৃগাজিন, তদুপরি বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া আসন প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া মনকে বিক্ষেপ রহিত করিয়া চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া যোগাভ্যাস করিবে।

সমংকায়শিরোগ্রীবং—দেহের মধ্যভাগ, শির এবং গ্রীবা অর্থাৎ মূলাধার হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমং—মেরুদণ্ডকে সরল বা অবক্র ভাবে স্থির রাখিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে দৃষ্টি রাখিয়া অর্থাৎ চাক্ষুষী বৃত্তিকে অন্যান্য দিক হইতে আকর্ষন করিয়া ব্রহ্মাকারকারিত ভাবনা সহ নির্ম্মল আকাশে স্থাপন করিয়া ইতস্ততঃ না দেখিয়া মনের উপশান্তির জন্য—যোগাভ্যাস করিবে।

যোগাভ্যাসের ফল।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি॥

উক্ত প্রকারে সর্ব্বদা আত্মানং যুঞ্জন্—অর্থাৎ মন নিরোধ করিয়া, সংযত মানস হইয়া, মৎসংস্থাং অর্থাৎ মৎস্বরূপে অবস্থিতি রূপ যে নির্ব্বাণ মোক্ষ বা পরমাশান্তি যোগী লাভ করেন। চিত্তের বহির্গমন বৃত্তি প্রবাহ অভ্যাস বশতঃ রুদ্ধ হইয়া আত্মাতে সমাহিত হয়, তখন আর বাহিরের বিষয়ে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তিই মনের থাকে না। এইরূপে মন যখন বৃত্তিশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ মন যখন থাকে না, তাহাই পরম নিবৃত্তি বা পরমোপশান্তির অবস্থা। এই অবস্থায় অবিদ্যা একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়, সুতরাং যাবতীয় দুঃখ ক্লেশের পরিসমাপ্তি হয়। ব্রহ্মানন্দমগ্নচিত্ত আর অনাত্ম বস্তু প্রাপ্তির অভিলাষই করে না। ইহাই প্রকৃত নিরুদ্ধ অবস্থা। এমন কি দেববাঞ্ছিত ঐশ্বর্য্যও যোগীর স্বরূপ-নিমগ্ন অটল চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারে না। যে তাঁহাকে পাইয়াছে সে আর জাগতিক বস্তু চাহিবে কেন? তবে যাঁহারা সেরূপ অত্যুৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করিতে পারেন নাই সেই সকল বিষয়াকৃষ্ট

চিত্তই মধ্যপথে বিভূতি লাভ করিয়া বিমুগ্ধ ও বঞ্চিত হন। (সেই জন্য জোর করিয়া বলিতে হইবে—আমি অন্য কিছু চাই না, হে প্রভু, শুধু তোমাকে চাই।)

ভগবান প্রত্যক্ষ হ'ন কখন?

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা॥

যখন চিত্ত বিশেষরূপে নিরুদ্ধ হইয়া কেবল আত্মাতেই অবস্থান করিবে, এবং সর্ব্বপ্রকার কাম্য বস্তু লাভে স্পৃগ শূন্য হইবে, কোন প্রকার ঐশ্বর্য্য লাভের ক্ষীণাশাও মনে জাগিবে না, তখনই বুঝিতে হইবে যোগী যোগপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই যুক্তাবস্থারই নাম আত্ম-সাক্ষাৎকার।

যোগসিদ্ধির লক্ষণ সমাধি কি?

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।

বায়ুশূন্য দেশে দীপ যেরূপ বিচলিত হয় না সেইরূপ যোগানুষ্ঠানশীল নিরুদ্ধচিত্ত যোগীর অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহ বিষয়াদি সম্পর্কশূন্য হওয়ায়

যখন অচঞ্চল ভাবে আত্মাতে অবস্থিতি করে; যে অবস্থা-বিশেষে "যোগসেবয়া" যোগাভ্যাস দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইয়া উপশম প্রাপ্ত হয়; এবং যে অবস্থা বিশেষে 'আত্মনা' শুদ্ধান্তঃকরণ দ্বারা 'আত্মানং' আত্মাকে সাক্ষাৎ করিয়া 'আত্মনি এবতুষ্যতি' আত্মাতেই পরম তুষ্টি লাভ করে, তাহারই নাম সমাধি। এই অবস্থায় দেহদৃষ্টি না থাকায় বিষয় হেতু তৃপ্তি বলিয়া কিছু থাকে না, এইরূপে রজঃ ও তমোগুণের তিরোভাব বশতঃ চিত্তের শুদ্ধ নির্ম্মল অবস্থা প্রকাশিত হয় এবং ঐরূপ শুদ্ধচিত্তে পরমাত্মার প্রকাশ অনুভব হয়—তাহাই পরম সুখরূপ ব্রহ্মানন্দ বা সাক্ষাৎ জ্ঞানমূর্ত্তি, ইহা সর্ব্বপ্রকার বিষয়-সুখাদির অতীত অবস্থা। এই অবস্থা বিশেষে একপ্রকার আত্যন্তিক শুদ্ধবুদ্ধিগ্রাহ্য সুখের অনুভব হয়; ইহা প্রকাশ করা যায় না, কারণ ইন্দ্রিয় মন সেখানে কিছুই থাকে না। তবে মনে হইতে পারে, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ না থাকিলে সে সুখ অনুভব করিব কি প্রকারে? তাহারই উত্তরে বলিতেছেন 'অতীন্দ্রিয়ম্', ইন্দ্রিয়রা যেভাবে যেরূপ সুখের আস্বাদন করে, ইহা সেরূপ নহে। ইহা কেবল মাত্র বুদ্ধিগ্রাহ্য, সে বুদ্ধিও আবার আত্মাকারা, সুতরাং বিষয়াদির ছায়া পর্য্যন্ত তাহাতে পড়িতে পারে না, অতএব যাহাতে অবস্থিত হইলে আর আত্মস্বরূপ হইতে বিচলিত হইতে হয় না, যাহা নিরবচ্ছিন্ন স্থির অথচ নিরাবলম্ব, তাহাই সমাধি। মনে হইতে পারে বুদ্ধির এই আত্মাকারকারিত ভাবে যে সুখের কথা বলা হইল, তাহা কতকটা ফাঁকি। বাস্তবিক তাহা নহে, কারণ এই আত্মস্বরূপকে প্রাপ্ত হইলে অন্য কোন লাভকে লাভ বলিয়াই মনে

হয় না। যদি আত্মানন্দ ভাবটা কেবল রসহীন শূন্যমাত্র হইত, তাহা হইলে ইহার বদলে যোগীরা অন্য সুখকে সুখ বলিয়া মানেন না কেন? ইহাতে বুঝা যায়—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, ঐ অবস্থাই—নিরতিশয় সুখরূপ, কারণ তাহাতে অবস্থিত হইলে আর শীতোষ্ণাদি গুরুতর দুঃখে অভিভূত হইতে হয় না। যে অবস্থায় দুঃখের লেশমাত্র স্পর্শ হয় না, তাহাই 'যোগসংজ্ঞিত' যোগশব্দ বাচ্য জানিবে। সাধারণতঃ লোকের যে সুখ সম্বন্ধে যে ধারণা আছে সে সুখের লেশ মাত্র ইহাতে নাই, অথচ কোন প্রকার দুঃখও এ অবস্থা ভেদ করিয়া যোগীকে ক্লিষ্ট করিতে পারে না। সুখের জন্যও স্পৃহা নাই, দুঃখের জন্যও ব্যাকুলতা নাই—ইহাই প্রকৃত যোগ বা সমাধি। কোন কিছুর অভাব হইলে দুঃখ এবং তাহার পুরণ হইতে বৈষয়িক সুখদুঃখাদির উৎপত্তি হয়। ইহাতে যোগ ও নাই, বিয়োগও নাই, বামে দক্ষিণে হেলা নাই—মধ্যাবস্থায় স্থির। ইহারই নাম দ্বন্দ্বাতীত অবস্থা। ইহা কি প্রকারে আয়ত্ত করিতে হইবে—

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্‌॥

রজোগুণ হেতু মন চঞ্চল হইলে তাহাকে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহার দ্বারা আত্মবশীভূত করিতে করিতে রজোবৃত্তি শান্ত হইয়া আসে,তখন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ, ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত যোগীকে উত্তম সুখ আশ্রয় করে।

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥

মনবুদ্ধি হেতু সুখদুঃখাদি-সম্পর্ক-শূন্য আত্মাতে সুখদুঃখাদির

প্রতিবিম্ব পড়ে। কিন্তু সেই মনবুদ্ধিই যখন আত্মাকারাকারিত হইয়া যায়—সে সময় আর জাগতিক সুখদুঃখের তরঙ্গাভিঘাতে মন বুদ্ধি উদ্বেলিত হয় না, এইরূপে আত্মবশীকৃত যোগী বিগত-পাপ হইয়া 'ব্রহ্মসংস্পর্শ' রূপ অবিদ্যানিবর্ত্তক যে ... ত্তম সুখ—তাহাই তখন ভোগ করেন। যোগীর তখন জীবন্মুক্তি হয়।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

যোগীর চরম সাক্ষাৎ-কার—সর্ব্বভূতে আত্মদর্শন।

যোগাভ্যাসের চরম ফল কি তাহা বলিতে-ছেন। যোগাভ্যাস দ্বারা সমাহিত-অন্তঃকরণ যোগী সর্ব্বত্র সমদর্শী হন। কারণ আত্মা কি তাহা তিনি জানিয়াছেন। এবং সেই আত্মাকে তিনি যখন "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্'—বলিয়া প্রত্যক্ষ দর্শন করেন তখন আর কিরূপে অসমবুদ্ধি হইতে পারেন? তখন লৌকিক জ্ঞাতি, কুটুম্ব, স্বজন, বন্ধু এমন কি নি.জর দেহটারও পৃথক অস্তিত্ব অনুভব হয় না, সুতরাং তিনি কাহারও প্রতি দ্বেষ-বুদ্ধি বা প্রিয়বুদ্ধি রাখিতে পারেন না। তিনি তবে কি দেখেন? ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্ব্বভূতে অবস্থিত নিজ আত্মাকে দেখেন এবং নিজ আত্মাতে সর্ব্বভূত অভিন্নভাবে রহিয়াছে দেখিতে পান। দেহাদি অবস্থা অবিদ্যাকৃত, সেই অবিদ্যাই যখন থাকে না, তখন দেহভাণও থাকে না, দেহভাণ না থাকিলে ভেদভাব লক্ষিত হইতেই পারে না। সুতরাং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদৃষ্টি হেতু সূত্রজালে বস্ত্র এবং বস্ত্রে সূত্র দর্শনের ন্যায় আত্মাতেই প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চাদিও

আত্মাতিরিক্ত কিছু নহে এইরূপ সম্যক দর্শন দ্বারা তাঁহার বৈষম্য-বুদ্ধি এককালে তিরোহিত হইয়া যায়।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥

যে যোগীপুরুষ সর্ব্বত্র, জাগতিক সকল পদার্থে আমাকে দেখিতে পান, এবং আমাতেই সমস্ত ভূতজাতকে দেখেন, তাহার নিকট আমি অদৃশ্য থাকি না, একাত্মতাহেতু সেও আমার পরোক্ষ বা অদৃশ্য হয় না।

সমাধি মোটামুটি দুই প্রকার। সংপ্রজ্ঞাত ও অসংপ্রজ্ঞাত।

সমাধি-সাধন।

ধ্যান গভীর হইলেই সমাধি আসন্ন হয়। (ধ্যান করিতে করিতে যখন ধ্যেয় বস্তুমাত্র জ্ঞাত হয়, এবং অন্য সব ভুলিয়া যাওয়া যায়, তাহাই সংপ্রজ্ঞাত সমাধি।) আর অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি এই—

মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ।
যা সম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে॥

(মন বৃত্তিশূন্য হইয়া যখন ব্রহ্মাকারে অবস্থিত হয়, যে অবস্থায় জ্ঞান, জ্ঞেয়, ও জ্ঞাতার পার্থক্য লক্ষিত হয় না, তাহাই অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি।)

যেমন ধ্যানাবস্থা হইতে সম্প্রজ্ঞাতে আসা যায়, তদ্রূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে উপনীত হওয়া যায়। যদিও সমাধিসাধন অত্যন্ত কঠিন, কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিত চেষ্টা করিলে যে ইহা আয়ত্ত করা যায় সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সাধারণতঃ

চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে অসংখ্য বৃত্তির উদয় হয়। একটি চিন্তা আর একটি হইতে ভিন্ন। এইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিভিন্ন বৃত্তির নিরন্তর উদয়ের নামই বিক্ষিপ্তাবস্থা। ইহা সমাধির অত্যন্ত প্রতিকূলভাব। এই বিক্ষেপভাবকে সাধনবিশেষের দ্বারা স্থির করিতে হইবে। অভ্যাসদ্বারা এই ভয়ঙ্কর চিত্তবিক্ষেপ প্রশমিত হয়। (এই অভ্যাসের সহিত চিত্ত যদি বৈরাগ্যযুক্ত থাকে, তবে সোণায় সোহাগা হয়। কারণ বিষয়ানুরাগবশতই চিত্ত অধিক বিক্ষিপ্ত হয়।) বিষয় হেয় এই ধারণা দৃঢ়ীভূত হইলে মনের অনেক কল্পনা কমিয়া যায়, সুতরাং সেই পরিমাণে চিত্তও স্থির থাকে। যে বিষয়ে মনের অনুরাগ বেশী সেই চিন্তাই মন বেশী করে। যদি এইরূপে কোন সাধু, গুরু অথবা ইষ্টমূর্ত্তি প্রিয় বোধ হইয়া থাকে, তবে তাহাও পুনঃপুনঃ চিন্তা করা স্বাভাবিক। এই চিন্তার একতানতা হইতেই ধ্যানাবস্থা পূর্ণতা লাভ করে। ধ্যানাবস্থায় একই বৃত্তি বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। যাঁহারা নিত্য অভ্যাস করেন তাঁহারা জানেন যে চিত্তে ক্ষণে ক্ষণে কত অসংখ্য বৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, সেই চিত্তেই আবার অভ্যাসবলে একই বৃত্তি বহুক্ষণ স্থায়ী হয়। প্রথম প্রথম ভিন্ন ভিন্ন কত বৃত্তির পর বৃত্তির উদয় হয়, তারপর তাহা হ্রাস হইয়া একই প্রকারের ক্ষণস্থায়ী বৃত্তির উদয় হইতে থাকে, তখনই বুঝিতে হইবে আটা ধরেচে। তারপর একই বৃত্তি অধিকক্ষণ স্থায়ী হইয়া থাকে। এই অবস্থায় নিদ্রালুর চক্ষের মত চক্ষু জড়াইয়া আসে, ভারী হইয়া যায়। মন কথা কহিতে চায় না, ইন্দ্রিয়রা এলোমেলো ভাবে বিষয় গ্রহণ করে, কখনও করে না,

ঠিক নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বে যেমন হয়। তারপর ধ্যানাবস্থা আরও গভীর হইলে, বাহ্য বিষয় শরীরাদিও বিস্মৃত হয়, কেবল ধ্যেয় বিষয় স্পষ্ট জাগরূক থাকে—তাহারই নাম সমাধি। এই সমাধি অবস্থা হইতেই যাহা জানিবার তাহার চরম জ্ঞান হইয়া থাকে। এই সময় অনেক অলৌকিক বিষয় প্রত্যক্ষ হইতে থাকে। কিন্তু সে সব নানাভাব, পৃথক্ জ্ঞানের সূক্ষ্ম সোপানপরম্পরা অতিক্রম করিয়া নির্ব্বিকল্প চরম অবস্থায় উপনীত হওয়া যায়। উহাই প্রকৃত আত্মসাক্ষাৎকার। সূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে হইলেই যেমন আমরা মনকে স্থির করিয়া লই অর্থাৎ বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গুলিকে প্রত্যাহৃত করি, নচেৎ সূক্ষ্ম জ্ঞান হয় না, কোন ভাল বিষয় বুঝা যায় না, সেইরূপ আত্মজ্ঞান চরম সূক্ষ্মজ্ঞান; মনে স্থূল বাহ্যবিষয়াদির একটুও প্রভাব থাকিতে সে পরম জ্ঞানের উদয় হয় না। সেই জন্য বিশেষ সতর্ক হইয়া বাহ্য বিষয় হইতে মনকে ফিরাইয়া আত্মস্থ করিতে হয়। (এইরূপ পৌরুষ প্রযত্ন দ্বারা সমাধি সিদ্ধ হইলে 'বিবেকখ্যাতি' বা "ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার" উদয় হয়,—যে প্রজ্ঞা আর কখনও নষ্ট হয় না। ইহাই কৈবল্য মুক্তি।)

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥

(হে পার্থ, ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি, ইহাকে যিনি পান, তিনি আর সংসারে মোহপ্রাপ্ত হন না। মৃত্যুকালেও যদি এই জ্ঞানে অবস্থিতি করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়।)

সমাধিস্থ বা স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥"

যিনি মনোগত কামনাসমূহকে ত্যাগ করিয়াছেন এবং আপনাতে আপনি তুষ্ট, অর্থাৎ যাঁহার তৃপ্তির জন্য বাহিরের কোন বস্তুর প্রয়োজন হয় না, পরমানন্দ স্বরূপ আত্মাতে যিনি ডুবিয়া গিয়াছেন তিনিই সিদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত—এই লক্ষণান্বিত পুরুষকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। (ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখাদি অনাত্মধর্ম্ম; মন যতক্ষণ থাকে ইহারা ততক্ষণ থাকিবেই, কিন্তু, সমাধির সময়ে মনোনিবৃত্তি হওয়ায় অনাত্মধর্ম্ম সকল তিরোহিত হইয়া যায়।) (তখন সমুজ্জ্বল জ্ঞানসূর্য্য স্বকীয় প্রভায় উদ্ভাসিত হইতে থাকে, সাধক তখন কোনরূপ অজ্ঞান বা অভাব আবরণ না থাকায় নির্ম্মল ব্রহ্মানন্দ-অমৃতরস লাভে বিভোর হইয়া আত্মারাম ও আত্মক্রীড় হইয়া যান।) এখন কথা হইতেছে সমাধিস্থ পুরুষের ঐ সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু অষ্টপ্রহর তো আর সমাধি থাকে না। যখন যোগী সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হন তখন তো তাঁর মন ফিরিয়া আসে, সে মন তখন সংসারাদিতে আসক্তি প্রকাশ করে কিনা তাহারই উত্তরে ভগবান বলিতেছেন—যোগী পুনঃ পুনঃ সমাধিমগ্ন হইয়া এরূপ আত্মহারা অবস্থা লাভ করেন যে তিনি ব্যুত্থিত অবস্থাতেও পুত্রমিত্রাদি সর্ব্বত্র

অনভিস্নেহ অর্থাৎ স্নেহযুক্ত হ'ন না। আত্মাতে তাঁহার এত প্রীতি যে অনাত্মপদার্থ স্ত্রীপুত্রাদিতে বা এই দেহের সুখদুঃখে তাঁহার হৃষ্ট বা দুঃখিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তিনি প্রিয় বা অপ্রিয় বস্তু পাইয়া অভিনন্দন বা নিন্দা করেন না, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা—এরূপ ব্যাক্তিরই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ জ্ঞানে অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়াছেন।

এই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ অনায়াসে প্রত্যাহার করিতে সমর্থ, তাই ভগবান বলিতেছেন—

যদা সংহরতে চায়ং কুর্ম্মোহঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥

কূর্ম্ম যেমন আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইবামাত্রই নিজ শিরঃ-পদাদি অঙ্গের সঙ্কোচ করিয়া লয়, সেইরূপ ইচ্ছামাত্রই যে যোগী ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে অনায়াসে সহজে সংহরণ করিতে পারেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। সে প্রজ্ঞা আর কিছুতে নড়িবার নয়। (পূজ্যপাদ মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন "যিনি যোগমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক রাগদ্বেষের পরিহার, লোষ্ট্রকাঞ্চনে সমদৃষ্টি ও সংসারবাসনার বিসর্জ্জন করেন তিনিই ভক্ত।) তিনি দান, ভোজন, বা হননাদি যে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তজ্জন্য সুখদুঃখাদিতে তাঁহার সমান জ্ঞান হইয়া থাকে। তিনি ইষ্টানিষ্ট ত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্য বোধে একমাত্র উপস্থিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কোন কালে কোনরূপে অভিভূত হন না।

নবম অধ্যায়

অভ্যাস পৌরুষ বা প্রযত্নের ফল

পূর্ব্বে যে সমস্ত জ্ঞান যোগাদির সাধনা বলিয়া আসিয়াছি তাহা সমস্তই অভ্যাসের দ্বারা আয়ত্ত করিতে পারা যায়। বাসনাকে বিদূরিত করা বা কল্পনাকে সঙ্কুচিত করা সমস্তই অভ্যাসের দ্বারা হইতে পারে। এই অভ্যাসকে আয়ত্ত করা খুব শক্ত নয়। চেষ্টা করিলেই সিদ্ধির সম্ভাবনা। মানুষ যে বাসনাকে বিদূরিত করিতে পারে না—তাহার কারণও অভ্যাস। আমাদের বাসনার স্রোত যে প্রতি-নিয়ত অশুভ পথে ধাবমান হইতেছে, ইহা কি অশুভ অভ্যাসের ফল নহে? আবার যদি তাহাকে শুভ পথে ফিরাইবার চেষ্টা করি, তবে কেনই বা অকৃতকার্য্য হইব? অশুভকে শুভের দিকে ফিরাইবার চেষ্টার নামই তো পুরুষার্থ। কুবাসনা ও কুচিন্তার মননে যেমন চিত্ত কুকার্য্যে আসক্ত হইয়া থাকে তেমনি শুভবাসনা বৃদ্ধি করিতে পারিলেই মঙ্গলের পথে স্বতই চিত্তের গতি হইবে। যাহা অভ্যাস করিবে, তাহাই আয়ত্ত করিতে পারিবে। পৌরুষ ও প্রযত্নে কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হইতে বাকি থাকে না।) পৌরুষ সহায়ে চিত্তশুদ্ধি ও তাহা হইতে তত্ত্বজ্ঞান এবং বৈরাগ্যোদয় হইলেই সমস্ত অমঙ্গল নিবৃত্ত হয় এই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবার জন্যই

অভ্যাসই পুরুষকার।

শাস্ত্রবাক্য, গুরুবাক্য এবং সাধুবাক্য শ্রবণ করিতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে ইহা বহুবার বলিয়াছি—পুনরায় বলিতেছি যে আপনার খেয়াল মত চলিলে হইবে না। অনেকে নিজে চিন্তা করিয়া যাহা বুঝিতে পারেন না, তাহাই তাঁহাদের ভ্রমযুক্ত বলিয়া ধারণা জন্মে; কিন্তু এই জগদ্‌ব্যাপার, আত্মতত্ত্ব, ও ব্রহ্মজ্ঞান নিবিড় রহস্যময়, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদের এই ক্ষুদ্র অপূর্ণ মস্তিষ্কটির উপর নির্ভর করিলেই চলিবে না। আপনার চপল বুদ্ধিকে একটু সংযত করিয়া, সদ্‌গুরুপ্রমুখাৎ অভ্রান্ত ঋষিবাক্যগুলি শুনিতে পারিলে ও তাঁহাদের উপদেশ মত চালতে পারিলে—তবে যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার জন্মিবে। নচেৎ যতই তর্ক করি বা আস্ফালন করি, সমস্তই ব্যর্থ বাগাড়ম্বরে পর্য্যবসিত হইবে। ধোঁকা কোন কালেই মিটিবে না, বরং সন্দেহ আরও বাড়িয়া যাইবে। তাই বলিতেছি স্বেচ্ছাচারী হইলে চলিবে না, স্বেচ্ছাচার মত চেষ্টা করিলে, তাহাকেও পুরুষার্থ বলে না। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥" শাস্ত্রবিধি না মানিয়া যে যথেচ্ছ আচরণ করে সে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় না, সুখও পায় না, মোক্ষও প্রাপ্ত হয় না। শাস্ত্র ও সদ্‌গুরু বাক্য মানিয়া চলিতে পারিলে এ জগতে অসাধ্যসাধন কিছুই নাই। আজকাল লোকে যথেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া কুভোজন ও কামোপভোগ-পরায়ণ হইয়া প্রতিদিন বাসনার দাস, স্ত্রীজিত ও নির্বীর্য্য হইতেছে—তাহাদের কোথা হইতে উৎসাহ, উদ্যম থাকিবে? শাস্ত্রবিধি

মানিয়া চলিবার সে সামর্থ্য সে ব্রহ্মচর্য্যের বল কই? তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতে গিয়া শাস্ত্রের অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করেন এবং কোন সুফলই লাভ করিতে পারেন না। ইহা অবশ্যই শাস্ত্রের দোষ নহে, ইহা আমাদেরই কুকর্ম্মের ফল। ইহার প্রতীকারও শাস্ত্রবিধি মানিয়াই করিতে হইবে।

অনেকে বলেন আজকাল আর সে সব সাধন, অনুষ্ঠান. পেরেও উঠা যায় না আর অত অনুষ্ঠাননিয়মাদি করিতে ভালও লাগে না। উহাতে কোন বিশেষ আনন্দ পাওয়া যায় না, অনর্থক একটা অভ্যাসের বোঝা বহিয়া মরায় লাভ কি? বাস্তবিকই যে কার্য্যে কোন আনন্দ পাওয়া যায় না, বা যাহাতে কোন রসবোধ না হয়, সে কার্য্য অভ্যাস করিতে গেলে মন স্বভাবতই বিদ্রোহী হইয়া উঠে, কিন্তু অভ্যাসেরও আবার এমনি প্রভাব, যে অভ্যাস করিতে করিতে অভ্যস্ত বিষয়টিতে ক্রমশঃ আপনাপনি রসবোধ হইতে থাকে। এই রসবোধ যদি না হইত কোন লোকই তাহা হইলে আপনার প্রবৃত্তির প্রতিকূল বিষয়কে কখনই আয়ত্ত করিতে পারিত না।

অভ্যাসের শক্তি চিত্ত প্রসাদন।

অভ্যস্ত বিষয় অভ্যাসের গুণে ভাল লাগিবেই লাগিবে এবং তাহা হাজার নীরস বা কঠোর হইলেও, অভ্যাস তাহাকে সহজ ও সরল করিয়া তুলিবেই তুলিবে। ছাত্রদের মধ্যে দেখা গিয়াছে স্বাভাবিক কাহারও কোন বিষয়ে রুচি থাকে এবং কোন বিষয় আদৌ

অভ্যাসে আধ্যাত্মিক বলবৃদ্ধি হয়।

পড়িতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু দেখা গিয়াছে প্রযত্ন ও অভ্যাসের ফলে অত্যন্ত অপ্রিয় বিষয়ই আবার অত্যন্ত প্রিয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সেইরূপ যে প্রবৃত্তিটি বহুবার চরিতার্থ করা হইয়াছে, সেই প্রবৃত্তিটি পুনঃ পুনঃ চরিতার্থ করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবল ইচ্ছা জন্মিয়া থাকে তা সৎপ্রবৃত্তিই হ'ক আর দুষ্প্রবৃত্তিই হ'ক। সুতরাং শুভকর্ম্ম করিবার অভ্যাস করিলে শুভ কর্ম্ম করিতেই প্রবৃত্তি জন্মিবে। আত্মসংযমের অভ্যাস করিলে আত্মসংযমের দিকেই চিত্ত উন্মুখ হইয়া থাকিবে। শুধু তাহাই নয় সংযম অভ্যাস ঠিক ব্যায়ামের মত। ব্যায়ামে যেমন শারীরিক বলবৃদ্ধি করে সদভ্যাসেও তেমনি আধ্যাত্মিক বলবৃদ্ধি করিয়া থাকে।

অভ্যাসই পুরুষকার।

(কোন একটি বিষয় যখন আমরা দৃঢ়ভাবে অভ্যাস করিতে থাকি, তখনই তাহাকে পুরুষকার বলে।) মন অবিরত বিষয়-ভাবনার দ্বারা নিয়তই বিক্ষিপ্ত হইতেছে, ইহা হইতে কিছুতেই তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা যায় না, সুতরাং এই দুর্দ্ধর্ষ চিত্তকে বহির্ব্বিষয় হইতে সবলে আকর্ষণ করিয়া অন্তর্ম্মুখে লইয়া যাইবার অভ্যাস সাধন করিতেই হইবে, ইহাই আসল পুরুষকার। এই মনোবৃত্তি অসংযত ও বহির্ব্বিচরণশীল থাকিতে কিছুতেই শান্তি বা সুখলাভের উপায় নাই। দুষ্টাশ্ব যেমন বিপথে চালিত হইয়া আরোহীকে গর্ত্তমধ্যে পাতিত করে, তদ্রূপ এই অসংযত মন ও ইন্দ্রিয়গুলি বিবিধ উৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া মানবকে মোহকূপে পাতিত করিয়া দুঃখক্লেশের কঠিন নিগড়ে আবদ্ধ করে। বুদ্ধির যতক্ষণ এইপ্রকার মালিন্য থাকে, ততক্ষণ

তাহার জগদ্‌ভ্রমের নিরাস হয় না এবং মিথ্যাভিনিবেশের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার অহঙ্কারে আপনি বিনষ্ট হয়। জন্মজন্মান্তর হইতে মানবের এই মোহ ছুটিতেছে না, সে দেহ হইতে দেহান্তরে যাইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বাসনাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছে সুতরাং পুনঃ পুনঃ জন্মান্তর পরিগ্রহ এবং বিবিধ দুঃখক্লেশের কিছুতেই নিবৃত্তি হইতেছে না। এই দেহাভিমানই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বন্ধন। আত্মজ্ঞানের অভাবে এই দেহাভিমান ঘুচিতেছে না। আমাদের সমগ্র আর্য্যশাস্ত্রের উপদেশ—এই দেহাত্মবুদ্ধির বিনাশ সাধন কর, নচেৎ মুক্তি নাই। মন চঞ্চল হইয়াই বাসনার বশ হয় এবং তাহার বিচিত্র কল্পনা হইতেই বিষয়ের প্রতি দৃঢ় অভিনিবেশ ও তাহা হইতে এই সংস্কার বশতঃ দেহাত্মবুদ্ধি প্রবল হয়, আবার এই দেহাত্মবুদ্ধি ধ্বংস না হইলে মনকে স্থির করা যায় না। সমাধিঅভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই এই "দেহাত্মবুদ্ধি" বা স্থূল দেহে আমিত্ব জ্ঞানের বিনাশ সম্ভব হইবে না। 'ইহা হেয় এবং ইহা উপাদেয়' ভাবিয়া মন যে অনুরাগ ও বিরাগ প্রকাশ করে ইহাই আমাদের বন্ধন-রজ্জু। মনই পুরুষকার দ্বারা বৈরাগ্যভূষণে মণ্ডিত হইয়া আবার এই মোহ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে। আমার মন যদি আমাকে সাহায্য না করে, তবে কেহই আমাকে উদ্ধার করিতে পারে না। তাই (বশিষ্ঠদেব বলিতেছেন, "রাম! কুঠার দ্বারা পাদপকে যেমন ছেদন করা যায়, তদ্রূপ মনের সহায়েই মনকে ছেদন করিতে হয়। যাহারা এইরূপে মন দ্বারা মনকে ছেদন করে, তাহারাই পরমপাবন পদ লাভ করিয়া নির্ব্বাণসুখ ভোগ করিয়া থাকে।")

গীতাতেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন ঃ—

বন্ধু রাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥

যিনি বিবেকযুক্ত আত্মা দ্বারা দেহেন্দ্রিয়ের সমষ্টিরূপ আত্মাকে বশ করিয়াছেন সেই জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মাই বন্ধু। আর অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির আত্মা শত্রুর ন্যায় অপকারে প্রবৃত্ত হয়। সংসার-ভোগ-সুখ প্রভৃতি অসৎ পদার্থের জন্য আমরা যে পরিমাণে ব্যাকুল ও চেষ্টিত হইয়া থাকি, যদি সৎশাস্ত্র আলোচনা ও ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক এই মনকে রুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতাম এবং মনোনিবৃত্তি হইলে কি অপরিসীম শান্তিলাভ হয় তাহা উপলব্ধি করিয়া দেখিতাম, তাহা হইলে পরমার্থ চিন্তারই অনুসরণ করিতাম, কুকুরের মত মাংসখণ্ডের আশায় হাড় চিবাইয়া আপনাকে আপনি ক্ষতবিক্ষত করিতাম না।

যোগাভ্যাসে সমদৃষ্টি সাধন।

সংসারে আমরা অত্যন্ত আসক্ত, সংসারের সমস্ত খুঁটিনাটিতেই আমাদের মন আবদ্ধ, সংসারের অতীত কোন পদার্থের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নাই। সুতরাং এই দেহ বা এই দেহের ভোগ, কাহারও হস্ত হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছি না। 'সত্যমেব জয়তে নানৃতং'—'সত্যই জয়যুক্ত হয়, মিথ্যার জয় হয় না।' পার্থিবতা-সর্ব্বস্ব আমরা এই যে পদে পদে সত্যকে অবমাননা করিয়া মিথ্যাকে আলিঙ্গন করিতেছি, সাধুবাক্য গ্রহণ করিতেছি না, সদুপদেশ গ্রাহ্য করিতেছি না, তাহার কারণ আর কিছুই নয়—বালক যেমন মিথ্যাবাক্যে প্রবঞ্চিত হয় আমরা তেমনি আশার প্রলোভনে প্রবঞ্চিত

হইয়াছি। হায়, এই মায়াবিনী আশাকে পরিহার করিয়া কবে আমরা "সুখদা নিরাশাকে' সর্ব্বতোভাবে বরণ করিতে পারিব? কবে আমাদের এইরূপ সংসারভ্রমরূপ অজ্ঞানতিমির সম্যক বিদূরিত হইবে? এই ভ্রম নিরাস করিবার উপায় কি তাহা জগৎগুরু বশিষ্ঠ-দেব কৃপাপূর্ব্বক উপদেশ করিয়াছেন:—

"বিচারবলেই এই মিথ্যাজ্ঞান দূর হইয়া যায়। পর্ব্বতে আরোহণাদি করা যেরূপ দুঃসাধ্য তদ্রূপ বহুকাল হইতে মনুষ্যহৃদয়ে বদ্ধমূল এই মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট করা দুঃসাধ্য। অভ্যাসযোগ ও যুক্তি...সাহায্যে এই জগদ্ভ্রম দূর হইতে পারে।... সমাধি সহায়ে বৃত্তি সকলের ক্ষয় হইলে, দাহ্যশূন্য অগ্নির ন্যায়, নির্ব্বাণ প্রাপ্ত মনকে বিলীন করিয়া যে নামরহিত সৎ বিরাজ করেন তাহাই পরমাত্মার রূপ। ... সকল বস্তুর লয় হইলেও যাহা জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনের অতীত তুরীয় রূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহাই পরমাত্মার রূপ। ... তাঁহার জন্ম নাই, জরা নাই ও আদি নাই; তিনি সত্য, নিত্য নির্ম্মল, শিবস্বরূপ ও শূন্যস্বরূপ এবং তিনি সকল কারণের কারণ। রূপ, রস গন্ধ ও স্পর্শাদি যাহা কিছু তুমি জানিতেছ, তৎসমস্তই তিনি, এবং যাহা দ্বারা ঐ সকল জানিতেছ তিনিও তিনি। দ্রষ্টা, দর্শন ও দৃশ্য এই তিনের মধ্যে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমান যে দর্শন, তিনিই চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম। তাঁহাকে জানিলেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। ... যে যোগীপুরুষ খেচরীমুদ্রা সহায়ে ভ্রূমধ্যে অর্দ্ধোন্মীলিত দৃষ্টি সন্নিবেশপূর্ব্বক সেই অস্ফুট

অভ্যাসে ভ্রম-অপনোদন

অভ্যাস দ্বারা সিদ্ধি, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ

তারকা দ্বারা এই জগৎ দর্শন করেন, তিনি পরমাত্মাকেই দর্শন করেন। ... ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস না করিলে তুমি কখন এই শরীরে ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইবে না। তোমার দেহে ইন্দ্রিয়গণ অধিষ্ঠান করিতেছে। এইজন্য তুমি ব্রহ্মদর্শনে বঞ্চিত হইবে। এই দেহ (অর্থাৎ দেহে আসক্তি) ত্যাগ করিয়া, চিদাকাশরূপ আশ্রয় করিলে, ব্রহ্মলাভ করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মাভ্যাস।

.. "অভ্যাস ব্যতিরেকে কাহার কোন বিষয় সম্পন্ন হয় না। যে কার্য্য কর, তাহাতেই অভ্যাসের প্রয়োজন। অভ্যাস ব্যতীত কেহ কখনও কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন, সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তন, ব্রহ্মবিষয়ের কথোপকথন, প্রকৃষ্ট বিধানে ব্রহ্মবোধ ও ব্রহ্মের প্রতি একনিষ্ঠতাই ব্রহ্মাভ্যাস। ... কারুণ্য দ্বারা আত্মাভিমান জয় করিবে, মৌন দ্বারা বাচালতা জয় করিবে, উদ্যোগ দ্বারা তন্দ্রা জয় কবিবে, বেদে বিশ্বাস দ্বারা সন্দেহ জয় কবিবে, ছয় রিপুর বশীকরণ দ্বারা আশঙ্কা জয় করিবে, যোগ প্রভাবে ক্ষুধা জয় কবিবে, নিত্যানিত্য বিচার দ্বারা স্নেহ জয় করিবে, স্পৃহা পরিহার দ্বারা অর্থ, ক্ষমা দ্বারা ক্রোধ, সঙ্কল্পত্যাগ দ্বারা বাসনা ... আত্মচিন্তা দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস ধৈর্য্য দ্বারা কাম, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা ভ্রম, প্রমাদ ও বিষয়তৃষ্ণা জয় করিবে ...। কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও স্বপ্ন এই পাঁচটি ব্রহ্ম পথেব বিষম কণ্টক। আর দান, ধ্যান, অধ্যয়ন, সত্য, লজ্জা, সরলতা, ক্ষমা, চিত্তশুদ্ধি, আহারশুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়শুদ্ধি এই দশটি ব্রহ্মসিদ্ধির সাক্ষাৎ উপায়, যোগসাধনের একমাত্র পন্থা।

ভোগবাসনাই অবিদ্যা, ‘পুরুষকার-সংস্কৃত উদ্যোগ সহায়ে সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেই অবিদ্যার ক্ষয় হয়।”

বদ্ধ জীব বাসনার দাস, তাই সে আশার আশ্বাসে সংসারের মধ্যে ঘুরিয়া মরে, সত্য বস্তুকে পায় না। সত্য বস্তুকে দেখিয়াও বুঝিতে পারে না। ইহারই নাম বুদ্ধির জড়তা। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কু-অভ্যাসের বশেই ঘটিয়া থাকে। বুদ্ধির এই জড়তা ঘুচাইবার অভ্যাসেরই নাম **প্রযত্ন বা পুরুষকার।**

অভ্যাস দ্বারা বাসনা জয়।

অনেক বিষয় আমাদের অজ্ঞাতে অতি সহজে অভ্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু সে অভ্যাস শেষে ত্যাগ করা প্রাণান্তকর হইয়া পড়ে। মদ্যপান বা আহিফেন-সেবন বা কোন প্রকার নেশায় অভ্যস্ত হওয়া কঠিন নয়, কিন্তু ছাড়ার অভ্যাসই কষ্টকর। কোন কাজ প্রথমে বড় শক্ত মনে হয়, হয়ত তাহা পারিব না বলিয়া ভয় হয়, কিন্তু আবার তাহা কিছুদিন অভ্যাস করিতে করিতেই এখন তাহা অভ্যাসগত হইয়া যায়, তাহা বুঝিতেও পারা যায় না। মন স্থির করাই কঠিন, ধ্যান করা আরও কঠিন, কিন্তু চেষ্টা করিতে করিতে তাহাও আয়ত্ত হইয়া যায়। লোকে যখন বন্দুক বা তীর ছোড়া অভ্যাস করে, তখন প্রথম প্রথম লক্ষ্য স্থির করিতে পারে না, কিন্তু ক্রমিক অভ্যাসে লক্ষ্যবেধ অনায়াসসাধ্য হয়। দেখা গিয়াছে, যে, যে কার্য্য করিবার অভ্যাস করে, বা যে চিন্তা করিতে সে বিশেষ অভ্যস্ত হয়, তাহা তাহার চিত্তে এত কঠিন ভাবে সংস্কার অঙ্কিত করে, যে তাহার কার্য্য একবার হইয়াই শেষ

অভ্যাসের প্রভাব

হয় না, তাহা পৌনঃপুনিক ভাবে চিত্তে আসিতে আরম্ভ করে এবং প্রতিবারেই চিত্তের মধ্যে সেই সংস্কারকে গভীরতর ও দৃঢ়তর করিয়া যায়। সেই জন্যই কোন একটা কাজ বা চিন্তা একবার করার পর তাহা পুনঃ পুনঃ করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মে। এবং এই জন্যই বোধ হয় এই সংসার এবং ইহার মায়ার সংস্কার আমাদের চিত্তকে এতটা জড়াইয়া ধরে যে, ইচ্ছা না থাকিলেও আমরা অবশ হইয়া সংসারচিন্তা করিতে বাধ্য হই। অভ্যাস যত পুরাতন বা দীর্ঘকালের হইবে, ততই তাহা মুছিয়া ফেলা সুকঠিন হইবে। এই সংস্কারের এত অধিক শক্তি যে, মনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করিয়া তাহা মনকে অধিকার করিয়া বসে; সেই জন্য যে চোর, যে মিথ্যাবাদী, বা যে ঘাতক নিজ নিজ কুকার্য্যে অভ্যস্ত হয় পরে তাহারা স্বীয় দোষ বুঝিতে পারিলেও তাহা আর সংশোধন করিতে পারে না, কারণ পূর্ব্ব অভ্যাসের সংস্কার তাহাদের উপর এতই বলপ্রকাশ করে।* তাই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন :—

* এই জন্য দেখিতে পাই পণ্ডিত ব্যক্তিও তাঁহার সংস্কারাবরুদ্ধ কর্ম্ম বা চিন্তাকে তেমন করিয়া বুঝিতে পারেন না। সংস্কারকে অতিক্রম করা বড় ক্ষমতার কাজ। এই 'চিত্ত' থাকিতে সংস্কারশূন্য অবস্থা লাভ করাও এক প্রকার অসম্ভব। যাঁহারা বলেন 'এ সব সংস্কার' ছাড়িয়া দেওয়া উচিত' 'সে সব সংস্কার কুসংস্কার'—তাঁহারাও প্রকৃতপক্ষে সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াই এরূপ বলিয়া থাকেন। যিনি যোগযুক্ত নহেন, তাঁহার চিত্ত যে কিরূপে সংস্কারশূন্য হইতে পারে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কেবল মাত্র হঠকারিতা করিলেই বা কোন সংস্কারকে 'কু' বলিয়া বুঝিতে পারিলেই, তাহা নষ্ট হয় না। অসংকার্য্যকে অনেকেই ঘৃণা করেন, নিন্দা করেন, তার জন্য বড় বড়

"আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মাম প্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥"

ভাল কর্ম্ম ও সচ্চিন্তার সংস্কারও ঠিক ঐ রকম। দয়া যত করিতে থাকিবে দয়া করিবার প্রবৃত্তি ততই বাড়িয়া যাইবে। ঐরূপে সমস্ত সদ্‌গুণও নিয়ত অভ্যাসে প্রবল হইয়া উঠে।

বক্তৃতা করেন, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কয়জন অসৎকার্য্য না করিয়া থাকিতে পারেন? যাঁহারা একত্র না খাওয়া, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, ও জাতিভেদ প্রভৃতি মানাকেই কুসংস্কার বলিতে চাহেন, তাঁহাদের কথাকে অশ্রদ্ধা করিতে চাহি না, কিন্তু যাহা সংস্কারগত হইয়া গিয়াছে, তাহাকে উঠাইয়া দেওয়াই সহজ কথা কি? আমার বিশ্বাস উঠাইবার জন্য সাধ্য সাধনা করিলেও উঠানো শক্ত, কারণ বহুকালের সংস্কারকে তর্জ্জনী হেলাইয়া উঠাইয়া দেওয়া যায় না। কখন কেহ এরূপ পারিয়াছেন বা পারিবেন বলিয়া আমি বিশ্বাস করিতে পারি না। এ সকল ভেদাভেদ ভাব ভাল কি মন্দ সে কথা এখানে হইতেছে না, ইহার স্বপক্ষে যুক্তির অভাব নাই। সুতরাং তাহা লইয়া বিতণ্ডা করা বৃথা। আমার কথা এই যে বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত সংস্কারশূন্য যখন কেহই হইতে পারেন না, তখন সেই জ্ঞানকে লাভ না করা পর্য্যন্ত উহা লইয়া কলহ করা নিষ্প্রয়োজন। আপনার মতকে সকলেই বিশুদ্ধ বলে, এবং অপরের মতকে কুসংস্কার বলে। যে যেরূপ সমাজের মধ্যে লালিত, তাহার তদনুরূপ সংস্কার গঠিত হয়, এবং সে স্বপক্ষের অনুকূল যুক্তিকেই যুক্তিযুক্ত বলে। দুইটি বিরুদ্ধ সংস্কার-সম্পন্ন সমাজের দুইটি বালককে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তাহারা না বুঝিয়াও স্ব স্ব সমাজের মতকেই পোষণ করিতে চেষ্টা করিবে এবং স্বীয় সংস্কারবিরুদ্ধ মত যদি ভালও হয়, তবুও তাহা গ্রহণ করিতে তাহাদের চিত্ত বাঁকিয়া দাঁড়াইবে।

এই যে মন অনবরত বিবিধ চিন্তায় মগ্ন, স্থির করিবার কত যত্ন করিলেও স্থির হইতে চাহে না, তাহার কারণও ঐ। পুনঃ পুনঃ অনাবশ্যক বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সেই সকল নিষ্ফল চিন্তা মনকে এত অধিকার করে যে, মন অবসর পাইয়াছে কি আবার সেই চিন্তায় মগ্ন হইয়াছে। মন ঠিক বানরের ন্যায় উদ্দেশ্যহীন ছুটাছুটিতে বিব্রত হইয়া রহিয়াছে। অথচ যদি ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখা যায় তবে বুঝা যায় যে, এই সকল চিন্তা ইহলোক, বা পরলোক কোন লোকেই সুফল উৎপাদন করে না। অথচ তাহা সংস্কাররূপে মনে থাকিয়া যায় এবং পৌনঃপুনিক ভাবে মনে উদয় হইতে থাকে। সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের সহস্র চিন্তা যদি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করা যায় তবে আপনার কাছে আপনাকে লজ্জিত হইতে হয়, এবং তাহার সঙ্কল্প-বিকল্পের অসারতা দেখিয়া হাস্য সংবরণ

ইহাতে দোষ কাহারও নাই, সংস্কারই এ সকলের কারণ। কোন পণ্ডিতের মত এই যে, বালকদিগকে গোড়া হইতে কোন একটা সংস্কারের পক্ষপাতী হইবার সুবিধা দেওয়া অন্যায়। অন্যায় সন্দেহ নহে। কিন্তু উপায় কি? হিন্দুসমাজের সংস্কার হইতে সরাইয়া তাহাকে ব্রাহ্মসমাজে রাখুন, ব্রাহ্মসমাজের রং তাহার মনে ফুটিয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজ হইতে উঠাইয়া খ্রীষ্টিয়ান সমাজে রাখুন, খ্রীষ্টীয়ান সংস্কারে তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিবে। সর্ব্বসংস্কারের বহির্ভূত করিয়া রাখা তো কাহাকেও চলে না। কোন না কোন সমাজের আঁচ তাহাকে লাগিবেই, আর নয়ত সে মানুষ না হইয়া অন্য কিছু হইবে। সুতরাং এ সব বৃথা তর্ক ছাড়িয়া যাহাতে মানুষ হওয়া যায় তাহার চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যদি আমরা মানুষ হইতে পারি তবে যে সমাজেই থাকি না কেন আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যস্থলেই পৌঁছিতে পারিব।

করা কঠিন হয়। সময়ে সময়ে দুঃখ ও অনুতাপ হয়, আমরা যে আপনাদিগকে বিজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেই, আর কি না শিশুর মত সঙ্কল্পবিকল্পের অলীক মত্ত চেষ্টায় সর্ব্বদা জর্জ্জরিত হইতেছি! কোন প্রয়োজন নাই অথচ মনে কত চিন্তারই তরঙ্গ ছুটিতেছে। এই এক চিন্তা আসিল,আবার আর একটি চিন্তা দ্রুত চলিয়া আসিতেছে, ওই যে অপর তৃতীয় চিন্তা সুদূর হইতে উঁকিঝুঁকি দিতেছে—নিত্য প্রবাহিত সাগরতরঙ্গের ন্যায়, চিন্তার বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই! ইহার কবল হইতে যদি নিষ্কৃতি না পাই, তবে অন্যকে উন্মত্ত মনে করা বাতুলতা। প্রকৃতপক্ষে যাহার মন বাসনা-তরঙ্গে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, ক্ষণার্দ্ধমাত্র এক স্থানে থাকিতে পারিতেছে না, তাহা অপেক্ষা উন্মত্ত এবং প্রকৃত দুঃখভাগী আর কে আছে?

এই সকল চঞ্চলাত্মাদের দুরাবস্থার কথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন:—

"চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥"
আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ম্॥"
ইদমদ্য ময়ালব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥"
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ॥"

এই সকল কামভোগপরায়ণ ব্যক্তিদের কামভোগই পরম পুরুষার্থ বলিয়া ধারণা, তাই তাহারা কত শত দুষ্কর্ম্মের দ্বারা অর্থ সঞ্চয় করিতেছে, আবার সেই অর্থের অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া অপরকে আপনা হইতে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিতেছে। এই সকল মোহ-মদিরায় উন্মত্ত জনগণ চিত্তের বিক্ষেপবশতঃ যে আপনার হাতে আপনি নরক প্রস্তুত করে তাহা বুঝিতেও পারে না। তাহারা ধনমদে মত্ত হইয়া যে "অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্" বলিয়া চীৎকার করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তাহারা জগৎটাকে বেদপুরাণাদি-প্রমাণমূলক বলিতে চাহে না, বেদাদির প্রামাণ্য স্বীকার করে না। তাহারা বলে "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ।" সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা এ জগতে নাই। যাহার যাহা খুসী সে তাহাই করুক। কারণ জগৎ অনীশ্বর —ঈশ্বর-রহিত। সুতরাং দণ্ড দিবে কে? বিক্ষেপ হেতু মন স্থির না হওয়ায় ভ্রান্তি ঘুচে না, এবং সত্য অবধারণ করিতে পারে না। সুতরাং এই চঞ্চল চিত্তই আমাদের মায়াফাঁস তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার গ্রাস হইতে নিস্তার লাভ করা নিতান্তই কঠিন, কিন্তু ইহার কবল হইতে আপনাকে বাঁচাইতে না পারিলে আর কোন উপায়ও নাই। হায়! আপনাকে আপনি হত্যা করিবার জন্য

রজ্জুর প্রয়োজন হয় না, এই বাসনাই আমাদের বন্ধনরজ্জু এবং এই সূক্ষ্ম রজ্জুই আমাদের বিনাশের পক্ষে যথেষ্ট। যিনি কুচিন্তার অভ্যাস দ্বারা এই কুচিন্তা হইতে ত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে খুব দৃঢ় অভ্যাসশীল হইতে হয়, নচেৎ পূর্ব্বাভ্যাস চিত্তকে অবশ করিয়া তাহার উপর আধিপত্য কবিতে থাকে। সেই জন্য পুনঃপুনঃ বলিয়াছি, আবার বলিতেছি, এক দিকে সাধনা-ভ্যাস এবং সঙ্গে সঙ্গে বিচার, অন্য দিকে সাধুসঙ্গের একান্ত প্রয়োজন।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে বিবেকের অভ্যুদয়।

সাধুসঙ্গের প্রভাবে বিবেকের উদয় হয় এবং বিচারোৎপন্ন বিবেক দ্বারা একটা বিপরীত সংস্কারের ভিত্তিস্থাপনের সূচনা হইতে থাকে। অনেককে অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি, যে তাঁহারা শত চেষ্টা করিয়াও কুচিন্তা ও কদর্য্য অভ্যাসের হস্ত হইতে আপনাকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিতেছেন না। সে সময় হতাশা আসিবার কথা বটে কিন্তু নিরুৎসাহ না হইয়া তিনি যদি নিরন্তর চেষ্টাকে জাগ্রত রাখেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কৌশল অবলম্বন করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শ্রেয় লাভের সম্ভাবনা। কৌশলটি "বিপরীত ভাবনা," অর্থাৎ যে মন বিষয়চিন্তায় নিতান্ত অভ্যস্ত এবং

বিপরীত ভাবনায় চিত্তশুদ্ধি।

বিকারগ্রস্ত, তাহাকে "চিন্তা ছাড়, কু অভ্যাস ছাড়, সৎপথে চল," একথা বলা নিরর্থক। হাজার উপদেশ দিলেও সে তাহা পারিবে না। সুতরাং "চিন্তা" হইতে তাহাকে একেবারে বিরত করা চলিবে না।

চিন্তা করিতে তাহাকে দিতেই হইবে, তবে প্রতিনিয়ত যে চিন্তায় সে অভ্যস্ত সে চিন্তা নহে। কারণ তাহা হইলে সংস্কার আরও প্রবল হইবে। এটা প্রথমত একটু শক্ত মনে হয়, কিন্তু পরে সহজ বোধ হয়। যে খুব আমোদ ভালবাসে এবং তজ্জন্য নানা অবৈধ আমোদ উপভোগ করিতে করিতে চরিত্রহীন হইয়া পড়ে, তাহাকে আমোদজনক অথচ বৈধ এবং চরিত্রের উন্নতিকর কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। যে কাজ ভালবাসে এবং অনবরত আপনার বিষয়ের কাজ লইয়া ব্যস্ত, তাহাকে যদি অপরের প্রয়োজনীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়, বা ভগবৎ সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা যায়, তবে তাহার পূর্ব্ব অভ্যাস আপনার চিরন্তন স্বার্থ গণ্ডীর বিপরীত মুখে ধাবিত হয়। নদীর প্রচণ্ড বেগ হ্রাস করিতে হইলে স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিলে যেমন কিছু ফল হয় না, তাহার পাশে পাশে অন্য দিক দিয়া খাল কাটিয়া জল বাহির করিয়া দিতে হয়, তদ্রূপ মনের মধ্যে যে শ্রেণীর চিন্তা বা কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, তাহার বিপরীত চিন্তা ও কার্য্যে তাহাকে অল্প অল্প অভ্যস্ত করাইতে হয়। তাহা হইলে পূর্ব্ববেগ হ্রাস হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। অর্থচিন্তা যাহার প্রবল সে তাহা হইতে অব্যাহতি পায়, যদি সে লোকের দুঃখ-দারিদ্র্য আলোচনা করে ও তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করে। লোকের আধিব্যাধির কথা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব ধনীদিগের অবস্থাবিপর্য্যয়ের কথা পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিলেও তিনি কিছু সুফল লাভ করিতে পারেন। যাহার কামচিন্তা প্রবল সে যদি সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করে

ও সদালোচনা করে, এবং আপনার শরীর ও মনকে সর্ব্বদা লোক-হিতকর কর্ম্মাদিতে নিযুক্ত করে—যাহাতে কামাদি মনোমধ্যে আশ্রয় পাইবার অবসর না পায় ; এবং ভোগের দ্বারা কষ্টকর রোগাদির উৎপত্তি, ভোগসুখের অনিত্যতা ও পরিণামবিরসতা এবং শরীরের ক্ষণভঙ্গুরতার কথা মনে মনে আলোচনা করে, তবে কামের বেগ অনেক পরিমাণ কমিয়া আসে। যাহার লোভ আছে সে যদি দান করিতে চেষ্টা করে ; যে প্রবঞ্চক সে যদি 'সত্য কথা বলিব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে ; যে কোপন-স্বভাব সে যদি ক্ষমাশীল ও সহন-শীল হইবার অভ্যাস করে ; যে অহঙ্কারী সে যদি তদপেক্ষা অবস্থা ও গুণসম্পন্ন ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা করে ; যে অত্যন্ত মোহগ্রস্ত এবং স্ত্রীপুত্র সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, সে যদি মৃত ব্যক্তিদের কথা ভাবে, শ্মশান এবং সুবৃহৎ জনশূন্য ভগ্ন অট্টালিকাসমূহ দেখিয়া আসে, তবে স্বতই তাহার এই পার্থিব ধনজন ও প্রিয় পরিজনের প্রতি অনুরাগ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। বিশেষতঃ যদি সকলেই মনে করে এবং প্রতিদিন অন্তরের সহিত ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করে যে 'আমার দ্বারা যেন কাহারও অনিষ্ট না হয়! লোককে একেই কত দুঃখ কত যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, আমি যেন আর তাহাদের যন্ত্রণা বৃদ্ধি না করি! রোগ, মৃত্যু, অভাব, শাসনের প্রচণ্ড তাড়নে সকলেই মুহ্যমান, আমি যেন তাহাদিগের প্রতি আর উপদ্রব না করি'! পরের দুঃখ দূর করিবার জন্য, অপরের অশ্রু মুছাইবার জন্য যেন আমার হৃদয়দ্বার রুদ্ধ করিয়া না রাখি, পরন্তু প্রয়োজন হইলে স্বার্থ বিসর্জ্জন করিতে পারি, এজন্য, হে ভগবন্,

আমাকে বল দাও।' তাহা হইলে জগতের অনেক দুঃখভার লঘু হইয়া যায় এবং লোক পাপের আকর্ষণ হইতে বহু পরিমাণে রক্ষা পায় সন্দেহ নাই। কারণ যাহা ভাবা যায় চিত্ত ধীরে ধীরে তাহার সংস্কার গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারে না।

দশম অধ্যায়

সংযম অভ্যাস

সদভ্যাসের ও অসদভ্যাসের অসীম প্রভাব পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। অসদভ্যাসের বশে লোকে কত যে, নবনব অভাবে প্রপীড়িত হইতেছে—ইচ্ছা করিয়া কত কষ্টই সহ্য করিতেছে—তাহার সীমা নাই। চেষ্টা করিলে অতি সহজেই এই সকল দুঃখ হইতে লোকে মুক্তি পাইতে পারে। কিন্তু আমরা এতই নির্ব্বোধ যে, অভাবের পীড়নে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব, সেও স্বীকার, তবু অনায়াসে যাহাকে ত্যাগ করা যায়, তাহাকে ত্যাগ করিয়া যন্ত্রণার লাঘব করিব না।

অসংযমই বর্ত্তমান সংসারে অশান্তি ও অভাবের কারণ।

ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে আজকাল ধনী মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থরা সকলেই প্রায় একরকম চালে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহে। ধনীদের অর্থ আছে, তাঁহারা সখের ও ফ্যাসানের অনুরোধে অর্থব্যয় করিলে ততটা দোষের হয় না; কিন্তু যাহাদের পরিমিত বা স্বল্প আয়, তাহারাও যদি সেইরূপ নকল করিতে চায়, তবে তাহাদের কষ্ট হওয়া ও অভাবে উৎপীড়িত হওয়া অনিবার্য্য। কিন্তু এই সামান্য কথাটা কেহই একটু ধীরভাবে ভাবিয়া দেখেন না। ভারতবর্ষের চিরন্তন আদর্শে গৃহস্থালী চালাইতে অনভ্যস্ত হওয়ায়,

আমাদের এত দারিদ্র্য ও এত অভাব। যাহারা নিজের ও স্ত্রীপুত্র-কন্যার দুটি বেলা উদর পূর্ণ করিতে ও পরিধেয় বসন ও ঔষধ-পথ্য যোগাইতে এতদূর ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহারা আর অপরের দুঃখ কিরূপে মোচন করিবে? অথচ পূর্ব্ব-কালে আমাদের পিতামহরা যে ভাবে সংসার চালাইতেন ও জীবন যাপন করিতেন, তাহা অনুসরণ করিয়া চলিলে, প্রকৃত পক্ষে কোন ক্ষতিও হয় না, অথচ অল্প আয়ের মধ্যে এক প্রকার সুখ-স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে। আমাদের নিজেদের অভাব অধিক বলিয়াই, অবশ্য ভরণীয়বর্গ, অতিথি-অভ্যাগত, দীন-দরিদ্রের শুশ্রূষার জন্য অর্থের অকুঁলান হয়। কি অশন-বসনে, কি সাজসরঞ্জামে বড় লোকদের মত বা সাহেবীয়ানা ভাবে থাকিবার আকুল চেষ্টাই আমাদের শান্তির সংসারকে অশান্তিতে ভরিয়া দিয়াছে। এই অবস্থার প্রতিকূল চাল এবং ভোগবিলাসের জন্য অত্যধিক লোলুপতাই আমাদিগকে দিন দিন অন্তঃসারশূন্য করিয়া দিতেছে। ইহার কি কোন প্রতিকার নাই? এত অভ্যাসের দাস ও বিষয়ের সেবক হইয়া পড়িয়াছি যে, এই সকল অভাবকে পূরণ করিতে না পারিলে আপনাকে কত দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করি। কিন্তু এ সমস্ত অভাবই নিজের কল্পনা, শুধু শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। নাই ভাবিলেই যে আপদ চুকিয়া যায়, তাহা না করিয়া হায়! হায়! করিয়া বেড়ানো প্রকৃতই অনুতাপের বিষয় নহে কি? পূর্ব্ববর্ত্তী আর্য্যসভ্যতার আদর্শ হইতে বিচলিত হওয়াতেই, আমাদের কষ্ট হইয়াছে। এখন এইরূপ

অভাববোধ করা অভ্যাস বা সংস্কারগত হইয়া গিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পূর্ব্বে এ সব অভাবকে অভাবই মনে করিতেন না। সুতরাং এই সকল নিজকৃত অভ্যাস, যাহা একটু চেষ্টা করিলেই মুছিয়া ফেলিতে পারা যায়, তাহা না করিয়া ঐ সকলকে প্রশ্রয় দিয়া অবিরত দুঃখভোগ করা কি নিতান্তই পাপ ভোগ করা নয়? যদি বল, এখন এই সকল সুখাদিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, এখন আর তাহাদিগকে ছাড়িতে পারিব কেন? এ কথা ঠিক নয়; এ কথা বলিলে চলিবে কেন? বুঝিতেছি যে অভ্যাস ভবিষ্যতে আমার দুঃখের কারণ হইবে, জানিয়া শুনিয়াও আমি তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইব না? এরূপ কাপুরুষের মত দুর্ব্বলতা দেখাইলে চলিবে কেন? অবশ্যই কোন প্রতীকারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস অভ্যাসের বশে যাহা সংস্কারগত হইয়া গিয়াছে, বিপরীত অভ্যাস দ্বারা তদ্রূপ আর একটি সংস্কারকে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে খাড়া করিয়া তুলিতে পারা যায়। ভারতবর্ষের সত্য আদর্শই হইল সংযম। ভারতবর্ষের আদর্শ ত্যাগের দিক দিয়া পূর্ণতালাভ করিয়াছে, ভোগের দিক্ দিয়া নহে। তাহার অশনে বসনে, ভোগে বিলাসে, গৃহে বাহিরে, আচার ব্যবহারে, কথায় বার্ত্তায় আলাপে আমোদে সর্ব্বত্রই সংযম রক্ষিত, কোন খানেই তাহা মাত্রা ছাপাইয়া উঠিতে পারিত না। ভারতবর্ষের ইহাই বিশেষত্ব। এখন কিন্তু এই সংযমের অত্যন্ত অভাব হইয়াছে। তাই আমাদের এত দুঃখ, এত কষ্ট। এদিকে না তাকাইয়া দেশোন্নতির জন্য

মাথা কুটিয়া মরিলেও, এবং শত শত হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্ম্মকেন্দ্র বা সভা সংস্থাপন করিলেও বর্ত্তমানকালে এ দেশের যাহা যথার্থ অভাব, তাহা কোন প্রকারেই ঘুচিবে না। সেই জন্য যাঁহারা যথার্থ দেশহিতৈষী ও দেশবাসীর মঙ্গলকামী, তাঁহাদিগের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা তাঁহারা যেন সংযমের দিক দিয়া শিক্ষা বিধানেব ব্যবস্থা করেন।

প্রথম হইতে শিক্ষা পাইলেই শিশুদিগের সংযমাভ্যাস সংস্কারগত হইয়া দাঁড়াইবে। আমি দেখিতেছি সংযম শিক্ষার অভাবেই আমরা ভিখারীর মত অর্থের জন্য আত্মবিক্রয় করিতেছি, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি, এমন কি চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতেছি এবং অকারণে অভ্যস্ত অভাবগুলিকে পূরণ করিবার জন্য অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি। ইহাতে এই জাতিকে কতটা যে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে তাহা দূরদর্শী ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন।

যাহারা অভ্যাসের দ্বারা আপনাদের অভাবকে সঙ্কুচিত করিতে পারে না, বা প্রমত্ত ইন্দ্রিয়নিচয়েব দুর্ব্বার বিষয়লালসাকে সংযত করিতে পারে না, তাহাদের ভাগ্যে আরও কত দুঃখ আছে তাহা কেবল বিধাতাই বলিতে পারেন। সংযমের বলেই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয় ছিলেন। আজ সংযমেরই অভাবে ভারতের সেই সব শ্রেষ্ঠ জাতিরা পরের দাস্যবৃত্তিতে মনোযোগ দিয়াছেন। সেই জন্য উচ্চ জাতিদেব মধ্যে শূদ্রত্বের লক্ষণসমূহ (মিথ্যাচার, কপটতা প্রভৃতি) প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হইতেছে। "অর্থে প্রয়োজন নাই,

তেঁতুলপাতার ঝোলেই বেশ চলে”—একথা এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা সাহস করিয়া বলিতে পারেন না। কারণ তাঁহারাও ভোগ ও আরামের দাসত্ব করিতে শিখিয়াছেন!

সংসারে কষ্ট ও অভাব বিমোচনের জন্য এবং সুনীতি ও সদাচার প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য কতকগুলি বাহ্য ও আভ্যন্তরিক সংযম অভ্যাস করিবার চেষ্টা করা নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এ বিষয়ে পূর্ব্বাধ্যায়ে অনেক কথা বলিয়াছি। মনীষিগণ অভিজ্ঞতা দ্বারা বুঝিয়াছিলেন, যেমন সকল কর্ম্মেই নিয়ম মানিয়া চলা আবশ্যক, সেইরূপ উপাসনাতেও বরং কিছু বেশী নিয়ম মানিয়া চলা আবশ্যক। নচেৎ প্রযত্নের শিথিলতা আসে। একবার শিথিলপ্রযত্ন হইলে আবার পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে হইলে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। মন বড়ই দুর্নিগ্রহ, ইহাকে লইয়া যাঁহারা সদা-সর্ব্বদা নাড়াচড়া করেন, ইহার বিক্ষেপশক্তি যে কিরূপ প্রবল, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞাত নহে। সুতরাং প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অসংযতভাবে উপাসনা করা কখনই নিরাপদ বলিতে পারা যায় না। ইহার আর এক বিপদ চালক লইয়া। আজকাল সকলেই গুরু, শিষ্য হইয়া শাসিত হব এ ইচ্ছা সকলেরই কম। প্রায় সকল আধ্যাত্মিক উপদেষ্টার এক-একটি দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছেন। সকলেই ক্রেতা-সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল। লোকেও যেখানে সেখানে যার তার কাছে উপদেশ লইতে ব্যগ্র—তাহারাও শস্তা ও সুবিধা খুঁজিয়া

উপাসনায় সংযম।

বেড়াইতেছে। এরূপ অবস্থায় যাহা হওয়া সম্ভব তাহাই হইতেছে। গুরুরা ধর্ম্মশিক্ষা দিতে গিয়া অনেক সময়ে অধর্ম্মের প্রশ্রয় দিতেছেন। সর্ব্বত্র বিধি মানিয়া চলিবার চেষ্টা করাই পৌরুষের লক্ষণ। তাহা না করায় সকলে হীনবীর্য্য হইয়া লোক চক্ষে হেয় হইয়া যাইতেছেন। কারণ শাস্ত্রাচার লঙ্ঘন করিয়া যাহা করা যায় তাহা বিধিহীন কার্য্য, এবং তাহা পণ্ডশ্রম বলিয়া গণ্য।

অসংযতভাবে কথা কহিবার প্রবৃত্তি আমাদের বড়ই প্রবল। সাধনপথে এমন বিঘ্নও আর কিছু নাই। অধিক বাক্য বলিতে গিয়া অনেক সময়ে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমরা মিথ্যা ব্যবহার করিয়া থাকি। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিয়া ইহা একটি দুরপনেয় অভ্যাসে পরিণত হয়, এবং চিত্তকে অত্যধিক দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। চিন্তাতেও আমরা বড় অসংযত। আমাদের জানা উচিত অনবরত মনের খেয়াল মত মনকে চিন্তা করিতে দিলে উহাকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলা হয়। সুতরাং চিন্তার সংযম অভ্যাস করিতে না পারিলে, আমাদের দুর্গতির সীমা থাকিবে না। কুচিন্তায় মানুষকে যত জীর্ণ করে এমন আর কিছুতে নয়। কুচিন্তা যাহার প্রবল, কুকার্য্য করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। সুতরাং যত অসম্ভব, অনাবশ্যক, আপত্তিজনক চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরিতে দিবে চিত্ত ততই বিক্ষিপ্ত হইবে। স্মরণ রাখা উচিত যে চিত্তসংযমই চিত্তশুদ্ধি। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা আমরা সহৃদয় পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে

বাক্য ও চিন্তার সংযম

চাই। কার্য্যটি শক্ত নয়, একটু মনোযোগ দিয়া করিলে তাঁহারা দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতে পারিবেন। প্রত্যেক শিক্ষিত লোক যদি প্রতিদিন অর্দ্ধ ঘণ্টা লোকশিক্ষার্থ ব্যয় করেন, তাহা হইলে অল্প কয়েক বৎসর মধ্যে সমগ্র দেশে নিরক্ষর লোক আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যতদিন প্রত্যেক নরনারীই বিদ্যালোচনায় বঞ্চিত থাকিবেন, ততদিন দেশের প্রকৃত দৈন্য নষ্ট হইবে কিনা সন্দেহ। প্রত্যেক বিদ্বান্ যুবক যদি সঙ্কল্প করেন যে, তিনি অন্তত একটী নিরক্ষর ব্যক্তিকেও লিখিতে পড়িতে সাহায্য করিবেন তাহা হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধন হইবে। ইহাতে অর্থব্যয় নাই অথচ অতি সহজে লোকশিক্ষার প্রচার হইতে পারে।

ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভোগ অসংযম।

বিষয়ভোগ ও ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতা এ উভয়েতেই আজকাল আমরা খুব অসংযত। সুতরাং আমরা যে, সকল দিক দিয়া অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছি এ বিষয়ে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। প্রাচীন আর্য্য সভ্যতার গতি ভোগের দিকে নহে, ত্যাগ ও সংযমের দিকে। ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়াই আজ আমরা ভোগের জন্য কুকুরের মত দ্বারে দ্বারে ছুটিয়া বেড়াইতেছি। ইন্দ্রিয়ের সংযমেই পুরুষার্থ প্রকাশিত হয়, ইন্দ্রিয়ভোগে লোকে কাপুরুষ হইয়া যায়। বিষয় ও ইন্দ্রিয় ভোগ করিতে করিতে এমন তীব্র ও ঘৃণ্য অভ্যাস হইয়া দাঁড়ায় যে, যখন স্বভাবতই সেই সকল হইতে মনের বিরাম লওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখনও আমরা নির্লজ্জের মত তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না।

সামাজিক ব্যবহারেও আজকাল আমাদের আর কিছুমাত্র সংযম নাই। সকলেই অত্যন্ত অমিতব্যয়ী। বিবাহ, উপনয়ন অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধাদিতে আমরা অত্যধিক ব্যয় করিয়া থাকি। অবশ্য কয়েকটীতে বাধ্য হইয়া আমাদিগকে ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু যেখানে সংযত হইলেও চলে সেখানেও আমরা অসংযম প্রকাশ করিয়া থাকি। ইহাতে দুর্দ্দশার একশেষ হয়। মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা ধনীদিগকে অনুকরণ করিতে গিয়াই একই দুর্দ্দশাকে ডাকিয়া আনেন।

লোকব্যবহার, আহার ও বেশভূষায় সংযম

সকল বিষয়ে সাধ্যমত ব্যয় করিলে অপমান কি? অনেক সময়ে বাধ্য হইয়া ব্যয় করিতে হয় বটে, কিন্তু যাহাতে দুঃখ ও কষ্ট হয়, সেরূপ কার্য্যকে প্রশ্রয় দিলে দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পায়। আমাদের এমনই দুর্দ্দশা হইয়াছে যে, এই সকল বিষয়ে আমরা অপমান বোধ করি, অথচ অপর একটি প্রতিবেশী—হয়তো নিকট আত্মীয়—অভাবে কষ্টে জর্জ্জরিত, তাঁহাকে সাহায্য করিবার সময়, আমরা লজ্জাজনক কার্পণ্যের আশ্রয় লইতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হই না। এ কি দুর্ব্বলতা! এ কি কুশিক্ষা!

তারপর আহারের অসংযমের কথা। ভাবিয়া দেখিলে দেখা যায় যে ইউরোপীয় ও মুসলমানদিগের অনুকরণ করিতে গিয়া আমরা আহার সম্বন্ধে এত অযথা ও অন্যায় অসংযম প্রকাশ করি যে, তাহাতে আমাদের লজ্জা অনুভব করা উচিত। শুধুই কি তাই, ইহাতে ব্যয় এত অধিক হয় যে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা

আরে কুলাইয়া উঠিতে পারেন না। অথচ একদিকে এইরূপ ভোগবাহুল্য, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় অন্নের জন্য কতলোক হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। কর্ম্মভীরু অলস লোকদিগের কথা ছাড়িয়া দিলেও এমন অনেক লোক আমাদের দেশে রহিয়াছে যাহারা যথার্থই অসমর্থ ও দয়ার পাত্র। অর্দ্ধাশন ও অনশনে ইহাদিগকে অর্দ্ধেক দিন কাটাইতে হয়। আমাদের বিলাসকে খর্ব্ব না করিয়া ইহাদের প্রতি উদাসীন ভাব অবলম্বন করা কি প্রকৃতই অধর্ম্ম নহে? পেট ভরিয়া ভাত ডাল খাইয়া হজম করিতে পারিলেই বেশ বলবান্ হওয়া যায়, ইহার জন্য গুরুপাক দ্রব্য না হইলেও ক্ষতি নাই। কিছু কাল আগেও আমাদের দেশে এই ভাত ডাল খাইয়াই লোকে অনেক বীরত্বের কার্য্য করিয়া গিয়াছে; আর অধুনা অন্নের ব্যঞ্জন উপকরণে, মৎস্য-মাংসের কালিয়া-কোপ্তায়, মিষ্টান্নের প্রাচুর্য্যে যতই আমাদের ভোজনপাত্র ঘনাচ্ছাদিত হইয়া পড়িতেছে, ততই আমাদের প্লীহা-যকৃত স্ফীত ও উদরাময় বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সত্ত্বগুণ-প্রধান, ব্রাহ্মণ-প্রধান ভারতবর্ষে এ সব অনাচার অত্যাচার সহিবে কেন? এ সব দানবীয় আহার কি এসব দেশে সহ্য হয়, না এরূপ ভোজনে কোন মঙ্গল হয়? বিষয়ভোগে বৈরাগ্যই এ দেশের আদর্শ। ভোগে কেবল "কর্ম্মভোগ" ই ভোগ করিতে হয়, আর কোন লাভ হয় না। ৫।৬টি তরকারী না হইলে আমাদের খাওয়া হয় না, জিহ্বার প্রতি এই অসংযত অনুরাগ দেখাইতে গিয়া আমরা শরীরের প্রতি কত যে অত্যাচার করি, এবং অনর্থক ব্যয় বাহুল্যে সমস্ত সংসারটাকে

কত যে অভাবের পেষণে নিষ্পিষ্ট করি, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আহার পবিত্র ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত। সে দিকে কিন্তু আমাদের দৃষ্টি নাই, তাই দেশের প্রধান খাদ্য ঘৃত দুগ্ধ আর অবিমিশ্র পাইবার উপায় নাই। ইহাতে স্বাস্থ্য নষ্ট হইতেছে, মন জড় হইয়া যাইতেছে, বুদ্ধির মলিনতা ঘটিতেছে, দেশের লোকের আয়ুক্ষয় ও ধনক্ষয় হইতেছে; কিন্তু সেদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, অথচ দেশের প্রতি মমতার কথা তো সকলের মুখেই শুনিতে পাই!

প্রত্যেক সদ্‌ গৃহস্থকেই এইটি স্মরণ রাখিয়া আহারের ব্যয় সংক্ষেপ করিতে হইবে যে, অন্তত একটি অভুক্ত নিরন্ন ব্যক্তিকে তিনি আহার করাইবেন। এইরূপে প্রত্যেক গৃহস্থ যদি একজনের এক বেলার আহারই সংস্থান করিয়া দেন, তাহা হইলেও দেশের অনেক উপকার করা যাইতে পারে।

ভূষণ-পরিচ্ছদেও আমরা ঠিক এইরূপ অসংযত বরং কিছু বেশী। পুরুষদের সাজ-সরঞ্জাম এবং স্ত্রীলোকদের বসন-ভূষণের জন্য এত ব্যয়বাহুল্য হইয়া পড়িয়াছে যে, লোকে আর সৎপ্রবৃত্তি লইয়া টিকিতে পারে না। অথচ এসব বৃথা ব্যয়মাত্র। বসন-ভূষণে লোকের শোভা যথার্থ বাড়ে কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। না হয় স্বীকার করিলাম, বসন-ভূষণে শোভা বৃদ্ধি করে, কিন্তু সে শোভায় কাজ কি, বাপু, যদি শরীরের শোভা বৃদ্ধি করিতে গিয়া মনোবৃত্তিকে আরও ঢের অশোভন করিয়া তুলিতে হয়? ইহাতে লাভ না ক্ষতি হইল একটু ধীর ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই হয়।

জগতে দুঃখ-ক্লেশের সীমা নাই, কত দুঃখী কত আতুর অসহায় অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার সংখ্যা নাই। পৃথিবীর এই দুঃখ ক্লেশের ভারকে যদি একটুও লঘু করিতে পারি, একটি অনাথ, পীড়িত এবং পতিতকেও আশ্রয় দিতে পারি, বা স্বল্প পরিমাণেও তাহাদের দুঃখমোচন করিতে পারি, তবেই এ জীবনধারণ সার্থক। যিনি সর্ব্বভূতস্থ তাঁহাকে এইরূপে সেবা না করিলে অন্য কিছুতেই তাঁহার পরিতোষ সাধন করা যাইতে পারে না। প্রত্যেক জীবে ভগবান্ আছেন জানিয়া জীবমাত্রের প্রতি করুণাপরবশ হওয়াই যথার্থ মনুষ্যত্ব, এবং এইরূপ পুরুষার্থ সাধনই প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিচায়ক। ইহাই যথার্থ ভগবানের নিকট আত্মনিবেদন। এই হিতানুষ্ঠানে চেষ্টা করিলে সকলেই কিছু না কিছু করিতে পারেন। যেখানে যে কেহ থাকুন না কেন, তিনি সে খানেই কোন না কোন লোকহিতকর কর্ম্ম ইচ্ছা করিলেই করিতে পারেন। অশিক্ষিতকে শিক্ষাদান, ক্ষুধাতুর দরিদ্রকে অন্নদান, অসহায়কে সাহায্য দান, ভীতকে অভয়দান, দুশ্চরিত্রকে উপদেশ দান, অধার্ম্মিককে ধর্ম্মপথে আনয়ন, ইত্যাদি লোকহিতকর কার্য্যের এই দুরবস্থাগ্রস্ত দেশে তো অভাব নাই। নিজের সাধ্য ও সুবিধা মত যে কোন একটি কার্য্য প্রথমে অবলম্বন করিয়া পুরুষার্থ প্রয়োগ করিতে পারেন।

২০। দিনের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক দণ্ডও নির্জ্জনে ধ্যান করিবে। যদি সুবিধা হয় মাসান্তে অন্ততঃ একটি দিনও নির্জ্জনে গিয়া একান্ত চিত্তে সাধনা করিবে। বৎসরান্তে একমাস হ'ক, এক পক্ষ হ'ক, এক সপ্তাহ হ'ক কোন তীর্থস্থানে বা পুণ্যস্থানে গিয়া বাস করিবে। তথায় ওই কয়েকটা দিন কেবল সাধুসঙ্গে, সদালোচনায় ও ভগবদুপাসনায় কাটাইবার চেষ্টা করিবে।

২১। শাস্ত্রবিধিকে অমান্য করিও না, শাস্ত্রাচারকে দ্বেষ করিও না। ঋষিবাক্য ভ্রান্ত মনে করিও না, ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে যুক্তি খুঁজিতে চাহিও না, গুরু বাক্যে অশ্রদ্ধা করিও না। এই সকলকে সদাচার বলে—ইহা দ্বারাই পরমপদ লাভ হয়।

২২। ব্যাধিসঙ্কুল দেহ, অসংস্কৃত মন ও অমার্জ্জিত বুদ্ধি লইয়া ঋষিদিগের সমাধিলব্ধ জ্ঞানকে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। যদি তাঁহাদিগকে বুঝিতে চাও, তবে ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত হও, সংযম অভ্যাস কর, ও তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হও। উপাসনা ও সংযম ব্যতীত, তুমি যত বড়ই পণ্ডিত হও না, তাঁহাদের একটি কথাও বুঝিতে পারিবে আশা করিও না।

একাদশ অধ্যায়

মনুষ্য জীবনে অভ্যাসের প্রভাব এবং তাহার দৃষ্টান্ত

উপদেশ ও উপসংহার

অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশই চরিত্রের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয় এবং চিত্তে বল সঞ্চার হয়। অভ্যাস অনেক সময় ঠিক গ্রন্থির মত কার্য্য করে, তাহা ভেদ করা কঠিন। সদভ্যাসে ঐরূপ চরিত্রের মধ্যে গ্রন্থি প্রস্তুত হয়, যাহাকে ভেদ করিয়া প্রবৃত্তির উত্তেজনা বল প্রকাশ করিতে পারে না। কোন একটি সৎকার্য্য বা সৎচিন্তা অভ্যাস করিতে করিতে পূর্ব্বকৃত অসৎকার্য্য বা অসচ্চিন্তার শক্তি হ্রাস হইয়া আসিবেই আসিবে। এই অভ্যাস অনেক দুশ্চরিত্র লোকের জীবনে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। ইহারই বলে রত্নাকর বাল্মীকি হইয়াছিলেন ; নরপিশাচ জগাই মাধাই ভক্তশ্রেষ্ঠে পরিণত হইয়াছিলেন। সাধুর কৃপায় এবং তাঁহার সংস্পর্শে পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় সত্য, কিন্তু সেই অবস্থাকে ধারণ করিবার জন্য অভ্যাসযোগ আবশ্যক। নিজের পুরুষকার ব্যতীত কেবল মাত্র অপরের কৃপায় কিছুই হয় না। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ বাক্য আছে 'Habit is the second nature.' অভ্যাসের দ্বারা এই চিত্তকে তোমার যেরূপ ইচ্ছা ঠিক সেইরূপে পরিণত করিতে পার। মহাসাধু হওয়া বা অত্যন্ত কুৎসিত চরিত্রের লোক হওয়া সবই

তোমার আয়ত্তের মধ্যে, সবই তোমার অভ্যাস-সাপেক্ষ। অভ্যাসের বলে এই চঞ্চল চিত্তকে নির্ব্বাত প্রদীপ শিখার মত অচঞ্চল করিয়া সমাধিমগ্ন করিতে পার, আবার সংসারসাগরে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া হাবু-ডুবু খাওয়াইতেও পার। ভগবান্ গীতায় স্পষ্টই বলিয়াছেন ঃ—

"অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্॥"

'হে পার্থ, অভ্যাসরূপ উপায় দ্বারা চিত্তকে অনন্যগামী করিয়া এবং সেই চিত্ত দ্বারা দিব্য পরমপুরুষকে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।'

এই স্মরণের অভ্যাস যিনি মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত দৃঢ় রাখিতে পারেন, তাঁহারই পরমগতি লাভ হয়। মৃত্যুর সময় যেরূপ চিন্তার উদয় হইবে, তদনুযায়ী গতি হইবে বটে, কিন্তু মৃত্যুকালে সেই চিন্তাই অবশভাবে উদিত হয়—যাহা আমার চিরকালকার অভ্যস্ত।

ভগবৎস্মরণের অভ্যাস মৃত্যুকালে মুক্তিদায়ক।

ফাঁকি দিয়া কেহ যে মৃত্যুর সময়টিতে মাত্র ভগবৎ স্মরণ করিয়া উদ্ধার পাইবেন, সে ভরসা যেন কেহ না করেন। যেটি সকলের চেয়ে অধিক অভ্যস্ত, সেই চিন্তাই মৃত্যুকালে চিত্তের মধ্যে পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হয়, এবং জন্মান্তর পরিগ্রহও ঠিক তদনুযায়ী হয়। সেই জন্যই ভগবান্ বলিয়াছেন "তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ"—'অতএব আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ কর'—কিন্তু 'যুধ্য চ' কেন?

না চেষ্টা কর—প্রবৃত্তি ও পূর্ব্ব অভ্যাস তো খুব বাধা দিবার চেষ্টা করিবেই অতএব তাহার সহিত যুদ্ধের আয়োজন কর, যেন প্রবৃত্তির উদ্দাম স্রোতে তুমি ভাসিয়া না যাও।

যাঁহারা প্রথম অভ্যাস আরম্ভ করিয়াছেন, অভ্যাসের বলে যতদিন চরিত্র বেশ দৃঢ়, বলিষ্ঠ ও একনিষ্ঠ না হয়, ততদিন অভ্যাসের বেগ কিছুতেই হ্রাস করিবেন না। অনেক সময় এই সংযম বা সাধন অভ্যাস করিতে করিতে আর তাহা মিষ্ট বোধ হইবে না প্রাণ তিক্ত বোধ হইবে,—তথাপি অভ্যাস ছাড়িবেন না। পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় তাঁহার জনৈক শিষ্যকে বলিয়াছিলেন "দেখ, প্রতিদিন নিয়মিতরূপে অল্প সময়ের জন্য সাধন করা কর্ত্তব্য। ভাল না লাগিলেও ঔষধ গেলার মত করিলে, ক্রমে রুচি জন্মিবে। নামে অরুচি হইলে তাহার ঔষধ নামই। যখন পিত্ত রোগে মুখ তিক্ত হয়, তখন মিছরিও তিক্ত লাগে। কিন্তু ঐ রোগের ঔষধ মিছরি। খাইতে খাইতে মিছরি মিষ্ট লাগিতে থাকে। মন স্থির কি সহজে হয়? মন স্থির হইলেই হইয়া গেল। প্রথম প্রথম মন অত্যন্ত অস্থিরই থাকে—নাম করিতে পর্য্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়, কিন্তু ঐ সময় "ঔষধ গেলার" মত নাম করিতে হয়। ক্রমে জোর করিয়া করিতে করিতে যদি উহা একবার অভ্যস্ত হয়, তবে আর গোল নাই। অভ্যাস না হওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িতে নাই, জোর করিয়া করিবে।"

স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য
ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।

পূজনীয় যোগিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় বলিয়া-

ছেন "অনাবশ্যক কথা বলাই লোকদের অভ্যাস; তার চেয়ে যদি সেই সময়টা স্মরণে মন লাগাইয়া রাখে, তবে অনেক লাভ হয়। মন চঞ্চল হয় কেন? না অনবরত বিষয় চিন্তায়। যদি চিন্তাকে সংযত করিয়া অনবরত স্মরণ অভ্যাস করিতে পার তবে চিত্ত অনন্যগামী ও স্থির হইবেই হইবে। অভ্যাস কর তোমরাও দেবতার বাঞ্ছিত অবস্থা লাভ করিবে।"

মামনুস্মরযুধ্য চ।

অভ্যাসের এমনি অচিন্তনীয় প্রভাব যে এক ব্যক্তি রোগে জীর্ণ, জ্ঞানহীন হইয়া পড়িয়া আছেন কিন্তু কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিতে তিনি আজন্ম অভ্যস্ত; সেই কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইলেই তিনি অজ্ঞানাবস্থাতেও অভ্যস্ত কার্য্যটি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এই অভ্যাস সম্বন্ধে একদিন বোলপুর ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত আমার আলাপ হয়। পূর্ব্বে তাঁহার কোন একটি সাধন বা জপাদি অভ্যাসের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। 'ক্রমে মত পরিবর্ত্তন হইয়াছে' এই বলিয়া রবীন্দ্র বাবু একটি গল্প করেন, যতদূর স্মরণ আছে লিখিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পিতৃদেব পূজনীয় ৺ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে গায়ত্রী জপ ও ধ্যান করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেন। রবীন্দ্রবাবু ভাবিতেন "শুধু শুধু কতকগুলা কথা উচ্চারণ ও তাহার প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া লাভ কি, বরং তাহার অর্থ উপলব্ধি করা সঙ্গত হইতে পারে" সুতরাং এ বিষয়ে তিনি প্রথমত বিশেষ মনোযোগ দেন

নাই। তিনি বলেন এখন তিনি ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার পিতৃদেবের অভ্যাসের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন যে, তিনি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের প্রায় সমস্ত ভাগেই শেষ রাত্রে জাগরিত হইয়া গায়ত্রী জপ ও ধ্যান করিতেন। মৃত্যুর কিছুকাল আগেই তিনি মধ্যে মধ্যে পীড়াগ্রস্ত হইতে লাগিলেন। একবার তাঁর খুব অসুখ, কথা বার্ত্তা বলা বন্ধ করিয়াছেন, নড়িতে চড়িতেও তাহার তখন কষ্ট হয়। তাঁহার শুশ্রূষার জন্য নিকটেই তাঁহারা রাত্রিকালে অপেক্ষা করিতেছেন। একদিন রাত্রির শেষভাগে তিনি কেমন আছেন দেখিবার জন্য তাঁহারা গেলেন। গিয়া দেখিলেন সেই দীর্ঘকায় উন্নত পুরুষ ধ্যানযোগে নিমগ্ন। বাহ্য শরীরে তত চেতনা নাই কিন্তু তাঁহার চিত্ত ঠিক ঐ সময়ে জাগ্রত হইয়া ধ্যান ধারণা করিতে অভ্যস্ত ছিল বলিয়া পূর্ব্বাভ্যাস বলপূর্ব্বক অবশ অচেতন শরীরকে সাধনে বসাইতে সমর্থ হইয়াছিল। জীর্ণ; অসুস্থ, বলহীন, শরীর তাঁহার চিরকালের অভ্যস্ত সাধনে বাধা জন্মাইতে পারে নাই! অভ্যাসের এমনি শক্তি!

অভ্যাসের বলে সাধনায় সিদ্ধি।

পরমহংস রামকৃষ্ণ এত সাধন-অভ্যাসে অনুরক্ত ছিলেন যে, তিনি জীবনের অনেক রাত্রি একাকী নির্জ্জনে সাধনাভ্যাসে কাটাইয়া দিতেন। শুনিয়াছি বিভিন্ন বিভিন্ন সাধন পন্থার অনেক গুলিই তিনি অভ্যাস করিয়া ছিলেন। যাহাই হ'ক তিনি সাধনাভ্যাসে যে দৃঢ় প্রযত্ন করিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত। তাহারই ফলে আজ তিনি সমগ্র জগতের পূজা লাভ করিয়াছেন।

৮ পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী—পূর্ব্বাশ্রমে রেলওয়ে আফিসে সামান্য একজন কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কলেজের পাঠ শেষ করিয়া অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার সুবিধা তাঁহার ঘটে নাই সত্য কিন্তু আপনার চেষ্টা, প্রযত্ন ও অভ্যাসের ফলে তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিলেন। দেশবাসীদিগের স্বধর্ম্মে অনাস্থা ও অবিশ্বাস দেখিয়া তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। দেশের লোকের যাহাতে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায়, এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রবল বিরুদ্ধ প্রতিযোগীতার মধ্যেও তিনি বাঙ্গালা ও অন্যান্য প্রদেশের অনেক নগরে ও গ্রামে হরিসভা ও সুনীতি-সঞ্চারিণীসভা প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, দেশের চিন্তাস্রোত ও যুবকদিগের উন্মার্গগামীতার স্রোতকে বিভিন্নমুখে ফিরাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ তাঁহার অসামান্য প্রতিভার ফল। তিনি প্রথম প্রথম ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিতেন, এজন্য তাঁহাকে লেখা এবং বলা দুই অভ্যাস করিতে হইয়াছিল। আফিসে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া আসার পর আবার দুরূহ শাস্ত্রাদি আলোচনা, বক্তৃতা করা, প্রবন্ধ লেখা এ যে কতটা অভ্যাস ও পৌরুষের ফল তাহা সহজে অনুমেয়। অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে বক্তৃতা করা তাঁহার এরূপ অভ্যস্ত হইয়া গেল যে লোকে তাঁহার বাগ্মীতাকে এখনও দৈবশক্তির প্রভাব বলিয়া মনে করে। তাঁহার অবিশ্রান্ত অমৃতবর্ষিণী ভাবময়ী, উদ্দীপণাপূর্ণ ভাষা যে স্বকর্ণে না শুনিয়াছে, তাহাকে

অভ্যাসের দৈবশক্তি লাভ।

বুঝানো কঠিন যে তিনি ভাষায় কি অসাধারণ শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। বেহার প্রদেশেই তাঁহাকে এই কার্য্য প্রথম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল সুতরাং হিন্দী ভাষাতে লিখিবার ও বলিবার অভ্যাসকেও বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিতে হইয়াছিল। বাঙ্গালা দেশের ও বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে তাঁহার ভাবমদিরাপূর্ণ অপূর্ব্ব ভক্তিরসযুক্ত বাঙ্গালা ও হিন্দী ব্যাখ্যানগুলি তাঁহার অকাল মৃত্যুতে তাঁহার সহিতই বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে তাহা যৎ-সামান্য অংশ মাত্র, তাহা পাঠ করিয়াও লোকে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি রসে আপ্লুত হয়। তাঁহার প্রেমবিগলিত, ভক্তিঅশ্রু স্মরণ করিলে আজও জীবন অপূর্ব্ব ভক্তি রসে ভরিয়া উঠে! নিতান্ত দুর্ভাগ্যের কথা এই দেশের তমসাচ্ছন্ন ধর্ম্মাকাশকে যিনি চন্দ্রের মত সুনির্ম্মল রশ্মিজালে আলোকিত করিয়াছিলেন; যিনি দেশের কল্যাণার্থই সমস্ত ভোগ সুখ ও বিলাস বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া ভারতবর্ষের একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত আর্য্যধর্ম্মের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন; যিনি দৈহিক রোগ যন্ত্রণায় কাতর হইয়াও ধর্ম্মপিপাসু ভক্তিমান সজ্জন পুরুষদিগের অন্তরাত্মাকে ভক্তিপীযুষধারায় সুশীতল করিবার সকাতর আহ্বানকে কখন উপেক্ষা করেন নাই—সেই সাধু পুরুষকে তাঁহারই কৃতঘ্ন দেশবাসীরা অকারণে কি লাঞ্ছনাই না করিয়াছে—কিন্তু তিনি মহর্ষি যিশুর মত ক্রুশবিদ্ধ হইয়াও স্বদেশবাসীর কল্যাণ কামনা করিতে কখন বিমুখ হইয়া থাকেন নাই। রোগজীর্ণ শরীর লইয়াও তিনি ধর্ম্মপিপাসু স্বদেশবাসীর আশ্বাসকে উপেক্ষা করিতে

পারেন নাই। কাতর ও দুর্ব্বল শরীরে এইরূপ অতিশয় পরিশ্রম করিয়া জীর্ণ শরীর আরও জীর্ণতর ও ভগ্ন হইয়া গেল। আজ প্রায় ৯।১০ বৎসর হইল তিনি দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহর অভাবে ধর্ম্মজগতের কি ক্ষতি হইয়াছে, তাহা ভাবিলে আজও নয়ন অশ্রুপ্লুত হইয়া উঠে!

অভ্যাসে প্রতিভার বিকাশ।

কাশীর দণ্ডস্বামীদিগের আচার্য্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য ৺স্বামী বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী অনেক বয়স পর্য্যন্ত কিছুই লেখা পড়া শিক্ষা করেন নাই। গায়ে অসাধারণ শক্তি ছিল, কেবল গোঁয়ারতুমি করিয়াই বেড়াইতেন। যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করেন তখনও প্রায় তিনি নিরক্ষর। তার পর বিদ্যাধ্যয়নে এমন অসাধারণ অভ্যাস ও উদ্যম প্রয়োগ করিলেন যে অল্প সময়ের মধ্যেই সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ হইল। যিনি কিছুকাল আগে পড়িতে পর্য্যন্ত জানিতেন না, তিনিই ৩।৪ বৎসরের মধ্যে ৫।৬ ঘণ্টা অনবরত সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রীয় আলাপে বিবুধমণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিয়া দিতেন। তাঁহার অসাধারণ তর্কশক্তির নিকট শুনিয়াছি আর্য্য সমাজ প্রতিষ্ঠাতা সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকেও পরাভব মানিতে হইয়াছিল। প্রতিরাত্রে ৩।৪ ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া আচার্য্যের নিকট শাস্ত্রাধ্যয়ন এবং তথা হইতে রাত্রিশেষে ফিরিয়া আসা—এইরূপ ৪।৫ বৎসর কাল ধরিয়া—অসামান্য প্রযত্ন করিয়াছিলেন বলিয়া একদিন ভারতের সমগ্র পণ্ডিতবর্গ তাঁহার প্রতিভার নিকট মস্তক অবনত করিয়াছিলেন।

ইহা কম পৌরুষের কথা নহে। বিশুদ্ধানন্দ স্বামীর অন্যতম শিষ্য গম্ভীরানন্দ সরস্বতীর নিকট আমরা এই কথা শুনিয়াছিলাম যে শ্রদ্ধাস্পদ গম্ভীরানন্দ জীও তাঁহার সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ দেখিয়া তাঁহাকে পৌরুষের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে করিতেন। দণ্ডী স্বামীদিগের মধ্যে বর্ত্তমানকালে তাঁহার ন্যায় সাহসী দৃঢ়কায় বলিষ্ঠ ও তেজস্বী পুরুষ খুবই বিরল দেখা যায়।

অসাধারণ অধ্যবসায়ী পুরুষ মহাত্মা ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার শিষ্যদিগকে ও জিজ্ঞাসু ভক্তদিগের নিকট কতবার এই অভ্যাসের শক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার নিজ জীবনেও এই অভ্যাস কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বহু দিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে তাঁহাকে কত কষ্ট পাইতে হইয়াছে—তাহা তিনি কতবার নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন। এই মহাত্মার অপূর্ব্ব ভগবদ্ভক্তি ও সুদৃঢ় বিশ্বাস কত উন্মার্গগামী নাস্তিককে ধর্ম্ম পথে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহা মনে হইলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠে।

অভ্যাসের ফলে সংযম।

কাশীর সুবিখ্যাত পরমহংস ৺ভাস্করানন্দ স্বামীকে একজন লোক জিজ্ঞাসা করেন "আপনি এই প্রচণ্ড শীতে কি প্রকারে অনাবৃত গাত্রে থাকিতে সমর্থ হইয়াছেন? আমরা এতগুলি শীতবস্ত্র গাত্রে জড়াইয়াও হিহি করিয়া মরিতেছি।" উত্তরে তিনি বলেন "ইহার কিছুই আশ্চর্য্য নয়, তোমরাও পার এবং কোন কোন

অভ্যাসের ফলে সহনশীলতা।

অংশে দেখিতেছি, তোমরাও বেশ সহ্য করিতেছ।" বিস্মিত হইয়া প্রশ্নকারী জিজ্ঞাসা করিলেন "কই আমরা কোন্‌খানে সহ্য করিতেছি? আমরা তো মোটেই সহ্য করিতে পারি না।" স্বামীজী বলিলেন "দেখ শরীরের সব স্থান তো তোমরা গাত্রাবরণে ঢাকিয়া নাই, এই মুখতো খোলা রহিয়াছে, হাতের আঙ্গুলগুলি খোলা রহিয়াছে, উহারা তো শীতের প্রকোপ সহ্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। তোমরা না হয় না জানিয়া কোন একটা অঙ্গে শীত সহাইবার অভ্যাস করিয়াছ, আমি চেষ্টা ও অভ্যাস দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে শীত সহ্য করিতে অভ্যাস করিয়াছি। ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই, সমস্তই অভ্যাসের ফল।"

কেহ কেহ তর্ক করেন আজকাল আর সাধনা করিয়া কেহ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। যোগাভ্যাস প্রভৃতি কঠোর সাধনা আজকালকার দিনে আর হইবার নয়। পূর্ব্বকালে মুনি-ঋষিদের এ সব সাধ্য ছিল, বর্ত্তমান যুগের ক্ষীণপ্রাণ মানবের পক্ষে যোগাদি অভ্যাস, বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র। কিন্তু তাঁহারা বোধ হয় অবগত ন'ন যে এই ঘোর কলিকালেও কেহ কেহ অভ্যাস ও প্রযত্নের ফলে জ্ঞান ও যোগের চরমশিখরে অধিরোহণ করিয়াছেন। কাশীর সুপ্রসিদ্ধ রাজযোগী ৺শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয় গৃহস্থই ছিলেন। অধিক লেখা পড়াও যে শিখিয়াছিলেন তাহাও নহে। কিন্তু দেশবিখ্যাত বহুশ্রুত পণ্ডিতেরাও তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্ময়াভিভূত হইতেন। না পড়িয়াও তাঁহার সর্ব্বশাস্ত্রে

অভ্যাসের ফলে সিদ্ধিলাভ ও জ্ঞানলাভ।

অধিকার ছিল। দর্শনশাস্ত্রের জটীল তত্ত্বগুলি অতি সহজে লোকের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিতেন। শুধু তাহাই নহে, সমস্ত অনৈক্যের মধ্যে একটী অবিরোধী ঐক্যের তিনি সন্ধান পাইয়াছিলেন। সমগ্রশাস্ত্রের সূক্ষ্ম ও আধ্যাত্মিক ভাবগুলির সুন্দর বিশ্লেষণ তাঁহার গভীর অধ্যাত্মিক জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিত। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকেরাও তাঁহার শরীর সম্বন্ধীয় ও ভেষজ সম্বন্ধীয় জ্ঞান দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সেই জানে যে বৃদ্ধাবস্থাতেও তাঁহার শরীর নেত্র মুখ কি সুন্দর প্রতিভামণ্ডিত ও জ্যোতিঃপূর্ণ ছিল। সংসারের বিবিধ বিচিত্র ঘটনার মধ্যেও তাঁহার প্রশান্ত আনন্দভাব, চিত্তের স্থৈর্য্য, সুখ দুঃখে সমভাব, বাহিরের ঘাত প্রতিঘাতে ঔদাসীন্য, পলকহীন দৃষ্টি ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য কি বালক কি বৃদ্ধ, কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি সন্ন্যাসী কি গৃহী যে কেহ তাঁহার নিকটে আসিত তাহাকেই মন্ত্র মুগ্ধ করিয়া রাখিত। সেই স্বল্পভাষী গম্ভীর জ্ঞানী পুরুষ আপনাতেই আপনি মগ্ন থাকিতেন। নিরবচ্ছিন্ন ধ্যান সমাহিত চিত্ত সংসারের সুখ দুঃখ ভাব অভাবে কিছুতেই বিচলিত হইত না। রাজর্ষি জনকের মত সংসারে থাকিয়াই সংসারের অপর পারে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। বাহিরে বা লোক সমাজে তাঁহার তেমন কোন প্রতিষ্ঠাই ছিল না বটে, কিন্তু তিনি যে ধনে ধনী ছিলেন তাঁহার কাছে পার্থিব শ্রেষ্ঠতম পদও নগণ্য মাত্র ছিল। পার্থিব সম্পত্তি বা সম্মান প্রতিষ্ঠা তাঁহার সেই উচ্চাসনকে স্পর্শ করিয়া কখনই কলঙ্কিত করিতে পারে নাই।

যোগাভ্যাসের বলে এমন অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য তিনি লাভ করিয়াছিলেন, যে তাহার নিকট রাজমুকুটও অতি তুচ্ছ বলিয়া বিবেচিত হইত! তাঁহার কৃপা লাভের আশায় কত পণ্ডিত, কত জ্ঞানী, কত ব্রহ্মচারী, কত দণ্ডী, কত গৃহী, কত ত্যাগী, কত ধনী, কত দরিদ্র প্রতিদিন দলে দলে তাঁহার কাছে আসিয়া উপস্থিত হইত কিন্তু সকলেই তাঁহার নিকট যথাযোগ্য সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া চলিয়া যাইত, কেহ বলিতে পারেন না যে তিনি কখন কাহাকেও অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত শক্তি, সমস্ত প্রতিভা এমন একটি বিনয়ের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিত যে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি ব্যতীত কেহই তাহা ধরিতে পারিত না। তাঁহার পরিজন ও অনুরাগীবর্গেরাও সকলে তাঁহার এই মহিমা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানি না। কারণ তাঁহার কোন বাহ্যিক আড়ম্বর, লোক দেখানো কোন চাল চলন বা কপট বেশভুষা ছিল না। কোন প্রকার বাহ্যিক আড়ম্বর বা মিথ্যাচার তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। অত্যন্ত প্রয়োজন বোধ না করিলে কাহারও কোন কার্য্যে কখন প্রতিবাদ করিতেন না। বেশী কথা কহিতেই পারিতেন না; কথা কহিবেন কি 'মুনিঃসংলীন মানসঃ'—এ রাজ্য তাঁর মন বিচরণ করিত সে রাজ্যের কথা বাক্য দ্বারা বুঝাইবার নয়। সে অবস্থা নিজ অনুভবানন্দরূপ। লোকে যখন ভণ্ডামি করিত, মিথ্যা সাজ গোজে লোককে ভুলাইবার চেষ্টা করিত, তখন তাঁহাদের বালকোচিত ভাব দেখিয়া কখন কখন একটু হাসিতেন এবং বলিতেন ইহারা এমন মূর্খ যে

ভগবানকেও ঠকাইতে চায়। কেহ তাঁহার নিন্দা করিলেও কখন প্রতিবাদ করিতেন না, কেহ সুখ্যাতি করিলেও অনুমোদন করিতেন না। যদি কখন ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন তাহা কেবল এই জন্য যে অবোধ লোকগুলি তাহাদের অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিতেছে, সময়ের মূল্য কত এবং এই সময়ের মধ্যে প্রযত্ন করিলে মানুষ কত লাভবান হইতে পারে, তাহা না বুঝিয়া দুর্ভাগ্য নরনারী বৃথাগল্পে পরচর্চ্চায় অমূল্য সময় নষ্ট করে! তিনি বলিতেন, যে সময়টা আমাদের হাতের মধ্যে আছে, তাহা যদি সদ্ব্যবহার করা যায়, তবে ইহলোকেই লোকে মুক্তির আস্বাদ লাভ করিতে পাবে। লোকের সেই দিকে চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য কতবার কত লোকের কাছে করযোড়ে তিনি কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন। যেন এই সকল মোহমুগ্ধ লোকের দুর্দ্দশা দেখিয়া, তাঁহার করুণ প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিত। এমন নিরভিমান পুরুষ ছিলেন যে একদা তাঁর জনৈক শিষ্য তাঁহাকে একদিন বলিল "মহাশয় অমুক ব্যক্তি আপনার বড় নিন্দা করে, শুনিলে বড় কষ্ট হয়,—মহাপুরুষ তখনি উত্তর করিলেন 'আপনিও সেই কথায় সায় দিতে পারিতেন, এক কথায় সব ফুরাইয়া যাইত, বাক্য বৃথা বাড়াইয়া লাভ কি? কে কা'কে কি বলিতেছে ও সব কথায় মন না দিয়া প্রাণপণ যত্নে সাধনা করিয়া চলুন, ইহাতেই জীবন কৃতার্থ হইবে'। তাঁহার ন্যায় শ্রেষ্ঠ সাধকগণ স্বভাবতঃই অভিমান, যশ বা লক্ষ্মী কিছুতেই আসক্ত হ'ন না, সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইলেও ইঁহাদের কোন ক্ষোভ নাই, কারণ সাধন প্রভাবে মহাসাগরের তরঙ্গরাশির ন্যায় সংসার বাসনা তাঁহারা

অতিক্রম করিবার উপযুক্ত শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। আজ কত দিন হইল (১৮৯৫ খৃঃ শারদীয়া মহাপূজার মহাষ্টমীর দিন) তাঁহার দেব দেহের অবসান হইয়াছে, কিন্তু এখনও তাঁর চিত্তের প্রশান্ত আনন্দময়ভাব সুখে দুঃখে একরূপ স্থিরগম্ভীর ভাব তাঁহার অনুরাগীবর্গের স্মৃতিকে আনন্দরসে অভিসিঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে!

পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের ব্যাস বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, কপিলমন্বাদি শ্রেষ্ঠ মুনিঋষিগণ সকলেই পুরুষকারের পক্ষপাতী ছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক দিগের মধ্যেও বুদ্ধদেব শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অসামান্য ধীসম্পন্ন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকোত্তর পুরুষগণ পুরুষকারকেই গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। অত্যন্ত আধুনিক রাজা রামমোহন রায়, যিনি বর্ত্তমান যুগের স্বস্তিবাচন করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাকে পুরুষকারের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়, ঋষিকল্প ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমর বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ মনীষীরাও এই পুরুষকার প্রভাবেই খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। আরও অনেক লোকের নাম করিতে পারা যায় যথা কৃষ্ণদাস পাল, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতি—ইঁহারা সামান্য অবস্থা হইতে পুরুষকার প্রভাবেই সমাজে শীর্ষ স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সকলের কথা লিখিতে গেলে স্থান কুলাইবে না—এখানে পূজ্যপাদ ভূদেবচন্দ্র সম্বন্ধেই ২।১ কথা বলিতে ইচ্ছা করি। ভূদেব

ভারতবর্ষের অতীত ও বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা পুরুষকারের পক্ষপাতী।

বাবু অনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। এই দরিদ্র অথচ খাঁটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে যখন সম্যক ইংরাজি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠীত ছিলেন, তখনও ব্রাহ্মণের রীতি নীতির একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। আজকাল প্রায়ই দেখি যিনি একটু মোটা মাহিনার চাকর, তিনি আহারে, পরিচ্ছদে তো সাহেব সাজেনই তার উপর হিন্দুর আচার, বিচার, ধর্ম্ম মানিয়া চলা তত আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না; কিন্তু এই দেশবিশ্রুত পুরুষটি কার্য্যক্ষেত্রে সাহেবদের সঙ্গে অবাধে মিশিয়াও পূর্ব্বতন প্রাচীন পন্থাকে অনুসরণ করিতে কখনও লজ্জাবোধ করেন নাই। অথচ ইঁহার সমসাময়িক, সহপাঠীবৃন্দেরা অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছিলেন। ইহার একমাত্র কারণ স্বদেশের প্রাচীন রীতিনীতি, শাস্ত্র ও ঋষিদিগের প্রতি জাতশ্রদ্ধ ছিলেন বলিয়া এবং বাল্যকালের অভ্যাস ও সংস্কার, এতই তাঁহার প্রবল ছিল যে ইহা হইতে উচ্চবিজ্ঞান, পাশ্চত্য দর্শন, এবং উচ্চপদ কিছুতেই তাঁহাকে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই।

পরম ভাগবৎ শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী একজন আদর্শ বিনয়ী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ভক্তিমান পুরুষ। তিনি কি বালক কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রীলোক এমন কি ভৃত্যদিগের নিকটেও কখন অবিনয় বা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার স্বভাবটি এমনি মধুর, যিনি কখন তাঁহার সঙ্গ করিয়াছেন তিনিই

শ্রীযুক্ত গৌরীপদ চক্রবর্ত্তী।

মোহিত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে বিনয় গুণের আধার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ইনি একজন পেন্সেন-প্রাপ্ত পদস্থ পুলীশ কর্ম্মচারী। আমি দেখিয়াছি একজন সামান্য কনেষ্টবলের সহিত ও তিনি কখনও অসম্মানের সহিত কথা কহিতেন না। অতি সামান্য লোক হইলেও তিনি তাঁহার প্রতি ভদ্রোচিত ব্যবহার করিতে কখন কুণ্ঠিত হইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। শুনিয়াছি নবীন বয়সেও তিনি কখন কাহারও সহিত অভদ্র ব্যবহার করেন নাই। বাস্তবিকই বাল্যকাল হইতে যদি এই শীলতা তাঁহার হৃদ্গত না হইত, তবে পুলিশ বিভাগের আওতার মধ্যে চরিত্রের মাধুর্য্য ও কোমলতা এবং পুরুষোচিত দৃঢ়তা যুগপৎ স্থির রাখা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইত। পুলিশ বিভাগে তাঁহার মত উদার ভক্তিমান উচ্চ ধর্ম্মনীতিজ্ঞ পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে বঙ্গ দেশের সৌভাগ্যের কথা ছিল। এই গ্রন্থের প্রথম প্রচারের সময় এই পরম ভাগবৎ ঋষিকল্প পুরুষ জীবিত ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল তিনি ভক্তিলভ্য দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। এমন প্রেমনিষ্ঠ ভক্তি বিগলিত চিত্ত জীবন অল্পই দেখিয়াছি। অথচ কি সুদৃঢ় পৌরুষ তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। যুগপৎ এই দুটি গুণের মিলনে তাঁহার জীবন এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের কার্য্যাবলী সমালোচনা করিলে মনে বড় আশার সঞ্চার হয়। সংসারী হইয়াও দৃঢ় ভক্তি বিশ্বাস ও জ্ঞানে কি সুমেরুর মত অটল।

ঋষিকল্প পূজ্যপাদ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের পবিত্র জীবনটিও একটী সদভ্যাসের উজ্জ্বল উদাহরণস্থল। তাঁহার সমস্ত জীবনটি

তত্ত্বালোচনা ও গভীর দর্শনশাস্ত্রের জটিলতত্ত্ব গুলির মীমাংসায় ব্যাপৃত, কাজে কাজেই সংসারের বিবিধ ভোগবাসনা, ছলনা চাতুরী ও দুশ্চিন্তা তাঁহার জ্ঞান প্রাচীরের সুদৃঢ় বেষ্টন অতিক্রম করিয়া কোন দিনই তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিতে পারে নাই। সংসারের কোন জঞ্জাল যে সেই চিত্ত মধ্যে থাকিতে পারে তাহা তাঁহাকে দেখিলে কিছুতেই মনে হয় না। এই প্রাচীন বয়সেও তাঁহার চরিত্র শিশুর মত সরল এবং জ্ঞানোদ্ভাসিত। একটি মাধুর্য্য তাঁহার সমস্ত মুখমণ্ডলে দেদীপ্যমান। জ্ঞানোলোচনায় দীর্ঘজীবনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয়িত হইয়াছে বলিয়াই সংসারের অন্য বিষয়গুলি দৃঢ় ভাবে তাঁহার অভ্যস্ত হইতে পারে নাই—সুতরাং তাঁহার চরিত্রের বিষয়ের কোন দাগ পড়িতে পারে নাই। এই মহান চরিত্রবান পুরুষের নিকট হইতে আমাদের এইটি বিশেষ শিক্ষার বিষয়—যে জীবনের প্রথমাবধি চিত্তগতিকে যে দিকে ফিরাইয়া রাখিবার অভ্যাস করা যাইবে, জীবনের উত্তর কাল পর্য্যন্ত সেই অভ্যাস শক্তিই তাহার জীবনকে তদভিমুখী করিয়া রাখিতে বাধ্য করিবে এবং ক্রমে অভ্যাস স্বভাবে পরিণত হইবে! এতদ্ভিন্ন ঐশ্বর্য্যের মধ্যে লালিত হইয়াও মানুষ সদভ্যাসের বলে যে কতদূর সৎ ও সুন্দর হইতে পারে তাহাও এই মহাত্মার জীবনে পূর্ণ পরিস্ফুট! তাঁহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিলে, দুইদণ্ড তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিলে, তাঁহার সরল প্রাণের সত্য কথাগুলি শুনিলে এবং সেই দেশবিশ্রুত প্রাণভরা শিশুর মত সরল হাঁসি শুনিলে মনে হয়

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

যেন অতীত যুগের তপোবনে কোন ঋষির কাছেই বসিয়া আছি।

শ্রীমৎস্বামী শিবনারায়ণ:—এই মহাত্মার জীবনও জীবনী প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক মনে করি। পরমহংস মহারাজ নির্ব্বিরোধী সন্ন্যাসী হইয়াও, লোকের মঙ্গলের জন্য আজীবন চেষ্টা ও যত্ন করিতে ত্রুটি করেন নাই। জীবনটিকে তিনি যে সুমহতী সাধনা দ্বারা দৃঢ় ও উজ্জ্বল করিয়াছিলেন এবং জীবনের মহান্ লক্ষ্য যাহা তিনি সাধনলব্ধ অন্তরদৃষ্টি প্রভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তিনি উচ্চকণ্ঠে সকলের নিকট ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাণী ও বিশ্বাসের মধ্যে যে একটি প্রচণ্ড বল ছিল তাহা কেহ অল্প তপস্যার দ্বারা লাভ করিতে পারে না। যাহা তিনি পাইয়াছিলেন জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কোন ঘটনা তাহা হইতে তাঁহাকে স্খলিত করে নাই—ইহা সাধারণ অভ্যাসের ফল নহে। তাঁহার সাধনা সম্বন্ধে জ্যোতি রচয়িত্রী শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীমতী হেমলতা দেবী আমাকে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, আমি এস্থলে তাহা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম:—

"৺পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী পশ্চিম দেশে ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন ইহা ছাড়া তাঁহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আর কোন বিবরণ জানা যায় নাই। তিনি বাল্যকালে আপন পিতা কর্ত্তৃক ওঙ্কারমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক সবিতার তেজ ধ্যান করিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং অন্তর্যামী প্রেরণায় অর্থাৎ স্বাভাবিক অনুরাগের দ্বারা একান্ত

যত্নে ইহাতে প্রবৃত্ত হইয়া আর্য্যজাতির তপস্যালব্ধ সত্যের সারজ্ঞানে উপনীত হইয়া পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছিলেন।

এই প্রকাশমান তেজোমণ্ডলে পরমপুরুষের ধ্যান ধারণায়, তাঁহার অন্তরে, সমুদয় বিশ্ব এক অখণ্ডযোগে প্রতীয়মান হইয়াছিল; এবং সেই পরমপুরুষেরই প্রেরণায় তিনি এই মহাসত্যকে সম্পূর্ণভাবে আবরণমুক্ত করিয়া, বিশুদ্ধ মূর্ত্তিতে, এক্ষণে বিশ্বের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে হিন্দুজাতির মূলধর্ম্ম সমগ্র মনুষ্যজাতিকে আলিঙ্গন করিবার, সমগ্র বিশ্বের সহিত একান্ত ভাবে মিলিত হইবার অধিকার রাখে; এবং সমগ্র জগতের সারসত্য এই তপস্যালব্ধ আনন্দের মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে।

স্বামিজী অগ্নিকার্য্য করিতে আদেশ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রের ইহাতে সমভাবে অধিকার আছে ইহা বারম্বার মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—ইহাতে সকল মনুষ্যে সমভাবের উদয় হয় ও অগ্নিকার্য্যের দ্বারা অন্তঃকরণ গ্লানিশূন্য হইয়া বিশুদ্ধিতা লাভ করে। যিনি প্রকাশ অপ্রকাশ অর্থাৎ আলোক অন্ধকারকে লইয়া প্রত্যক্ষ বিরাজমান, তাঁহাকে প্রকাশ অপ্রকাশ বা আলোক অন্ধকারের যোগে প্রত্যক্ষ করিলে অন্তর ও বাহির পরম শান্তিতে ভাসমান হয় ইহাই তাঁহার শেষ কথা।

যে কেহ পরমাত্মার দর্শন মানসে প্রীতিপূর্ব্বক এই সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন তিনি আশা তৃষ্ণা লোভ লালসা ইত্যাদির সমুদায়

বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শান্তিস্বরূপ পরমানন্দের অধিকারী হইবেন ইহা তিনি একান্ত দৃঢ়তার সহিত ভূয়োভূয়ো উল্লেখ করিয়াছেন।

পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী অতি অল্পকাল পূর্ব্বেই শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিলেন। বর্ত্তমান কালের বহু লোকেই তাঁহাকে দেখিয়াছেন কিন্তু খুব অল্পলোকেই, আত্মার প্রতি তাঁহার অন্তরের অসামান্য প্রেম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। যাঁহারা একবার তাহা অনুভব করিয়াছেন তাঁহাদের আর তাহা ভুলিবার কোন উপায় নাই।"

শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়—ভাগলপুর টী, এন, জুবিলি কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পণ্ডিতবর হরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত এমন নিরহঙ্কার সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি খুব অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে দেখিলে বা তাঁহার সহিত কথা কহিলে তিনি যে একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত ইহা বুঝাও যায় না। প্রভূত পাণ্ডিত্য বিনয়ের আবরণে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি এই সংসারের সুখদুঃখের বোঝা যথার্থ ভক্তের মত নীরবে বহন করিয়া, চলিতেছেন;—ইহার কিছুই আকস্মিক ঘটনা নহে। সমস্তই সুদৃঢ় অনুশীলনের ফল। কয়েক বৎসর হইল এই মহানুভব পুরুষেরও লোকান্তর ঘটিয়াছে।

৺যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস:—আমার ভ্রাতৃপ্রতিম বন্ধু স্বর্গীয় যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস বাল্যকালে ও কৈশোর অবস্থায় অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। দুষ্টামি, মারামারি, ঝগড়া. না করিয়া তিনি কিছুতেই

থাকিতে পারিতেন না। এমন দিন ছিল না যে তজ্জন্য তিনি বিদ্যালয়ে দণ্ডিত না হইতেন। আমার দেখিয়া বড় কষ্টবোধ হইত, কারণ যতীন্দ্রনাথ দুষ্ট হইলেও বড় বুদ্ধিমান মেধাবী বালক ছিলেন। পড়াশুনাতেও তিনি তাঁহার ক্লাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বালক ছিলেন। কিন্তু এই প্রকার কুকার্য্যনিরত থাকিলে অধিক দিন হয়তো তাঁহার প্রতিভা সমুজ্জ্বল থাকিত কি না সন্দেহ। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছায় তাহার মতির পরিবর্ত্তন ঘটিল, তিনি আপনার সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা শীঘ্রই বুঝিতে পারিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এত দৃঢ় অভ্যাস সাধন করিতে লাগিলেন, যে এক বৎসরের মধ্যেই লোকে তাঁহার অচিন্তিত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইতে লাগিল। তাঁহার সাধনা যথার্থই প্রশংসার্হ। এখন হইতে তিনি প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রবল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় কত রাত্রি তাহার অনিদ্রায় কাটিয়াছে। প্রাণান্ত কষ্ট হইতেছে, প্রলোভনের বস্তু নিকটে, তথাপি প্রবৃত্তির করে আত্মসমর্পণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। দৈব দুর্ব্বিপাকে পূর্ব্বাভ্যাসের প্রবলবেগে যে দিন পরাজিত হইতেন, সে দিন তাঁহার অশ্রুধারায় বক্ষস্থল অভি-ষিক্ত হইত, মুখে তাঁহার কেহ হাঁসি দেখিত না। যে কিছুকাল আগে অত্যন্ত দুরন্ত, অসহিষ্ণু ও বাচাল ছিল, সেই যতীন্দ্রনাথ অভ্যাসের প্রভাবে অচিরেই অচঞ্চল, সহিষ্ণু, মৌনী ও গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সতীর্থ ও বন্ধুবান্ধবেরা অবাক হইয়া গেলেন। সে চপলতা, সে ঊদ্ধত্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে—আজ কাহার চরণপদ্ম পানে তাহার সমস্ত চিত্ত ভূলুণ্ঠিত হইয়া প্রণত

হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে। কোন অপার্থিব লোভনীয় বস্তুর জন্য তাহার চিত্ত আজ সমগ্র জগতের পানে উদাসীন হইয়া পড়িয়াছে। কতদিন হইতে গোপনে গোপনে সে আপনাকে প্রস্তুত করিতেছিল লোকে তাহা বুঝিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় নাই। কষ্ট সহিবার অভ্যাস এত অধিক হইয়াছিল যে মেসে দীর্ঘকাল ধরিয়া পাচক ও চাকর নাই, তিনি জল আনা হইতে ঘর পরিষ্কার করা পর্য্যন্ত সমস্ত কাজই স্বহস্তে করিতেন, অথচ তজ্জন্য কেহ কোন দিন তাঁর মুখ অপ্রসন্ন দেখে নাই। আজ কতদিন যতীন্দ্রনাথ এই মরধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সুমধুর স্মৃতি, সদভ্যাসে উজ্জ্বলীকৃত দৃঢ় চরিত্র আজিও আমরা বিস্মৃত হইতে পারি নাই।

প্রফুল্লনাথ মজুমদার।

আমার সহোদরকল্প বন্ধু স্বর্গীয় প্রফুল্লনাথ মজুমদার জীবনে যে দিন বুঝিতে পারিলেন যে ব্রহ্মচর্য্যবিহীন হইয়াই আমাদের এত দুর্দ্দশা হইয়াছে সেই দিন হইতে তিনি আপনাকে নিয়মিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কয়েকটি প্রবঞ্চক বন্ধুর বেশে তাঁহাকে বিপথগামী করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে তাহারা বিশেষ বিপন্ন করিতে পারে নাই। সেই দিন হইতে তাঁর মনে ধারণা জন্মিল শুধু আপনাকে রক্ষা করিলে চলিবে না, সহপাঠী বন্ধুবান্ধবদের মতি গতি পরিবর্ত্তিত করিতে না পারিলে বর্ত্তমান অধঃপতনের খরস্রোত হইতে এই স্বজাতিকে উদ্ধার করা অসম্ভব। তাই তিনি ইহাকেই জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যুবকদিগকে দেখিলেই তিনি তাঁহাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য তাহাদিগকে একান্ত আগ্রহের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ দিতেন। শুধু উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, যাহাতে তাহারা উপদেশ কার্য্যে পরিণত করে তজ্জন্য বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। অবশ্য তাঁহার পবিত্র ও উন্নত চরিত্রই অনেক পরিমাণে যুবকদিগকে আকৃষ্ট করিত। তিনি শুধু বাক্যবীর ছিলেন না। কার্য্যে জীবনে, ও চিন্তায় তাঁহার এমন মিল ছিল যে লোকে তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পারিত না। স্বয়ং প্রত্যহ শেষ রাত্রে জাগ্রত হইয়া শৌচাদি সমাপনান্তে স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া, অধ্যয়নে নিযুক্ত হইতেন; আবার মধ্যাহ্নে স্নান সন্ধ্যা এবং সায়ংকালে স্নান সন্ধ্যা করিতেন। তাঁহার শরীর খুব বলিষ্ঠ ছিল। হৃদয় এত করুণায় পূর্ণ ছিল যে একজন অস্পৃশ্য নীচ জাতিও বিপদগ্রস্ত হইলে প্রফুল্লনাথ তাহাকে সাহায্য করিতে কখন ঘৃণা বোধ করিতেন না। যেখানে দুষ্কর্ম্মকারীরা আপনাদের দুষ্কর্ম্মের ভারে প্রপীড়িত সেইখানেই প্রফুল্লনাথ তাহাদিগকে সদুপদেশ দ্বারা শান্ত করিতেছেন; যেখানে দারিদ্র্য সেইখানেই প্রফুল্লনাথ আপনার কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় করিতেছেন, যেখানে কেহ অনাথ বা অনাথা আশ্রয়াভাবে ক্লিষ্ট হইতেছে প্রফুল্লনাথের সকরুণ দৃষ্টিপাত তাহার উপর পড়িবেই। একদিকে বলিষ্ঠ শরীর উচ্চ অন্তঃকরণ ও জ্ঞানের ঔজ্জ্বল্য, অন্যদিকে কঠোর পরিশ্রমী কর্ম্মী, একদিকে প্রেমপূর্ণ হৃদয়—অন্যদিকে কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, তাঁহার চরিত্র ও জীবনকে কি মধুময়ই করিয়াছিল। প্রফুল্লনাথ

কত উচ্ছৃঙ্খল উদ্ধত নবীন যুবকদিগকে মহাবিনাশ হইতে রক্ষা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে! তিনি নিজের চেষ্টায় আপনার জীবন পুষ্পটিকে দেবপূজার উপযুক্ত করিয়া যথার্থ দেবতা হইয়া গিয়াছেন—তাঁহাকে দেখিলে পুরুষকারের যেন জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত। তিনি কত কঠোর ব্রাহ্মণোচিত নিয়ম নিষ্ঠা আচরণ করিতেন অধ্যয়ন ও লোকহিতকর কার্য্য করিতেন কিন্তু কোনদিন তজ্জন্য শরীর পীড়িত বা অসুস্থ হইত না। অভ্যাসবলে এই সকল কঠোরতা তাঁহার প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছিল। এখন তিনি কোন্ অদৃশ্য সুরপুরে শান্তি সুখ অনুভব করিতেছেন, কিন্তু আজিও তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও সহযাত্রীরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতি বক্ষে বহন করিয়া প্রতিদিন প্রেমাশ্রু ও ভক্তি অর্ঘ্য দ্বারা তাঁহার বরণীয় চরিত্রকে পূজা করিয়া কৃতার্থ হইতেছেন!

৺পরমহংস স্বামী দয়ালদাসজীর (শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর গুরু) একজন শিষ্য আছেন, তাঁহাকে সকলেই যোগীজি মহারাজ বলিয়া

ভোজনে অসাধারণ সংযম

ডাকে; তিনি খুব বৃদ্ধ, এখনও বোধ হয় জীবিত আছেন। শুনিয়াছিলাম তিনি আহার ত্যাগ করিয়াছেন। ১০।১৫ দিন অন্তর সামান্য একটু ভোজন করেন। আবার সে বৎসর হরিদ্বার কুম্ভ মেলায় গিয়া তাঁহাকে দেখিলাম, তিনি একমাস অনাহারে রহিয়াছেন, অথচ শরীর তজ্জন্য কিছুমাত্র বলহীন হয় নাই। আহার বিষয়ে এতটা সংযম খুব সুদৃঢ় অভ্যাসের ফল।

আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্তশৌরীন্দ্র মোহন গুপ্তের মাতা, যাঁহাকে আমি জননী বলিয়াই জানি—যাঁর স্নেহ, দয়া, তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য হিন্দু রমণী মাত্রেরই অনুকরণীয়—তিনি আশ্চর্য্য রকম সহ্যগুণ অভ্যাস করিয়াছেন। পাহাড়ে তীর্থ দর্শনে গিয়া গাড়ি উল্টাইয়া একটি পদ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে, তথাপি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে নাই। উৎকট দৈহিক পীড়া এমন অক্ষোভে সহ্য করিয়াছেন, দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। রমণীর সহ্যগুণ অনেকটা স্বাভাবসিদ্ধ বটে কিন্তু তাঁর মত সহ্যগুণ কদাচিৎ দেখা যায়। বহুদিনের অভ্যাস না থাকিলে লোকের চিত্ত এতটা দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু হয় না।

এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণের সময় তিনিও জীবিত নাই। সমস্ত জীবনে যে ব্রহ্মচর্য্য ও তপোনিষ্ঠা ছিল তাহার শেষফল তিনি মৃত্যুকালেও দেখাইয়া গিয়াছেন। রোগের তীব্র যাতনাও তাঁহাকে চিরাভ্যস্ত সংযম হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। পুরুষোত্তমধামে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত ভগবৎ নাম গ্রহণ করিতে করিতে যোগীজনোচিত দিব্যধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

আর একটী আদর্শ সহনশীলতা ও ভগবৎ নির্ভরের দৃষ্টান্ত না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমার পরম পূজ্যপাদ বন্ধু ৺কৃষ্ণারাম ব্রহ্মচারী কাশীর রাণামহলে ৬৪ ঘাটের নিকটে বাস করিতেন। তিনি একজন আদর্শ সাধু পুরুষ ছিলেন। অসাধারণ ধৈর্য্য, সহ্যগুণ এবং ভগবৎ নির্ভর তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব ছিল। স্ত্রী বিয়োগ ঘটিল,

৺কৃষ্ণারাম ব্রহ্মচারী।

উপযুক্ত জ্যেষ্ঠ পুত্রটি অকালে কাল কবলিত হইল, তৃতীয় পুত্রটি জ্বররোগে ভুগিয়া ভুগিয়া যৌবনে পদার্পণ করিতে না করিতে লোকান্তরে চলিয়া গেল, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। মাতৃহীন রুগ্ন বালকটিকে তিনি যেরূপ সেবা ও যত্ন করিতেন, আমি ভাবিতাম, এই বালকের মৃত্যুর পর কৃষ্ণারাম অত্যন্ত শোক পাইবেন। বালকটির মৃত্যুর পরদিন গিয়া তাঁহাকে দেখি যেন সংসারে কোন দুর্ঘটনাই ঘটে নাই—বেশ শান্ত ও নিশ্চিন্ত। সেই মধুর হাস্যজ্যোতি, সেই স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য্য মুখের চারিদিকে বিকীর্ণ! তাঁর এ রকম অবস্থা দেখিয়া আমি ধারণা করিতেই পারি নাই যে গত রাত্রে তাঁহার পুত্রব দেহান্ত ঘটিয়াছে, সুতরাং তাঁহার পুত্র কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি প্রসন্ন মুখে উত্তর করিলেন "তাঁহার কাশীলাভ হইয়াছে।" শুনিয়া তো আমি নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! তাঁর আয়ের কোন স্থায়ী ঠিকানা ছিল না, অথচ পোষ্য অনেকগুলি ; শুধু তাহাই নহে, অতিথি অভ্যাগতের সমাগম ও বিলক্ষণ ছিল, কিন্তু তথাপি একদিনের জন্যও কেহ তাঁহাকে কখন উদ্বিগ্ন দেখে নাই। সময়ে সময়ে এমন অভাবের মধ্যে পড়িতেন, যে দিন চলা ভার হইত কিন্তু তথাপি কাহারও নিকট প্রার্থনা করিয়া লোককে উদ্বিগ্ন করিতেন না। পাছে দিতে না পারিলে অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কষ্ট পান, এইজন্য তাঁহাদিগের নিকটেও অভাব জ্ঞাপন করিতেন না। অথচ সন্ধান করিয়া যখন তাঁহার অভাবের কথা আমরা জানিতে পারিতাম, তখন অনেক অনুযোগ করাতে তিনি একটু হাঁসিয়া বলিতেন "না বলিলেও যিনি যোগাড়

করিয়া দিতেছেন, আর তাঁহাকে বলিয়া কি জানাইব। তিনি জানেন না এমন তো নয়—প্রয়োজন হইলে তিনিই বিধান করিবেন।" এমন আশ্চর্য্য লোক ছিলেন, কত লোক কত ফরমায়েস্ তাঁহাকে করিত, কত কাজের ভার তাঁহার স্কন্ধে চাপাইত, তিনি কুলীর মত সেই সকল কার্য্য কুণ্ঠাবিহীন চিত্তে সমাপন করিয়া দিতেন, অথচ কখনও তজ্জন্য কাহার কাছে প্রার্থী হইতেন না, পাইবার আশাও রাখিতেন না। যে মনোযোগ করিয়া যাহা কিছু দিত, তাহাই প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করিতেন, না দিলেও কোন ক্ষোভ ছিল না। লোকের কাজ কর্ম্ম লইয়া সময়ে সময়ে সারাদিন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেন, কিছু বলিলে বলিতেন "মহারাজ আমার তো নিজের কোন কাজ নাই, অন্য লোক কাজ দিলে সুতরাং আমি করিতে বাধ্য! আমি সেই তো বসিয়াই থাকিতাম!" পরিচিত অপরিচিত সকলেই তাঁহাকে দিয়া কাজ করাইয়া লইত, তিনিও কোন দিন তজ্জন্য কোন আপত্তি করিতেন না। তাঁহার গৃহে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং অনেকগুলি শালগ্রাম শিলা ও মহাদেবের সেবা ছিল, তজ্জন্য পৌষ, মাঘ মাসের দুরন্ত শীতেও প্রাতঃস্নান সমাপনান্তে প্রায় অনাবৃত অবস্থায়, ভক্তি বিগলিত চিত্তে সেই সকল বিগ্রহগুলির পূজার্চ্চনা করিতেন। এত যে অভাব ছিল, তজ্জন্য কিছু ক্ষোভ ছিল না। যদি গৃহে কিছু খাবার থাকিত, তাহাও প্রতিবেশী—ইতর জাতির শিশুদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। মিষ্টদ্রব্যের লোভে প্রত্যহই শিশুরা তাঁহার দ্বারের কাছে আসিয়া ভিড় করিত। তাহারা কত গোলমাল উপদ্রব করিত, কিন্তু তজ্জন্য কখন বিরক্ত

হইতে দেখি নাই। আবার এদিকে পরম বৈরাগ্যবান পুরুষ ছিলেন। তাঁহার চরিত্রের কোন স্থানে দাগ ছিল না। কেমন সরল, সবল, সহিষ্ণু ও স্থির চিত্ত। ঠিক তেমন লোকটি আর দেখা যায় না! একটি অতিবৃদ্ধ মূক বধির পুরুষকে অনাহারে মৃতপ্রায় দেখিয়া গঙ্গার ঘাট হইতে নিজ গৃহে তুলিয়া আনেন। তাঁহার সেবার গুণে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই বৃদ্ধ সতেজ ও সবল হইয়া উঠিল। সুস্থ হওয়ার পরও সেই অসহায় বৃদ্ধ কৃষ্ণরামজির আশ্রয়েই রহিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে তাহার রোগ, উদরাময় বাটীর অন্যান্য পরিজনবর্গকে বিরক্ত করিয়া তুলিত, কিন্তু কৃষ্ণরাম হাস্যমুখে তাহার সমস্ত ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া দিতেন, একদিনও তজ্জন্য তাহাকে কোন রূঢ় কথা বলেন নাই! বোধ হয় বৃদ্ধ পিতাকেও লোকে অত সেবা করিয়া উঠিতে পারে না। এমনই তাঁহার সুন্দর চরিত্র ছিল, পথের পথিক ও যে একবার তাঁহাকে দেখিয়াছে, বা তাঁহার সহিত একটিবার কথা কহিয়াছে সে কখনও তাঁহার সেই মাধুর্য্যবিমণ্ডিত হাস্যপূর্ণ মুখমণ্ডল ভুলিতে পারিবে না। অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্যের জীবন্ত প্রমাণ-স্বরূপ প্রৌঢ় বয়সেও তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ দেহ, যুবকোচিত লাবণ্য ও শ্রমপটুতা সকলের চিত্তকেই আকৃষ্ট করিত। তাঁহার গুরুভক্তিও অসাধারণ ছিল। চরিত্রের এত সৌন্দর্য্য এতগুণ যাঁর তাঁহাকে কতকষ্টে কত পরিশ্রমে যে ইহা লাভ করিতে হইয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকা যায় না। বাল্যকালের কত সঙ্গী তাঁর এখনও আছে, অথচ তিনি কখন কেমন করিয়া নীরব সাধনায় সকলের অগোচরে, আপনাকে এতদূর

উচ্চ স্থানে উপনীত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আপনার মনঃ প্রাণ বিশ্ব দেবতার চরণে অঞ্জলি দিবার সামর্থ্যলাভ করিয়াছিলেন—তাহা আমরা কেহই জানি না—কিন্তু তাঁহার অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভের কথা মনে করিলে, তাঁহার বিরাট অথচ সুন্দর মনুষ্যত্বের প্রতি একটি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং বিনা তর্কেই তাঁহার নিকট এই মস্তককে অবনত করিতে ইচ্ছা করে। হায়! এখনও সেই কাশীই আছে, কত সাধু সজ্জন, সদ্বিদ্বান সেখানে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু কৃষ্ণরামের ন্যায় অমন উদার ত্যাগী, ভক্তিনিষ্ঠ প্রেমিক সাধু পুরুষ আর দৃষ্টি গোচর হয় না। কত স্থানে গিয়াছি, কত তীর্থ দেখিয়াছি কিন্তু অমন ধৈর্য্যশীল অমন মনুষ্যত্বে পরিপূর্ণ সবল সুদৃঢ় অথচ মধুমাখা হৃদয় আর আমি কোথাও দেখি নাই!

শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনটিও একটি পুরুষকারের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। বাল্যকালে পারিবারিক অবস্থা দেখিয়া যখন তিনি বুঝিলেন বিদ্যার্জ্জন করিয়া আয় বৃদ্ধি করিতে না পারিলে সংসারের কষ্ট মোচন করা অসম্ভব, তখনি তিনি বিদ্যাভ্যাসের জন্য দৃঢ় প্রযত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাটীতে থাকিয়া পরিচিত স্বজন বন্ধু বান্ধবের মধ্যে পাঠের বিঘ্ন হইবে ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন সুতরাং তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া একদিন একবারে একাকী দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার তখন লাহোর যাইবার ইচ্ছা কিন্তু তখন রেলপথ মাত্র দিল্লী পর্য্যন্ত

* শ্রীযুক্ত রায় বরদাকান্ত লাহীড়ি

খুলিয়াছে। সেই অবস্থাতেই তিনি অনেক কষ্ট সহ্য করিয়া লাহোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেথানে কোন আত্মীয় ছিল না, বন্ধু ছিল না, সে দেশের ভাষা তিনি বুঝিতেন না—এই অবস্থায় একটি সদাশয় ভদ্রলোক তাহাকে নিজের বাটীতে রাখিয়া তাহার অধ্যয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে বিশ্ববিস্থালয়ের পাঠ শেষ করিয়া আইন পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আইন পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। আইন ব্যবসাতে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের গুণে শীঘ্রই পাঞ্জাবের ব্যবহারজীবীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। তাঁহার আইন ব্যবসায় দক্ষতা এবং মনের তেজ দেখিয়া সাহেব সুবারা সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত। পাঞ্জাব প্রদেশে ফরিদকোট নামে একটি শিখরাজ্য আছে, সেখানকার বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুকালের অনুরোধবাক্যে বাধ্য হইয়া তাঁহার পুত্রের রাজত্বকাল সময়ে তিনি তথাকার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় সুখ্যাতির সহিত ১০।১২ বৎসর কাল থাকিয়া রাজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেন। কি অধ্যয়ন কালে কি কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্রেই তাঁহার একটি বিশুদ্ধ চরিত্রবল দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। এই বৃদ্ধবয়সেও কখন তাঁহাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখি নাই। কোন কাজ না থাকিলে নিরন্তর অধ্যয়নে তাঁহার ক্লান্তি নাই। কিন্তু আলস্যে কালক্ষেপ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। এই প্রবল পুরুষকার প্রভাবে সমস্ত বিরুদ্ধ অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তিনি আর্থিক ও আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই যথোপযুক্ত উন্নতির শিখরে আরোহণ

করিয়াছেন। চরিত্রের এতখানি দৃঢ়তার মধ্যেও আবার অপূর্ব্ব কোমলতা ও তাঁহার বালকোচিত সরলভাব সকলের হৃদয়কেই মুগ্ধ করে! কষ্টে পড়িয়া, অভাবে পড়িয়া কেহ কখন তাঁহার সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হয় নাই। ইনি কোন কারণ বশতঃ অহিফেন সেবনে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু যখন ইহার অপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সেই দিন সেই মুহূর্ত্তে তাহা ত্যাগ করিলেন। সকলেই আশঙ্কা করিয়াছিল, অনেক দিনের অভ্যস্ত বিষয় হঠাৎ তিনি পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না, বা করিলেও রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু তিনি অত্যন্ত মানসিক বল প্রযুক্ত অহিফেন আর কখন গ্রহণ করিলেন না, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার পীড়াদিও হয় নাই। ইহা কম দৃঢ়তা ও পৌরুষের পরিচয় নহে!!

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ইনি আমাদের অনেক পরিচিত বন্ধুবান্ধবের নিকট "মুখুজ্যে মশায়" নামে পরিচিত। ইঁহার নিবাস কোথায়, কি পরিচয় আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না। লোকে তাঁহাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলেন "আমার নাম আশুতোষ মুখুজ্যে, নিবাস ভুমকো"—এছাড়া আর কিছু শুনি নাই। তাঁহাকে আমরা ১৩।১৪ বৎসর হইতে জানি, অনেকে আরও অধিক দিন হইতে জানেন। কিন্তু এই "নাম গোত্র হীন" লোকটি অনন্যসাধারণ পুরুষ, পুরুষকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, গীতোক্ত নিষ্কাম কর্ম্মযোগী। তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকাল পরহিতব্রতে ও পরদুঃখমোচনেই ব্যয়িত হইয়াছে। ভারত বিশ্রুত প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যে জন্য সাধারণ লোকের নিকট 'দয়ার সাগর'

নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এই আড়ম্বর হীন, বেশভূষা বিহীন, মহাত্মাকেও আমি ঠিক সেই আখ্যায় আখ্যাত করিতে পারি, যাঁহারা তাঁহাকে জানেন আমার একথা তাহাদিগের নিকট অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হইবে না। আমাদের এই মুখুজ্যে মশায় পরিধানে একখানি মলিনবাস, থেলো একটি হুঁকা হস্তে ভারতের সর্ব্বত্রই বিচরণ করিয়া থাকেন। কাহারও নিকট সম্মানের প্রত্যাশা নাই, কোন লোকের কাছে আর্থিক প্রত্যাশাও নাই, অতিমাত্র উদাসীন— তথাপি সর্ব্বদাই তাঁহাকে কত ব্যতিব্যস্ত দেখিয়াছি। কে কোথায় বসিয়া আছে, আহার জুটিতেছে না, কাহারও বেতন অল্প সুতরাং পরিবার প্রতিপালনে অসমর্থ, কেহ বিদ্যার্থী অথচ অর্থাভাবে লেখা-পড়া শিক্ষা হইতেছে না; কাহারও ঔষধ জুটিতেছে না, কাহারও পথ্য জুটিতেছে না—তিনি এই সমস্ত অসহায় ও নিরাশ্রয় লোকদিগের সুখ শান্তি বিধানে জন্য সর্ব্বদা ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কাহাকে ধরিলে অমুকের বিপদ উদ্ধার হইবে; কিরূপে অমুকের সুপারিশ যোগাড় করিয়া এই দরিদ্র যুবকের অন্নসংস্থান হয়, দিন রাত্রই এই বোধ হয় তাঁহার একমাত্র চিন্তা! শুধু চিন্তায় নহে এই সকল ব্যাপারকে প্রকৃতই কার্য্যে পরিণত করিয়া তোলা অসামান্য ক্ষমতার কথা কিন্তু এইরূপ পৌরুষ তাঁহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। কখন দেখি কোন কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন ভদ্রলোকের কন্যার পাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, কখন দেখি দেনার দায়ে যে ডুবিয়াছে, তাহাকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য সুপরামর্শ দিতেছেন, কখন দেখি কোন দরিদ্র ভদ্রসন্তানের স্ত্রী প্রবল রোগে পীড়িত, তাঁর

ছোট ছোট ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধানের কেহ নাই তাহারও সময়ের অভাব—সেই সব স্থলে দেখা গিয়াছে মুখুজ্যে মহাশয় একাধারে জননী, পাচক ও রোগিণীর শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। কর্ম্মবীরের তিলমাত্র বিশ্রাম নাই, একদিনের জন্য আরাম খোঁজা নাই। যদি ১০ ক্রোশ হাঁটিয়া গেলে কার্য্যোদ্ধার হয়, মুখুজ্যে মহাশয় হুকা হস্তে তখনি প্রস্তুত। "কষ্ট হইতেছে" কি "আর পারিনা"—এ বলিয়া কোন দিন বিরক্তি প্রকাশ করা নাই! যে কর্ম্ম সম্মুখে আসিতেছে তাহাই প্রণত অন্তঃকরণে সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখে গ্রহণ করিতেছেন। এত কর্ম্মোদ্যম, এত উৎসাহ, কিন্তু বিফলতার জন্য কখন তাঁহার ধৈর্য্য বিচলিত হয় না। দুঃখে মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন এ অবস্থা আমি কখন তাঁহার দেখি নাই। পৃথিবীতে কেহ যে তাঁহার দ্বেষ্য আছে তাহা তো মনেই হয় না। সকলের প্রতিই সহানুভূতি সকলের জন্যই অনুকম্পা তাঁহার সমস্ত চরিত্রটিকে বরনীয় করিয়া রাখিয়াছে। কোন কার্য্য ২।১ বার বিফল হইবে সে কার্য্যে স্বার্থ থাকিলেও আমাদের আর উৎসাহ থাকে না কিন্তু তাঁহার কোন স্বার্থ নাই, কেবল অন্যের জন্য কর্ম্ম করিতেছেন—অথচ পুনঃ পুনঃ বিফল মনোরথ হইয়াও তিনি নিরুৎসাহিত হইবার পাত্র নহেন। পুরুষকারের নিখুঁত উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত অথচ এমন নিরহঙ্কার পুরুষ বর্ত্তমান কালে খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। সুদীর্ঘ জীবনের অধিকাংশ কাল এইরূপ পরহিত ব্রতে ব্যয়িত করিয়া, সর্ব্বপ্রকার অভাব দুঃখ ও ক্লেশকে স্বীকার করিয়া লইয়া, তাঁহার কর্ম্মময় জীবনমধ্যাহ্ন তপন অস্তাচল শিখরে হেলিয়া পড়িয়াছে। এইবার তাঁহার দেবশরীর ভগ্ন-

প্রায় হইয়াছে—তথাপি মুখে সেই প্রসন্নতার কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। তাঁহার ন্যায় নিরভিমান লোকহিতৈষী পুরুষেরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ তাঁহাদের পাদস্পর্শে ধন্য হইয়া যায়। আমরা যে তাঁহার স্নেহলাভ করিতে পারিয়াছি, ইহাতে আপনাকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করি। [অল্প কয়েক বৎসর হইল এই মহাত্মাও অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাবে যে আজ কত লোক নীরবে অশ্রু মোচন করিতেছে, কত লোক আশ্রয় হীন হইয়াছে তাহার সংখ্যা নাই।]

বাঙ্গলার সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক ৺ শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের চরিত্র ও অভ্যাসের দ্বারা উন্নতি লাভের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাঁহার সত্যবাদিতা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্বাধীনচিত্ততা, তেজস্বিতা, সকলের প্রতি প্রীতি, সুমধুর ব্যবহার এবং জ্ঞানানুরাগ যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত। তাঁহার মত অকৃত্রিম সুহৃদ্, স্নেহময় আত্মীয়, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মচারী, সদালাপী সভাসদ, ধর্ম্মভীরু বিচারক কদাচিৎ দেখা যাইত। গুরুতর রাজকর্ম্মের সূত্রে নানা প্রলোভনের মধ্যে তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু কোন দিন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি কর্ত্তব্যপথ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই। ঋণ করিয়াও তিনি তাঁহার মতে পালনীয় দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়কে পালন করিতেন, নিজে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতেন প্রলোভন বা ভীতি প্রদর্শনে কদাচ তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হইতেন না। তাঁহার সুমধুর স্নেহময় সবিনয় চরিত্রের অভ্যন্তরে একটা অনমনীয় দৃঢ়তা ছিল। অপমান বা অবিচার তিনি কদাচ

৺ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

সহ্য করিতেন না। এ কারণে তাঁহাকে অনেক সময় অবিবেচক ক্ষমতালোলুপ রাজপুরুষের বিষদৃষ্টিতে পড়িতে হইয়াছিল, কিন্তু কোন দিন স্বার্থের দিকে চাহিয়া তিনি আপনার মর্য্যাদা বুদ্ধিকে বা কর্ত্তব্য বুদ্ধিকে খর্ব্ব করেন নাই।

চরিত্রের এই মহত্ত্ব ও দৃঢ়ত্ব কঠিন অভ্যাসের ফল। তিনি নিজ জীবনে আপনার সন্তানদিগকে আপনার আদর্শ অনুসারে শিক্ষিত করিতে চেষ্টা করিতেন। আশা করি তাহার সে চেষ্টা কত-কাংশে সফল হইয়াছে!

সাধু শ্রীধর :—আর একটি মহাত্মার আখ্যায়িকা না দিলে এই চরিতাবলী অসম্পূর্ণ থাকিবে। ইনি ভক্ত শ্রীধর—পূজ্যপাদ ৺বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের জনৈক শিষ্য ও ভক্ত। ইঁহার মধ্যে এমন একটি তেজ ও ধৈর্য্য ছিল, এমনি একটি বিশ্বাস ও নিষ্ঠা ছিল যাহা স্মরণ করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। নিরন্তর সাধনাভ্যাস বলে তিনি এমন একটি চরিত্রবল লাভ করিয়াছিলেন যাহা এক ঈশ্বর ছাড়া আর কাহাকেও গ্রাহ্য করিত না। অবস্থা যতদূর অসচ্ছল হইতে হয়, তথাপি প্রয়োজন স্থলে একমাত্র গাত্র বাস খানি দান করিতে কখন দ্বিধা প্রকাশ করিতেন না। যেমন বিশ্বাস তেমনি দৃঢ়তা অথচ বিনয় পূর্ণ শান্তভাব এই মহাত্মার মুখমণ্ডলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইত। এমন সরল ও সত্যবাদী ছিলেন যে লোকে সময়ে সময়ে তাঁহাকে পাগল মনে করিত। আপনার কোন ত্রুটি অত্যন্ত লজ্জাকর হইলেও, তাহা তিনি নির্ভয়ে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। বিশেষ আধ্যাত্মিক বল ও ভগবদ্ বিশ্বাস না থাকিলে কখনই লোকে

এতটা সত্যব্রত হইতে পারে না। সেই পাপকে গোপন করে যে বিশ্বতশ্চক্ষু ভগবানকে মানে না—সেই গোপনে পাপ করিয়া লোকের নিকট সাধু সাজিয়া বসিয়া থাকে যে লোকাপবাদকেই ভয় করে, কিন্তু ভগবানকে ভয় করে না। কিন্তু সর্ব্বত্র তাঁহাকে যে অনুভব করে, সে কাহার নিকট, কোন কথা, গোপন করিবে? তাঁহার মৃত্যুও বড় সুন্দর বড় বিস্ময়কর। মৃত্যুর কিছু আগেই তাঁহার শরীর একবার খারাপ হয়, কলিকাতায় চিকিৎসা চলিতেছিল। তার পর সকলেই জানে তিনি ক্রমশঃই সারিয়া উঠিতেছেন। তবু তাঁহার জনৈক অন্তরঙ্গ বন্ধুর পরামর্শক্রমে আর একবার তাঁহাকে ডাক্তার দ্বারা দেখানো স্থির হইল। তিনিও তাঁহার বন্ধু উভয়েই পরদিন প্রাতঃকালে ডাক্তারের কাছে যাইবেন ইহাই স্থির ছিল। রাত্রে বাসস্থানে শুইয়া আছেন হঠাৎ তাঁহার মনে হইল তাঁহার শরীর অসুস্থ হইতেছে। যাঁহাদের বাড়ীতে ছিলেন রাত্রিতে তাঁহাদের ডাকাইয়া বলিলেন 'অদ্য আমার প্রাণান্ত হইবে আপনারা এইখানে থাকুন'। উপস্থিত সকলেই মনে করিলেন এ তাঁহার পাগলামি, সুতরাং তাঁহাকে বুঝাইয়া ও কিছু ভৎর্সনা করিয়া তাহারা সকলেই শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন। পুনশ্চ রাত্রি মধ্যে আবার তাঁহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহাকে নাম শুনাইবার জন্য সকলকেই কাতরস্বরে অনুনয় করিলেন। তাঁহার যে তখনি মৃত্যু হইবে একথা কেহই বুঝিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহারা তাঁহার কথায় মনোযোগ দেওয়া তত আবশ্যক বোধ করেন নাই। শ্রীধরের অপূর্ব্ব সাধু হৃদয় কেহ বুঝিতে পারিল না, কারণ সে দরিদ্র ও তাহার মাথায় জটাও

নাই, পরিধানে রঙ্গিন কাপড়ও নাই। যাই হ'ক যখন কেহই আসিল না তখন আসন্ন সময়ে আপনিই আপনার হৃদয়দেবতাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। তারপর কাহাকে দেখিয়া যেন কৃতাঞ্জলি-পুটে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন আর উঠিলেন না। দীনের বন্ধু তাঁর সেই দীন ভক্তের গাত্র হইতে ধূলি ছাড়িয়া তাহাকে আপনার কোলে তুলিয়া লইলেন! প্রাতঃকালে সকলে শ্রীধরের ঘরে আসিয়া বিস্ময় বিহ্বল-নেত্রে দেখিতে পাইল শ্রীধরের প্রাণবায়ু দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া গিয়াছে!

ন্যাংটা বাবা।

ন্যাংটা বা খাঁকী বাবার নাম অনেকেই হয়তো শুনিয়াছেন। অনেকের ধারণা তিনি সিদ্ধপুরুষ। যে গাঁজা অধিক মাত্রায় খাইলে লোকের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া উঠে, তিনি তাহা দিবারাত্র সেবন করিয়াও বেশ সুস্থ ও সবল আছেন। খুব ঘোরাল মাতাল যতটা মদ্য একবারে গ্রহণ করে, তিনি তাহার চতুর্গুণ ব্যবহার করিয়াও শুনিয়াছি বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন না। আবার বহু দিন হয়তো সামান্য মাত্রও গ্রহণ করেন না, তাহাতেও কোন কষ্ট নাই আপনার উপর দাসত্ব নাই। মনের উপর এতটা আধিপত্য জন্মিয়াছে। এ মহাত্মারও দেহাবসান হইয়াছে। যখন তিনি এক প্রকার মৃত্যুশয্যায় শায়িত আমি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সঙ্গে করিয়া তাঁহার জন্য কিছু ফল লইয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার অনুচরগুলি আমাকে নিকটেই যাইতে দিল না। বহু কষ্টে তাঁহার নিকট গিয়া পৌঁছিলাম, দেখি পূর্ব্বের সেই কান্তি নাই। মৃতের ন্যায় পড়িয়া আছেন। মুখে গাত্রে মাছি ভ্যান ভ্যান

করিতেছে। দেখিয়া বড় দুঃখ হইল। এমন কেহ নাই যে একটু ভাল করিয়া সেখানে শুশ্রূষা করে। কিছুক্ষণ পরে দেখি ন্যাংটা চক্ষু মেলিয়া তাকাইলেন এবং আমার পরিচয় লইলেন। আমি ফলগুলি তুলিয়া দিলাম। এত যে জীর্ণ ও রোগাতুর দেহ কিন্তু সে অবস্থাতেও তাঁহার সেই স্বাভাবিক চরিত্রের মধুরতা তখনও বেশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

বামা খ্যাপা।

সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিক ৺বামাচরণের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। যে শ্মশান শৃগাল কুকুরেরই বিহারস্থল, দিবাকালে একক যাইতে যথায় অনেকের অন্তঃকরণ কম্পিত হইয়া উঠে, অমাবস্যার ঘোর নিশীথ রাত্রে বামাচরণ সেখানে বসিয়া থাকিতেন, নিশ্চিন্ত মনে শুইয়া থাকিতেন। ফেরুদল নিতান্ত বন্ধুজ্ঞানে তাঁহার পদলেহন করিয়া চলিয়া যাইত। অভ্যাস বশতঃ এতটা নিঘৃণ্য অবস্থা আসিয়াছিল যে কুকুর গুলিকে লইয়া একসঙ্গে আহার করিতে দেখিয়াছি শুধু তাহাই নহে তাহাদের মুখ বিবর হইতে অন্ন লইয়া অম্লানবদনে ভোজন করিতেছেন। এই যে ভয়শূন্যতা নিঘৃণ্যতা ইহা কম মানসিক বলের পরিচয় নহে। কত দিনের সুদৃঢ় অভ্যাসে তবে এই শক্তিকে তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন!

৺রামতনু লাহিড়ী।

৺রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সবিশেষ পরিচিত। তাঁহার ন্যায় সরল স্বভাব, বিদ্যানুরাগী সত্যবাদী ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি অল্পই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। বঙ্গদেশে এখনও অনেক উচ্চশিক্ষিত পদস্থব্যক্তি জীবিত রহিয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার সরলতা, উচ্চান্তঃকরণ ও ধর্ম্মানুরাগের সাক্ষ্য প্রদান করিবেন।

এই মহাত্মার পঠদ্দশার সময় হইতে সঙ্গদোষে অত্যন্ত পানাসক্তি ঘটিয়াছিল। ইহার অপকারিতা বুঝিয়াও তাঁহার ন্যায় সাধুব্যক্তি সুদীর্ঘ জীবন কালের মধ্যেও সেই কদভ্যাসের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অভ্যাসের এমনি ভয়ঙ্কর প্রভাব!

৺ কৈলাসচন্দ্র সান্যাল।

প্রাতঃস্মরণীয় পূজ্যপাদ পিতৃদেব ৺কৈলাসচন্দ্র সান্যাল:—আজ কাল সামান্য কাজ করিয়া তাহার চতুর্গুণ ডঙ্কা বাজাইয়া স্বকার্য্যের মহিমা প্রচার করিতে আমরা আর কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করিনা। কিন্তু উপরে যে মহাত্মার নাম লিখিত রহিয়াছে, তিনি কোন ধনীর সন্তান নহেন, একজন বিদ্বান, অথবা আজকাল যাহাকে স্বদেশহিতৈষী বলে—সেরূপও কিছু ছিলেন না, তবুও তিনি যে ক্ষুদ্র পল্লীটীতে বাস করিতেন, আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে চলিল তাঁহার দেহাবসান হইয়াছে, তবুও সেই গ্রামের ও সেই গ্রামের নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহের অনেক বৃদ্ধ লোক তাঁহার নাম স্মরণ করিয়া আজও অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। এমন দীনার্ত্তের সেবা করিতে, এমন অনাথ দীনকে আশ্রয় দান করিতে, লোকেব দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাহা দূরীকরণার্থ প্রযত্ন করিতে এমন লোক বড় বেশী দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রাম হইতে দূরে তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষ্যে প্রায়ই থাকিতে হইত, কিন্তু যখন তিনি গ্রামে আসিতেন তখন গ্রামে আনন্দোৎসব হইত। ছোট্ট পল্লীটি তাঁহার সদ্‌গুণ ও উদার চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে কত না শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত, এবং তাহাদের সকল কাজে তাঁহার উপর কতটা নির্ভর করিত তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। গ্রামে যেখানে রোগাতুর

পীড়িতের কাতর আর্ত্তনাদ উত্থিত হইতেছে, কৈলাসচন্দ্র সেই রোগ শয্যার পার্শ্বে বসিয়া দিবা রাত্রি রোগীর সেবা শুশ্রূষার মগ্ন হইয়া থাকিতেন, আপনার আহার নিদ্রার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। যে গৃহ প্রাঙ্গণে উপযুক্ত গৃহস্বামীর অকালমৃত্যুতে, তাঁহার আশ্রিত বিধবা ও পোষ্যবর্গের কোলাহল ক্রন্দনে মুখরিত সেখানে তাঁহার করুণার্দ্র হৃদয় তৎক্ষণাৎ তাহাদের অভাব ও ক্লেশ বিমোচনে বদ্ধ-পরিকর। যাহার কেহ নাই, যে গৃহহীন অনাথ, তাহাকে নিজগৃহে আনিয়া অথবা তাহার কিছু সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। শারদীয়া পূজা মহোৎসবের সময় যখন বাঙ্গলার প্রতি পল্লী আনন্দে হাঁসিয়া উঠিত, যখন প্রতি গৃহস্থের গৃহ ও প্রাঙ্গণ ভূমি শোভন সজ্জায় সজ্জিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, শিশুদের নববস্ত্র পরিধানে ও আনন্দ কলরবে গৃহপ্রাঙ্গণ ও পথ, ঘাট ও মাঠ আনন্দ-স্রোত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, তখনও হয়তো কোন গৃহস্থের উপযুক্ত উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তির অভাব বশতঃ তাহার গৃহ তখন শোকের বন্যায় বিপ্লাবিত ও বিধ্বস্ত সে গৃহের অনাথা বৃদ্ধাদের ও শিশু সন্তানদিগের দুঃখ শোকার্ত্ত মলিন মুখগুলি দেখিয়া কাহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত, কে তাহাদের ক্লেশ দূর করণার্থ সর্ব্বাগ্রে সেইখানে পূজোপহার নব বস্ত্রাদি প্রেরণ করিতেন, তিনিই সাধন পল্লীর ঋষিপ্রতিম ৺কৈলাস চন্দ্র দেবশর্ম্মা। বিপন্ন ব্যক্তিকে বিপদুদ্ধারে সাহায্য করিয়া নিরন্নের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করিয়া, উৎসবের সময় উৎসবোপযোগী উৎসাহ দ্বারা পল্লীবাসীদিগকে উৎসাহিত ও প্রমোদিত করিয়া এক সুগন্ধময় সমুজ্জল বনফুলের ন্যায় তিনি জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন,

তাহা স্মরণ করিলেও চিত্ত পুলকে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাঁহার নিজ গৃহে ও কর্ম্মস্থানে কত এইরূপ দুঃখীর আশ্রয়হীনের প্রতিপালন হইত, অথচ তাঁহার আয় সেই পরিমাণে কত স্বল্প ছিল, কিন্তু তাঁহার উদারচরিত্র এই সকল দুঃখরাশির প্রতিবিধান না করিয়া কখনই নীরব থাকিতে পারিত না, ইহা স্মরণ করিলে চিত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। মনুষ্যের প্রতি উদার প্রেম ও মহতী সহানুভূতি এবং ঈশ্বরের প্রতি অকপট ভক্তিই তাঁহার চরিত্রকে বিশেষভাবে বরণীয় করিয়াছিল। তাঁহার সমগ্র জীবনটিই একটি সাধুর জীবন। এত পরদুঃখকাতর এবং তাহার বিমোচনার্থ এত প্রযত্ন ছিল যে গ্রামের একটি নীচজাতির মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে, লোকাভাবে তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইতেছে না, গ্রামের উচ্চবর্ণরা সে মৃতদেহ স্পর্শ করিবেনা, তিনি যখনই ইহা জানিতে পারিলেন, তখনই তাহাদের গৃহে গিয়া সেই শবদেহ শ্মশানভূমিতে বহন করিয়া লইয়া আসিলেন সমাজের নিকট কত লাঞ্ছিত হইতে হইবে জানিয়াও তিনি মানুষের এই ঘোর বিপত্তিকালে তাহাকে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এবিষয়ে তাঁহার একটি অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন তাঁহার নাম বিহারীলাল। তিনিও অতিশয় সজ্জন ও সদাশয় পুরুষ ছিলেন। তাঁহাকে কেহ উৎপীড়ন করিলে, সাধ্য থাকিলেও তাহা[illegible] কখনও প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা করিতেন না, নীরবে অন্যের উৎপীড়ন সহ্য করা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সদ্‌গুণ ছিল। আবার সেই সকল উৎপীড়নকারীরা বিপন্ন হইয়া যখন তাঁহার শরণাপন্ন হইত, তিনি তাহাদের কৃত লাঞ্ছনার কথা স্মরণ না করিয়াই তাহাদের উপকারের জন্য

প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার সমগ্র জীবনটি প্রস্ফুটিত পুষ্পের ন্যায় সৌরভময় ও শোভাময় হইয়া বিকশিত হইয়াছিল—আজ কত দিন হইল সেই দেব দেহের সেই বিশ্বাস ভক্তির কমনীয় মূর্ত্তির অবসান হইয়াছে এখনও বৃদ্ধরা যাঁহার স্মৃতিটিকে মনে মনে স্মরণ করিয়া আনন্দিত হয়, তাঁহার প্রতিভামণ্ডিত অথচ গর্ব্বহীন মুখ-মণ্ডলের কিরণরাশি কত আর্ত্ত পীড়িতকে সান্ত্বনা দিয়াছে—তাহা স্মরণ করিয়া সেই সহনীয় চরিত্রের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িতে ইচ্ছা করে, এবং সেই দেবসদৃশ পুরুষের চরণ ধুলায় নিজ শরীরকে লুটাইতে ইচ্ছা করে। আরও কিছুদিন পরে হয় তো তাঁহার নামটিও কাহারও স্মরণ পথে কখনও উদিত হইবে না, কিন্তু যে একটি পবিত্র দেবচরিত্রের কেবল আদর্শ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন —তাঁহার সেই কৃতকর্ম্মের পুণ্যগন্ধ এখনও বোধ হয় সেই ক্ষুদ্র পল্লীটির আকাশে বাতাসে ভরিয়া আছে তাহা কখনই নিঃশেষিত হইবে না। যখনই তাহা স্মরণ হয়, তখনই আনন্দে পুলকে অন্তঃকরণ ভরিয়া উঠে, এবং যে গ্রামটি তাঁহার পদস্পর্শে ধন্য হইয়াছে সেই গ্রামের ধুলায় আপনার সর্ব্বাঙ্গকে লুটাইয়া দিতে ইচ্ছা করে।

যে বিষ স্বল্প মাত্রা গ্রহণেও প্রাণান্ত ঘটে, কত লোক অভ্যাসের বলে সেই বিশ অধিক মাত্রায় ব্যবহার করিয়াও বেশ নিরাপদে দিন যাপন করিতেছে।

কেহ কেহ ভূত প্রেত দেখিতে এত অভ্যস্ত যে গাছের পাতাটি নড়িলে অথবা বায়ুভরে গাছের ছায়াটি দুলিলে তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়—সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আবার কেহ কেহ

জনশূন্য শব ভোজী গৃধ্রসঙ্কুল শ্মশানে যথায় শৃগাল কুকুর মৃতশরীর লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে, তথায় রাত্রি যাপন করিতেও কোন শঙ্কা বা উদ্বেগ বোধ করে না। ইহা অভ্যাস ছাড়া আর কি?

সাহসিকতা এও অভ্যাসের ফল। ইহাতে শারীরিক শক্তির প্রাচুর্য্যের অপেক্ষা করে না। একজন বাল্যাবধি ব্যাঘ্র শীকারে অভ্যস্ত, তাহার বাঘ দেখিলে বা বাঘের শব্দ শুনিলে ততটা ভীতির উদ্রেক হয় না, আর একজন অনভ্যস্ত অথচ হয়তো বেশ বলবান, কিন্তু বনের মধ্যে ব্যাঘ্র দেখিলে তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠে!

বুদ্ধির উৎকর্ষ বা অপকর্ষের কারণও এই অভ্যাস। স্বভাবতঃ কেহ বুদ্ধিমান না হইলেও, অভ্যাস করিতে করিতে তাহার বুদ্ধির বিকাশ হয়।

আহারের সম্বন্ধেও অভ্যাসের ক্ষমতা যথেষ্ট। কেহ ঝাল খাইতে অভ্যস্ত নয়, কাহারও তিক্ত ভাল লাগে, কাহারও ঝালে অত্যধিক প্রীতি, কাহারও বা লবণে অধিক অভিরুচি; কাহারও মিষ্ট দ্রব্যে অনুরাগ, কাহারও অম্লে বিশেষ আসক্তি। কাহারও নিরামিষ ভোজনে অধিক আগ্রহ, কেহবা মৎস্য মাংসের জন্য লালায়িত। এ সমস্তই ন্যূনাধিক অভ্যাসের উপর নির্ভর করে।

কেহ উপকার করিয়া আনন্দলাভ করে, কাহারও ঠকাইয়া আনন্দ। অল্পেতেই কেহ বিরক্ত হন, কেহবা অত্যধিক উপদ্রবও সহিষ্ণু ভাবে সহ্য করেন; কেহবা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত, কেহবা বেশ সংযমশীল, কেহবা ভোজনে এত পটু যে ৮।১০ জনের আহার একাই ভোজন করিতে পারেন। "মুনকে রঘোর" নাম এখনও প্রসিদ্ধ। আবার নিরা-

হারে থাকার অভ্যাসও কেহ কেহ আশ্চর্য্যরূপ আয়ত্ত করিয়াছেন। একজনের কিছুই নাই, তথাপি সে একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র খণ্ডকেও প্রয়োজন হইলে ত্যাগ করিতে প্রস্তত; আর একজন লক্ষপতি অথচ কপর্দ্দক ব্যয় করিতে তাহার প্রাণ মৃত্যুযাতনা অনুভব করে। ইহাও পূর্ব্বকৃত অভ্যাসেরই পরিণাম।

কাহারও সপরিজনে পরিবৃত হইয়া থাকার অভ্যাস, তিনি একলা কিছুতেই থাকিতে পারেন না, আর একজন সুদীর্ঘকাল সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও বেশ শান্তিতে থাকেন।

একজন ভিক্ষায় অনভ্যস্ত, কাহারও নিকট কিছু লইতে তাহার যেন মাথা কাটা যায়; আবার এক এক জন সকলের নিকটেই অসঙ্কোচে হস্ত পাতিয়া থাকে। কেহ সকলের সহিত সহজেই বেশ মিশিতে পারেন, কেহ এত লাজুক যে কাহারও সহিত একটি কথাও বলিতে সাহসে কুলায় না। কোন কোন লোক স্বাভাবিকই সুকণ্ঠ, সে অল্পায়াসেই উচ্চ শ্রেণীর গায়ক হইতে পারে, কিন্তু যাহার আদৌ গলা নাই, সেও যদি অভ্যাস করে খুব উচ্চদরের গায়ক না হউক, কতকটা গলা তাহার খুলিয়া যায় ইহা নিশ্চিত।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে সুস্পষ্ট বুঝা যায় যে ভালমন্দ যা কিছু সমস্তই অভ্যাসের ফল। সদভ্যাসের ফলে অন্তর্নিহিত সুপ্ত শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠে। কু অভ্যাসের ফল এই যে, ইহা শারীরিক বা মানসিক কোন শক্তিকেই বলবান করে না পরন্তু দুর্ব্বল করিয়া ফেলে—কিন্তু সদভ্যাসে দৈহিক মানসিক উভয় শক্তিই অবিনব বিকাশলাভ করিয়া মানুষকে দেবতা করিয়া তুলে। যাহা প্রথম

দৃষ্টিতে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়, পুরুষকার প্রভাবে তাহাকেও কতকাংশে সম্ভব করিয়া তুলা যাইতে পারে। মহাবীর কর্ণের সেই বীরোচিত বাক্য স্মরণ করুণ। তাঁহাকে "সুতপুত্র" বলিয়া কৌরব সভায় অপমানিত করিবার চেষ্টা করিলে তাঁহার মুখ হইতে যে প্রদীপ্ত বাক্য নির্গত হইয়াছিল তাহা সকলেরই প্রতিদিন একবার করিয়া স্মরণ করা কর্ত্তব্য।

"সুতো বা সুত পুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্বং হি পৌরুষং॥"

অতএব যিনি শ্রেয়োলাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি অভ্যাস যোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া উত্তমাগতিকে প্রাপ্ত হউন। অভ্যাসের দ্বারায় মানুষ আবদ্ধ, মোহমুগ্ধ, দুর্ব্বল— আবার অভ্যাসই তাহাকে সবল, জ্ঞানী ও বিমুক্ত করিতে সমর্থ। কদভ্যাসের ফলেই আমাদের এই অধোগতি, আবার সদভ্যাসই (কর্ম্ম বা চেষ্টা) আমাদের সমুন্নত করিবে। অভ্যাস অপেক্ষা বলবত্তর শক্তি আর কিছুই নাই। অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া আর একবার ভগবদবাক্য স্মরণ করুন—

"তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থংজ্ঞানাসিনাত্মনঃ
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগো মাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।
ক্লৈব্যং মাস্মগমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"

সমাপ্ত।